কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা

ভি. রিড্‌নিক

মনীষা



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

প্রকাশক
শ্রীতরুণ সেনগুপ্ত
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক
শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
বোধি প্রেস
৫, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

মূল্য ৬·০০

ভূমিকা

পৃথিবীর সব দেশেই অণু পরমাণু নিয়ে গবেষণা চলেছে— মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরে উঠছে বিদ্যুৎগতিতে— কেন্দ্র থেকে শক্তি বের করে তা মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে মানুষ নানা প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে।

এদিকে প্রকৃতির অনেক রহস্যের খবর এখন যে বিজ্ঞানীর কাছে ধরা পড়লো, তা সকলকে জানাতে সব দেশের বিজ্ঞানীরা অনেক মনোজ্ঞ ও জনপ্রিয় পুস্তক লিখে যাচ্ছেন।

আজকাল অবস্থাবৈগুণ্যে ইংলণ্ড কি আমেরিকা থেকে বই আমদানী করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ; সোভিয়েট দেশ কিন্তু নবতম জ্ঞান বিতরণ করতে সজাগ। তাঁদের কল্যাণে সেখানে প্রকাশিত নানা বই আমরা সস্তাদামে পাচ্ছি বলে এ দেশের নবীন বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন খবর কি আবিষ্কারের বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে রয়েছেন। এর জন্য তাঁদের অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ ব্যয় করতে হয়।

আমাদের দেশের যারা বিজ্ঞান পড়া শুরু করছে তাদের কৌতূহলের সীমা নেই— তারা জানতে চায় কিভাবে পরাণুর অভ্যন্তর থেকে আমরা শক্তি নিষ্কাশন করতে পারি।

'মনীষা'র কর্তৃপক্ষ "কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অ আ ক খ" বলে একটি নতুন বই প্রকাশ করে আমাদের এ বিষয়ে অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছেন। দেখে খুশি হয়েছি যে, তাঁরা বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈয়ারি করার পরিশ্রম ও মনোযোগ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন নি। ফলে একটি উজ্জ্বল উপভোগ্য নব-বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখা হয়েছে। বাংলায় এই ধরণের বই সর্বপ্রথম। বাংলায় যে সব কথাই চেষ্টা করলে গুছিয়ে বলা যায়— পদে পদে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে হতাশ হয়ে পড়তে হয় না—চোখের সামনে বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করে আমার ও সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন এই নবীন বিজ্ঞানীগোষ্ঠী।

আশা করছি বইয়ের যথেষ্ট সমাদর হবে এবং বাংলার নবীন পাঠকের সঙ্গে কোয়ান্টাম বা বস্তুকেন্দ্রের সত্য পরিচয় হবে।

কলিকাতা
২৫শে আগস্ট, ১৯৬৮

সত্যেন্দ্র বোস

প্রকাশকের নিবেদন

সোভিয়েত লেখকের এই বইখানির ইংরেজী সংস্করণের বিভিন্ন অধ্যায় অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীসুমিত চক্রবর্তী, শ্রীসনৎ বসু ও ডাঃ জয়ন্ত বসু। পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও ডাঃ জয়ন্ত বসু এবং বইয়ের শেষে সংযোজিত পরিভাষাগুলিও সংকলন করেছেন ডাঃ বসু।

নব্য পদার্থবিজ্ঞানের একটি মূল, দুরূহ তত্ত্বের সঙ্গে বাঙালী পাঠককে পরিচিত করার এই দুঃসাহসী প্রয়াসের সার্থকতা বিচারের ভার আমাদের উপরে নেই। যাঁদের আছে, আশা করি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা সে কাজ করবেন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যা থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা

দ্বিতীয় অধ্যায়

নতুন তত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপ

তৃতীয় অধ্যায়

বোরের তত্ত্ব থেকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা

চতুর্থ অধ্যায়

পরমাণু, অণু, কেলাস (ক্রিষ্ট্যাল)

পঞ্চম অধ্যায়

পারমাণবিক কেন্দ্রকের অন্তঃপুরে

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরমাণু-কেন্দ্রক থেকে মৌলকণা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয় | | | পৃষ্ঠা

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা থেকে ··· ?

। প্রথম অধ্যায় ।

ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যা থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা

॥ ভূমিকার পরিবর্তে ॥

পারমাণবিক শক্তি। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। আধাপরিবাহী পদার্থ (সেমিকন্‌ডাক্টর)। প্রাথমিক বস্তুকণিকা। মেজার। লেজার। সবগুলো নামই খুব পরিচিত, যদিও সবচেয়ে পুরনোটির বয়েস পঁচিশ বছরের বেশী নয়। এরা সবাই বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার সন্তান।

এ যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে অদ্ভুৎ দ্রুত বেগে; প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ নব নব দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। পুরনো বিজ্ঞানগুলোর জীবনে যেন এক দ্বিতীয় যৌবন দেখা দিয়েছে। পদার্থবিদ্যা অন্য সব বিদ্যাকে ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে এবং অজানার রহস্যভেদে নিয়েছে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা। রণক্ষেত্রের প্রসারণের সঙ্গে আক্রমণের গতি মন্থর হয়ে আসে। কিন্তু সে কেবল পুনরাক্রমণ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিতে।

প্রকৃতির রহস্যোদ্ধারের কাজে পদার্থবিদ্যাকে অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে হয়েছে, একই সঙ্গে তাকে নানা সূক্ষ্ম ও প্রত্যয়জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজনও করতে হয়েছে। পদার্থবিদ্যার সদরদপ্তরে বসে শতসহস্র তত্ত্ববিদ্‌ আক্রমণের পরিকল্পনার ছক তৈরি করছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জালে সে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য ধরা পড়ছে, তাদের যাচাই করে নিচ্ছেন। এ কিন্তু অন্ধকারে লড়াই করা নয়। পদার্থবিদ্যার শক্তিশালী তত্ত্বগুলো লড়াইয়ের ক্ষেত্রটাকে আলোয় ভরিয়ে তুলেছে। আধুনিক পদার্থ-বিদ্যার সবচেয়ে জোরালো দুটি সার্চলাইট হল আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিংশশতাব্দীর দান। জন্মের তারিখটা হল ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০০ সাল। ঐদিনই বার্লিনের বিজ্ঞান আকাদেমির পদার্থবিদ্যা পরিষদের এক সভায় জার্মান পদার্থবিদ্‌ ম্যাক্স প্লাংক তাপীয় বিকিরণ তত্ত্বের এক জটিলতার সমাধানকল্পে তাঁর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমস্যা নিয়তই দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু প্লাংক যেভাবে তাঁর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল, কারণ তার মধ্যে ছিল আগামী বহু বৎসর ধরে পদার্থবিদ্যার বিকাশধারার পূর্বাভাস।

প্লাংক যে ধারণাকে রূপ দিলেন, তা ছিল বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ; তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে নতুন জ্ঞানের এক বিশাল বৃক্ষ। প্লাংকের ধারণা যে সব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের গোড়াপত্তনের কাজ করল, তা বৈজ্ঞানিক গল্প-লেখকদের উদ্ভটতম কল্পনারও অতীত। প্লাংকের ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা। এ এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের অস্তিত্ব আমাদের সামনে মেলে ধরেছে—সেই জগৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের, সে জগতের বাসিন্দা হল পরমাণু, পারমাণবিক কেন্দ্রক (nuclei) ও প্রাথমিক বস্তুকণিকা (elementary particles)।

॥ নতুন জগতের রূপরেখা ॥

বিংশ শতাব্দীর আগে এই পরমাণু সম্বন্ধে লোকে কি কিছুই জানত না? এক হিসেবে কিছুটা জানত অর্থাৎ তারা খানিকটা আন্দাজ ও অনুমান করতে পেরেছিলেন।

মানুষের সন্ধানী মন এই বিষয়গুলো নিয়ে জল্পনা করেছিল; দীর্ঘকাল পূর্বে তারা যা কল্পনা করেছিল সেটাই বহু শতাব্দী পরে হয়ে দাঁড়াল একটা বাস্তব সত্য।

পৃথিবীর প্রথম পর্যটকেরা তাঁদের আবিষ্কারের পথ রচনা করার আগেই প্রাচীনকালের মানুষেরা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তাদের ছোট্ট বাসভূমির এলাকার বাইরেও রয়েছে লোকজন ও জীবজন্তুর অস্তিত্ব।

একইভাবে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগৎ বস্তুতঃ আবিষ্কৃত হওয়ার বহুকাল পূর্বেই মানুষ এই জগতের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছিল। এই নতুন জগতের সন্ধানে খুব বেশী দূরে যাবার দরকার ছিল না, কারণ ওটা ছিল মানুষের হাঁতের কাছেই, তার চারপাশের সব বস্তুর মধ্যে।

যা একান্ত রূপহীন, তার থেকে প্রকৃতি কিভাবে আমাদের চতুর্দিকের

এই বিশ্বচরাচর গড়ে তুলল, অতীতকালে মনষীরা সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, বিশ্বে বস্তুর এত বিপুল বৈচিত্র্য সৃষ্টি হল কি করে? ছোট ছোট পাথর দিয়ে বিরাট বাড়ী তৈরী করে তোলে যে স্থপতি, প্রকৃতির কাজটা কি ঠিক তারই মতন নয়? এই ছোট পাথরগুলো তাহলে কি?

বিরাট বিরাট পর্বত জল, বাতাস ও রহস্যময় আগ্নেয় শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসতে থাকে। যে পাথরেরা এভাবে ভেঙ্গে পড়তে থাকে, তারা কালক্রমে আরো ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট টুকরোর চেহারা নেয়। লক্ষ লক্ষ বছর পেরিয়ে যায়, এই ছোট টুকরোগুলো গুঁড়িয়ে পরিণত হয় ধূলোয়।

বস্তুর এভাবে ছোট থেকে আরো ছোট হতে থাকা—এর কি কোন শেষ নেই? এমন ক্ষুদ্র বস্তুকণা আছে কি যাকে ভেঙ্গে ফেলার কাজে প্রকৃতিকেও হার মানতে হয়? জবাবটা হল—হ্যাঁ, আছে। প্রাচীন যুগের দার্শনিক এপিকিউরাস, ডেমোক্রিটাস এবং অন্যান্যরা সেকথাই বলেছেন। এই বস্তুকণাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'পরমাণু' (অ্যাটম)। এদের নাকি আর ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব নয়—সেটাই ছিল এদের প্রধান ধর্ম। গ্রীকভাষায় 'অ্যাটম' শব্দটির অর্থ হল 'অবিভাজ্য'।

একটি পরমাণুর চেহারাটা কি রকম? ঐযুগে এ প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পাওয়া যায় নি। পরমাণুদের আকৃতি হয়ত কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গের মত, আবার হয়ত তা নাও হতে পারে। পরের প্রশ্নটা হল, এরা কত রকমের? হয়ত সে সংখ্যা 'হাজার', আবার সম্ভবত তা একটিও হতে পারে। কোন কোন দার্শনিক (যেমন গ্রীসদেশের অ্যানাক্সিম্যানডার) আবার বিশ্বাস করতেন, পরমাণুদের সংখ্যা হয়ত মাত্র চারটি। তাঁদের ধারণা ছিল যে সমগ্র বিশ্ব চারটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গড়ে উঠেছে—জল, বাতাস, মাটি ও আগুন। এই মৌলিক পদার্থেরা আবার গড়ে উঠেছে পরমাণুদের সমবায়ে।

কেউ এখন ভাবতে পারেন, এত সামান্য তথ্যের পুঁজি যেখানে সম্বল, বড় কোন অগ্রগতির কথাই সেখানে উঠতে পারে না। কথাটা ঠিকই, তবে বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপগুলো বিস্তৃতির মাপে যতটা বড় হয়, গভীরতায় ততটা হয় না। মানুষের চারপাশে কত বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ? প্রথম

কাজটা হল তাদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে খুঁজে বার করা, তাদের গঠন প্রকৃতির কথাটা আসবে আরো অনেক পরে।

বিজ্ঞানের শৈশবকালে পরমাণুর ধারণাটা ছিল এক প্রতিভাদীপ্ত অনুমান। তবু তা ছিল শুধু অনুমানই, কোনো পর্যবেক্ষণের ফল নয়, কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তা সমর্থিত হয় নি।

এক সুদীর্ঘকালের জন্যে পরমাণুর কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদের কথায় আবার আসতে হল বা বলা যায় আবার নতুন করে যেন এদের আবিষ্কার ঘটল। এবং এ কাজটা করলেন পদার্থবিদ্‌রা নয়, রসায়নবিদরা।

গত শতাব্দীর প্রারম্ভকাল ছিল খুব চিত্তাকর্ষক সময়, একদিকে সমাজের ইতিহাসলেখকের কাছে—নেপোলিয়ন তখন ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করছিলেন এবং অপরদিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসলেখকের কাছে—তখনকার দিনে সামান্য যে কয়টি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ছিল তাদের শান্ত পরিবেশের মধ্যে বস্তুর প্রকৃতির আগাগোড়া পুনর্মূল্যায়ণ চলছিল। যে সব ধারণাকে সুদৃঢ় বলে মনে হত, আবার নতুন করে তাদের বিচার শুরু হয়েছিল।

ইংলণ্ডে ইয়ং এবং ফ্রান্সে ফ্রেসনেল আলোর তরঙ্গতত্ত্বের গোড়াপত্তন করেছিলেন। নরওয়েতে অ্যাবেল এবং ফ্রান্সে গালোয়া আধুনিক বীজ-গণিতের বিশাল ভবনটিতে প্রথম কয়েকটি প্রস্তর সংযোজন করেছিলেন। ফ্রান্সের লাভোয়াশিয়ে ও ইংলণ্ডের ডালটন রসায়নের আশ্চর্য ক্ষমতাকে সকলের সামনে তুলে ধরছিলেন। রসায়নবিদ্, পদার্থবিদ্ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা তাঁদের একটার পর একটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধে পরিমেয় বিজ্ঞান শাস্ত্রগুলির সমৃদ্ধির পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

১৮১৫ সালে একজন অপরিচিত ইংরেজ পণ্ডিত প্রাউট মত প্রকাশ করলেন যে, অতিক্ষুদ্র এমন সব বস্তুকণা রয়েছে, যারা প্রকৃতির অজস্র রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার ফলে তারা ধ্বংসও হয় না বা তাদের পুনর্গঠনেরও প্রয়োজন হয় না। এরা যে পরমাণু, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

ঐ বছরগুলোতেই বিশিষ্ট ফরাসী বিজ্ঞানী লাগ্রাঞ্জ ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যাকে এক সম্পূর্ণ ও সুসামঞ্জস্য রূপদান করেছিলেন। পরে দেখা গেল যে, তার মধ্যে পরমাণুদের জন্যে কোন স্থান ছিল না।

॥ ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার মন্দির ॥

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন কিছুই আকাশ থেকে পড়ে না। খুব সঙ্গতভাবেই বলা যেতে পারে যে, নিউটন থেকে যে ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যা শুরু হয়েছিল কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা তারই মানস-সন্তান।

ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার সৃষ্টিকে একমাত্র নিউটনেরই ওপর আরোপ করা অবশ্য সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। রেনেসাঁর যুগে বহু বিরাট মনীষী যেসব সমস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেগুলোই পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়াল ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার ভিত। এই সব মনীষীদের নাম—লিওনার্দো দ্য ভিনচি, গ্যালিলিও গ্যালিলাই, ডাচ্ অঙ্কবিদ সাইমন স্টেভিন এবং ফ্রান্সের ব্লেজ পাসকাল। বস্তুর গতি সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে যত কিছু গবেষণা হয়েছিল, সেগুলি থেকে নিউটন একটি একীভূত ও সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্বের উদ্ভাবন করলেন।

ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার জন্মের সঠিক তারিখটি সবাই জানি। সময়টা ১৬৮৭ সাল। ঐ বছর নিউটনের গ্রন্থ "ফিলসফিয়া ন্যাচুর‍্যালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা" (প্রাকৃতিক দর্শনের অঙ্কশাস্ত্রীয় নিয়মাবলী) লণ্ডন শহরে প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিকে দর্শন বলা হত।

তাঁর গ্রন্থে নিউটন সর্বপ্রথম ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার তিনটি প্রাথমিক নিয়ম উপস্থাপিত করেছিলেন। পরে এরা অভিহিত হয় নিউটনের তিনটি নিয়ম নামে; বিদ্যালয়ের সব ছাত্রকেই এগুলো পড়তে হয়।

বলবিদ্যার যে সৌধটি নিউটন তৈরি করলেন সেটি অবশ্য তাঁর তিনটি নিয়ম ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং তার নির্মাণকার্য অনেকদিন হল শেষ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর মোটামুটি চেহারাটা যা দাঁড়াচ্ছে, তা এইরূপ।

মহাকাশের 'অসীম শূন্যতার' মধ্যে অতিকায় নক্ষত্র থেকে অতিক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত কত অসংখ্য বিচিত্র ধরণের বস্তু জায়গা জুড়ে রয়েছে।

সুদূর অতীতে এমন এক সময় ছিল যখন সমগ্র বিশ্বটা ছিল গতিহীন, সম্পূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থায়। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে প্রথম 'চালিকা শক্তিটির' প্রয়োগ করে পৃথিবীতে প্রাণসঞ্চার করলেন। ঈশ্বরের কর্তব্য এখানেই শেষ হল। তারপর থেকে মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুর গতিবিধি এবং পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া নির্দিষ্ট নিয়মের বাঁধনে পরিচালিত হতে শুরু করল। এই সব নিয়মের সংখ্যা ছিল অনেক তবে শেষ বিশ্লেষণে এদের সবাইকে কয়েকটি মাত্র প্রাথমিক নিয়মে এনে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল; নিউটনের তিনটি নিয়ম ছিল এদেরই অন্তর্ভুক্ত।

এরপর থেকে আকস্মিক ঘটনা বলে আর কিছু রইল না। সব কিছুই আগে থেকে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। খামখেয়ালীভাবে আর কিছু ঘটবার সম্ভাবনা থাকল না। মহাবিশ্বের সঙ্গীতের আসরে এক পরম ঐক্যতান এখন থেকে বিরাজ করতে শুরু করল।

নিউটনীয় বলবিদ্যার ওপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের যে পরম নিয়মানুগত্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল, নিউটনের এক শতাব্দী পরেও সকল পদার্থবিদের কাছে তা ছিল একান্ত সন্তোষজনক। মহাবিশ্বের কোনও নতুন অংশ ঐ তত্ত্বের সঙ্গে নিজে খাপ খেয়ে যাচ্ছে দেখে প্রতিবারই তারা মনে শান্তি পেতেন। বেশ কিছুকাল ধরে প্রকৃতিও তার নিজের প্রতি এ ধরণের আচরণকে মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু খুব বেশী দিন এটা চলল না। বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, অন্ধ গোঁড়ামির মত ক্ষণস্থায়ী আর কিছু নেই। নতুন যে সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে লাগল, সেগুলোকে আর পুরনো ছকটার মধ্যে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে নিউটনীয় বলবিদ্যা এক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়ল। এটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে, এই সংকট বিশ্বজাগতিক নির্দেশ্যবাদের পতনকেই সূচিত করছে—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'যান্ত্রিক নির্দেশ্যবাদের নিয়ম'। মহাবিশ্বের রহস্যকে যতটা সরল মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা আসলে তা নয় এবং মহাবিশ্ব চিরকালের জন্যে তার ঝাঁপিটিকেও গুটিয়ে বসে নি।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা শুধু যে নতুন জ্ঞান সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তাই

নয়। পৃথিবীর ঘটনাবলীর এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা এর কাছে পাওয়া গেল। এই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান আকস্মিক ঘটনাকে পূর্ণ স্বীকৃতি জানাল। এতে পদার্থবিদরা যে চমকে উঠলেন সেজন্য তাঁদের বোধ হয় দোষ দেওয়া যায় না। যদিও তাঁদের উদ্ভাবিত চিরন্তন নির্দেশ্যবাদের ধারণাটাই আর টিকছিল না, তাঁরা কিন্তু ভাবলেন যে নির্দেশ্যবাদ জিনিসটাই ভেঙে পড়েছে, মহাবিশ্বে কোন নিয়মেরই বালাই নেই এবং ঘটনাবলী নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অধীন নয়। এই গভীর সংকটের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পদার্থবিদ্যার বেশ কিছু সময় লেগেছিল।

॥ মন্দিরটি ভেঙে পড়ল ॥

কৌতূহলী হবার ফলে একটি বেড়াল মারা পড়েছিল। এই প্রবাদ বাক্যটি সম্ভবত তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ; যদিও আজ তত্ত্বটিকে আপাত-দৃষ্টিতে নির্ভুল বলেই মনে হচ্ছে এবং সমস্ত ঘটনাকে এর দ্বারা ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞানের বিকাশের মধ্য দিয়ে যখন এক বহু বিস্তৃত ঘটনাবলীর গবেষণা সম্পূর্ণ হয়, তখন ঐ বিকাশের এক বিশেষ পর্বে একটি তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করাই হয় তত্ত্বটির উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ একই তত্ত্ব অসম্পূর্ণ, এমনকি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় যখন এমন সব নতুন তথ্যের আবিষ্কার ঘটতে থাকে, যারা আর ঐ তত্ত্বের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে খাপ খেতে চায় না।

যতদিন পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা বলবিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার ক্ষেত্রে কোন গোলযোগ দেখা দেয় নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যা এক বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ শুরু করল, যেমন তাপীয় প্রক্রিয়াবলী, আলোক এবং বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক প্রক্রিয়া, যাদের থেকে যথাক্রমে উদ্ভব হল—আলোকবিদ্যা এবং বৈদ্যুতিক গতিবিদ্যার প্রারম্ভপর্ব। কিছুকালের জন্যে পদার্থবিদ্যা খানিকটা আত্মতৃপ্তির অবস্থায় রইল। নতুন যা কিছু আবিষ্কার হচ্ছিল, তা পদার্থবিদ্যার বিদ্যমান ছাঁচটির মধ্যে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার সৌধটি যত ওপরের দিকে বেড়ে উঠছিল, এর সুবিস্তৃত সম্মুখভাগ জুড়ে তত ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করল, ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিল কোথাও কোথাও এবং অবশেষে নতুন তথ্যের সংঘাতে সমস্ত সৌধটিই ভেঙে পড়ল।

এই মূলতম তথ্যগুলির একটি ছিল আলোর গতিবেগের আশ্চর্য নিত্যতা। অত্যন্ত সতর্ক এবং বিষয়নিষ্ঠ পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, অন্য সব পরিচিত ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, আলোর আচরণ সেগুলোর তুলনায় একেবারেই ভিন্ন ধরণের।

ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার কাঠামোর মধ্যে আলোর আচরণকে খাপ খাওয়ানোর জন্যে বিজ্ঞানীদের ঈথার নামে একটি মাধ্যমকে দাঁড় করাতে হল, ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে যা নাকি আশ্চর্য সব গুণাবলীর অধিকারী। এই ঈথারের কথায় আমরা পরে আবার ফিরে আসব এবং তখন আরো খুঁটিয়ে একে পরীক্ষা করব। কিন্তু এই নতুন ঈথারও পুরনো পদার্থবিদ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না।

ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার বিকাশের পথে আর একটি মস্ত বড় বাধা ছিল, তা হ'ল তপ্ত বস্তুর তাপীয় বিকিরণ।

সবশেষে এল তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যাকে তার একচ্ছত্র রাজত্বের শেষ কয়েকটি বছরে দিল এক চূড়ান্ত আঘাত, কেননা তেজস্ক্রিয়তার রহস্যময় প্রক্রিয়া শুধু যে পরমাণুর কেন্দ্রককে বিদীর্ণ করেছিল তাই নয়, তা পদার্থবিদ্যার মূল ভিতটাকেই দিয়েছিল চুরমার করে—আর তার সঙ্গে সেই নিয়মগুলোকে, সাধারণ বুদ্ধির বিচারে যাদের মনে হয়েছিল যথেষ্টই যুক্তিপূর্ণ।

ক্লাসিকাল বলবিদ্যার কাঠামোর এই ফাটলগুলোর ভেতর থেকেই জন্ম নিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

॥ নতুন তত্ত্বের নামকরণ হল কিভাবে ॥

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জন্ম। কিন্তু এর এই নামটি রাখা হল কেন? বস্তুতঃ, যেসব বিষয় ঘিরে ছিল নতুন পদার্থবিদ্যার

কারবার এই নামটির মধ্যে সেগুলো খুব ক্ষীণভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। পদার্থবিদ্যার প্রায় কোন শাখাই নামকরণের ব্যাপারে অস্পষ্টতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নানা কারণে এটা ঘটেছে, কিন্তু কারণগুলি প্রধানত ঐতিহাসিক।

প্রথমতঃ, বলবিদ্যা কথাটা কেন? নতুন তত্ত্বের মধ্যে যান্ত্রিক ব্যাপার তো কিছুই ছিল না এবং পরে আমরা দেখতে পাব, সেরকম কিছু থাকা সম্ভবও ছিল না। যদি তাকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করি, যেমন আমরা যখন ঘড়ির 'মেকানিক্স্' শব্দটি বলতে ঘড়ির যন্ত্রকলার কথা বলি, তখন ওর কাজের পদ্ধতিটাকেই বুঝি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তত্ত্বগত ব্যাপ্তিটা ঠিকমতো ফুলিয়ে উঠতে পারে পদার্থবিদ্যারই প্রশস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে।

দ্বিতীয়ত কোয়ান্টাম কথাটি কেন? ল্যাটিন ভাষায় 'কোয়ান্টাম্' কথাটির অর্থ হল 'স্বতন্ত্র অংশ' বা 'পরিমাণ'। পরে আমরা দেখতে পাব যে, চারপাশের জগতের গুণাবলীর বিচ্ছিন্নতাই হল এই নব্যবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এটাই এর একটি মূল সূত্র। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাব যে, এই আংশিকতা বা বিচ্ছিন্নতা মোটেই সাধারণ নিয়ম নয় এবং সর্বত্র বা সবসময়ে আমরা এর সন্ধানও পাই না।

এ আবার হল সমগ্র ব্যাপারটির একটি দিকের কথা। আর একটি বিচিত্র ঘটনা হল, বস্তুর গুণাবলীর দ্বৈতধর্ম। বস্তুর দ্বৈত প্রকৃতির পরিচয়টা পাওয়া যায় তখনই যখন আমরা দেখি যে, একই সত্তার (বস্তু) মধ্যে কণিকা ও তরঙ্গ, দুয়ের ধর্মই বিরাজ করছে।

নব্য বিজ্ঞানটির তরঙ্গ বলবিদ্যা, এই নতুন নামকরণ হল। কিন্তু এখানেও আমরা সমগ্র ঘটনার অর্ধেকের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি—কোয়ান্টার কোন উল্লেখও এখানে নেই।

আমরা তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোচ্ছি যে, পদার্থবিজ্ঞানের এই নতুন তত্ত্বের কোন নামই সন্তোষজনক হয় নি। কিন্তু বিষয়টির প্রকৃত অর্থের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ একটা নাম ভেবেচিন্তে ঠিক করা কি সম্ভব ছিল না? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নামের প্রবর্তন খাটুনির ও ঝকমারির কাজ। নতুন নামগুলোর প্রচলন হয় ধীরে ধীরে, তারা বদলায় আরো মন্থরগতিতে। যে

নতুন অর্থ নিয়ে এই নামগুলো চালু হয়, পদার্থবিদ্‌রা সে অর্থ বোঝেন ; অতএব আমাদের কাজ হল নামগুলিকে শিখে ফেলা।

॥ পদার্থবিদ্‌রা মডেল তৈরি করেন ॥

মনে করুন, আপনি একটা দড়ির প্রান্তে একটি গোলককে (বলকে) বেঁধে তাকে মাথার চারদিকে ঘোরাচ্ছেন। কাজটা খুবই সোজা ; কেননা আপনি সবকিছুই নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের চারপাশের বস্তু ও ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঠিক এইভাবেই ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা গড়ে উঠেছিল।

একটি মসৃণ অনুভূমিক টেবিলের ওপর দিয়ে একটি গোলককে গড়িয়ে দিন। হাতটি নিষ্ক্রিয় হওয়ার পরেও, অর্থাৎ বলের কাজ শেষ হয়ে গেলেও গোলকটি এগিয়েই চলবে। এই ঘটনাটি এবং এজাতীয় অন্যান্য পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে জাড্য তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। বলবিদ্যার প্রথম মূলসূত্ররূপে নিউটন এর উপস্থাপনা করেছিলেন।

একটি গোলক হাতের ঠেলা বা আর একটি গোলকের ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত গতিশীল হবে না। একটি মসৃণ টেবিলের ওপর গতিশীল গোলক বা স্থিতিশীল গোলক, এই দুয়ের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল রয়েছে : অন্য কোন বল তাদের ওপর কাজ করছে না।

দড়ির সঙ্গে বাঁধা গোলকটির ওপর কিন্তু সব সময়েই এমন একটি বল কাজ করছে যা ওকে বিচ্যুত করছে অবাধ গতির পথ থেকে। ঐ একই গোলক যখন টেবিলের ওপর স্থির অবস্থায় রয়েছে, তখন হাতের ধাক্কা দিয়ে তার ওপর বলপ্রয়োগ করলে চলতে শুরু করবে এবং ওর গতিও বাড়তে থাকবে (বলের পরিমাণ যত বাড়বে, গতির বেগও তত বেড়ে চলবে)। এই পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নিউটনের দ্বিতীয় নিয়মের উদ্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এবারে পরিদর্শক—নিউটনই পুনরায় প্রতিদিনের পরিচিত জগত ছেড়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, 'নভোমাণ্ডলিক সঙ্গতি'—এ যে ব্যাপারটি প্রাচীনকালের দার্শনিকদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল, সেই রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে বের করা। গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে

যেভাবে ঘুরে চলেছে, সেটা ঘটছে কিভাবে এবং ওরা অন্যভাবেই বা ঘুরছে না কেন ?

'সঙ্গতি' শব্দটির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে একটি নিয়মশৃঙ্খলা, এমন একটি নিয়মের ক্রিয়া যা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ব্যাপারটা স্বভাবতই শুধু 'মণ্ডলাকার'-সংক্রান্ত নয়, এমন একটি নিয়ম নিশ্চয়ই কার্যকরী যা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহদের আবর্তনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

চারদিকে ঘুরতে থাকা একটি দড়ির প্রান্তে বাঁধা গোলকের উদাহরণটি আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে। সূর্যের চারদিকের গ্রহগুলোর যে গতি, তা বাস্তবিকই অনেকটা গোলকটির সমগতির মতন, যদিও তা তুলনায় মন্থরতর এবং কোন দড়ির ব্যাপার এখানে নেই। তাহলে কথাটা হল, একটি বল যদি কোন একটি ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়, তাহলে খুব সমীচীনভাবেই মনে করা যেতে পারে যে, অন্য আর একটি ক্ষেত্রেও ঐ বলটি কার্যকরী হতে দেখা যাবে।

গ্রহদের গতি নিয়ন্ত্রণকারী বলটিকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার অবশ্য কোন উপায় নেই। তবে বলটি সেখানে রয়েছে ঠিকই এবং নিউটন তাকে আবিষ্কার করলেন। আমরা জানি, বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণই হ'ল এই বল। নিউটনের প্রতিভার গুরুত্ব হ'ল এই যে, একটি গোলকের গতি ও কক্ষপথে একটি গ্রহের গতি এই দুয়ের মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম রয়েছে, তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে, গোলক ও দড়ির পরীক্ষাটি ছিল বোধ হয় প্রথম পদার্থবিজ্ঞানের মডেলগুলোর মধ্যে অন্যতম। খুব ছোটখাট মাপের পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়েও গ্রহের গতির মতো প্রকৃতির এমন একটা বিরাট ঘটনা সম্পর্কে আমরা খানিকটা ধারণা গড়ে তুলতে পারি—অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়ম কার্যকরী হয়ে আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এটা সর্বত্র এবং সর্বসময়ে যুক্তিযুক্ত হবে কি না। একটি ঘটনার পিছনে যে নিয়মাবলী রয়েছে, সেগুলোকে তুলনায় অনেক বড় বা অনেক ছোট ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করাটা কি ঠিক হবে ?

নিউটনের সময়ে এই প্রশ্নের জবাবটা ছিল খুবই সোজা : যেহেতু ছোট-খাটো একটি ঘটনার ভিত্তিতে গণনার দ্বারা নির্ধারিত বড়জাতের একটি ঘটনার বিকাশ পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে অথবা তার বিপরীত ঘটনাও ঘটছে তখন ধরে নিতে হবে যে, সবকিছুই ঠিক ঠিক খেটে যায়।

আজকের দিনেও মোটামুটি ঐ একই উত্তর শুনতে পাওয়া যায়। হয়ত এগোবার ধরণের মধ্যে খানিকটা তফাৎ রয়েছে। নিউটন বিশ্বাস করতেন যে, প্রথমত মহাবিশ্ব একীভূত একটি ব্যাপার এবং দ্বিতীয়ত, মানুষের স্তরে ও গ্রহনক্ষত্রাদির বিরাট জগতে, উভয় ক্ষেত্রেই যে নিয়মগুলো মহাবিশ্বের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা মূলতঃ একই।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা প্রথম বিশ্বাসটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি না যে, একটি ঘটনার আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ঐ ধরণের বাহ্য ঘটনার অনুগামী।

একটি তোতাপাখী মানুষের কথার অনুকরণ করতে পারে কিন্তু এটা মনে করা নেহাতই বোকামি হবে যে, কথা উচ্চারণ করবার সময় পাখীটা চিন্তাও করছে।

জ্ঞানের জটিলতার মূলে আছে এই ব্যাপার যে, বস্তুজগৎগুলির রাজ্যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, সাধারণ ও অতিবৃহৎ, এই তিন জগতে সম্পূর্ণ পৃথক সব নিয়ম কার্যকরী; সাধারণ বস্তুজগতের নিয়মগুলোকে অন্য আয়তনের জগতে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে একান্ত সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটির তাৎপর্য সঠিকভাবে না বুঝতে পেরে, অবাধ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে নিয়ে পদার্থবিদ্‌রা কাজ করতে বসে অনেক সময়েই ব্যর্থকাম হয়েছেন। পদার্থবিদ্‌রা যখন নিশ্চিত হলেন যে, আনুবীক্ষণিক বস্তুকণারা সাধারণ তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে খাপ খেতে চাইছে না, তখন তাঁরা পরম বিশৃঙ্খলার কথা, নিয়মবিহীন এক প্রকৃতির কথা বলতে শুরু করলেন। যদিও ব্যাপারটা মোটেই সেরকম কিছু ছিল না, পরে আমরা তা দেখতে পাব।

ছোটখাট একটি মডেলকে কেন্দ্র করে বক্তব্য বিষয়কে বোঝার চেষ্টা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোর বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

গ্রহণ করেছে এবং এখনও করছে। সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে মানুষের নিজের হাতে গড়া মডেলের মাধ্যমে এবং প্রায়ই সেটা ঘটেছে এমন সব মডেলের সাহায্যে যা শুধু মানুষের মনেই ছিল, কেননা তাদের তৈরি করা সম্ভব নয়।

দড়ির অবলম্বনযুক্ত গোলকটি ছিল একটি খুব সরল মডেল। যত দিন এগিয়ে চলে, ততই কূটতর মডেল তৈরি হতে থাকে। ওরা ক্রমেই হয়ে উঠছিল আরো জটিল এবং অদ্ভুত। এই মডেলগুলোকে যতই অপরিচিত বলে মনে হোক না কেন, একটি বিষয়ে কিন্তু এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আমাদের চারপাশের যে সাধারণ জগৎ, যাকে আমরা দেখি এবং অনুভব করি, সেই জগতের উপাদান দিয়েই এরা গঠিত।

মানুষের মনের এ এক বিচিত্র ব্যাপার। উদ্ভটতম বিমূর্ততা এবং সামান্যীকরণগুলো সব সময়ে বাস্তবতা থেকেই উদ্ভূত হয়।

॥ সব কিছুরই মডেল তৈরী করা সম্ভব নয় ॥

গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই মডেলের সাহায্যে প্রকৃতির নতুন বিষয়-গুলোর অনুসন্ধানের রীতিটা সব সময়ে সফল হয়ে উঠছিল না। উদাহরণস্বরূপ যেমন ঈথার মডেলটা। এর স্রস্টারা একে দেখছিলেন ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার রক্ষাকর্তারূপে; আলোর গতিবেগের অত্যাশ্চর্য নিত্যতার কোন ব্যাখ্যা করে উঠতে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা পারছিল না।

এই ঈথারের একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করা যাক। এ এমন একটি বস্তু, যা পুরোপুরিভাবে কঠিন, আবার তেমনি পুরোপুরিভাবেই স্বচ্ছ। তাহলে এ কি অভঙ্গুর কাঁচ? আবার নিজের কাঠিন্য সত্ত্বেও, সব ধরণের বস্তুর অবাধ গতির ব্যবস্থা ঈথারকে করতে হয়েছে। অধিকন্তু, বস্তুগুলো এমন হওয়া চাই যে, তারা ঈথারকে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলতে পারবে, যার ফলে সৃষ্ট হবে বায়ুস্রোতের মত একটা কিছু, প্রকৃতই এক ঈথারীয় বায়ু।

বেশ কয়েক বছর ধরে পদার্থবিদ্‌রা ঈথারের এই সব অদ্ভুত গুণাবলীর তাৎপর্য গ্রহণের চেষ্টা করে চললেন কিন্তু তারা ব্যর্থ হলেন। ঈথার একটি

কল্পিত বস্তু বলে প্রমাণিত হল, বাস্তবতার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেল না।

ইথারের ধারণাটিই কিন্তু একমাত্র শিকড়বিহীন ব্যাপার ছিল না। পরমাণু সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার মডেলই ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ও আরো অনেক রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ থেকে শক্তির রহস্যময় নির্গমণকে ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছিল না। এটা শক্তির এমন এক বিকীরণ যা বাইরের কোন উৎস বিনাই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বাধাবন্ধহীনভাবে ক্রমাগত ঘটেই চলেছে।

আইনষ্টাইনের ফোটন তত্ত্বও পুরনো মডেলগুলিকে আর একটি আঘাত দিল। কোন উৎস থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া বিদ্যুৎ-চৌম্বকতরঙ্গ হিসাবে আলোকের ধারণাকে ক্ল্যাসিকাল মডেলের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়া কিছুট জটিল হলেও সম্ভব। একটি তরঙ্গ সম্বন্ধে আমরা এইভাবে ভাবতে অভ্যস্ত যে সর্বদাই একটি বস্তুগত মাধ্যমের গতি থেকেই এর সৃষ্টি: যেমন, সমুদ্রের ক্ষেত্রে জলের গতি, শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে বায়ুর গতি। কিন্তু বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গেরা এক পরম বায়ুহীন প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম।

তাই আলোককে নিউটন যেভাবে দেখেছিলেন সেইভাবে, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র আলোক কণিকার প্রবাহরূপে কল্পনা করাই আরো সহজ। এই কণিকারা জলন্ত বস্তু থেকে নির্গত হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও আমাদের চোখে প্রবেশ করে দর্শনস্নায়ুকে উত্তেজিত করে তোলে এবং তার ফলে আলোর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই কণিকারা শূণ্য দেশের মধ্য দিয়ে কিভাবে এগিয়ে চলে, তা কল্পনা করতে বর্তমানে কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু আলো একই সঙ্গে তরঙ্গধর্মী ও কণিকাধর্মী এরকম কল্পনা করা, যেমনটি আইনস্টাইন করেছিলেন, তা একেবারেই আমাদের অসাধ্য ব্যাপার।

বোর এবং রাদারফোর্ড পরমাণুর যে মডেল নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে আমরা ধারণাযোগ্য একটি ছবি পাচ্ছি। অতিক্ষুদ্র বস্তুকণাগুলি—ইলেকট্রনেরা—একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রকের চারপাশে নির্দিষ্ট সব কক্ষপথে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এই কক্ষপথগুলোর মাত্রা ইলেকট্রন ও কেন্দ্রকদের মাত্রার তুলনায় বহু সহস্রগুণ বড়।

আর একটু বেশী কল্পনাশক্তি থাকলে আমরা পরমাণুকে এক ধরণের

'শূণ্যগর্ভ' গঠনকার্য রূপেও মনে এঁকে নিতে পারি। কেননা আমরা নিজেরাই এক গ্রহজগতে বাস করি, যেখানে ইলেক্ট্রনদের (অর্থাৎ গ্রহদের) মাত্রা কেন্দ্রকের (অর্থাৎ সূর্যের) চারপাশে কক্ষপথের মাত্রার তুলনায় বহু সহস্র গুণ ছোট।

সে যাই হোক, কয়েক বছর পরে দ্য ব্রগ্‌লি যে কথা বলে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণভাবে একেবারে গুলিয়ে দিলেন তা হল এই যে, ইলেকট্রন, পরমাণু কেন্দ্রক এবং সাধারণভাবে আমাদের বিশ্বের সকল নির্মাণ প্রস্তর-এর মধ্যেই রয়েছে সেই একই দ্বৈতভাব যা আইনষ্টাইন ফোটনের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছিলেন ; অর্থাৎ, এরা যুগপৎ তরঙ্গের ও কণিকার ধর্মের অধিকারী। ফলে পূর্বেকার আলোক পরমাণু সমেত বস্তুকণাগুলি আর কিছুতেই আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে রইল না।

॥ ধরাছোঁয়ার বাইরে, অদৃশ্য এক জগৎ ॥

পদার্থবিদ্‌রা এক মহা সমস্যায় পড়লেন। এর আগেও, তাঁরা নতুন নতুন জগতের পথে চলেছেন, তবে সব সময়েই তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, খুঁটিনাটি ব্যাপারেই পার্থক্য দেখা দিতে পারে, মূলগত ব্যাপারে নয়। কিন্তু এখন তাঁদের অবস্থাটা হল সেই পুরাকালের আবিষ্কর্তাদের মত যখন দৈত্যদানা থেকে শুরু করে অর্ধ-পশু এবং অর্ধ-মানুষ, সব কিছুই প্রত্যাশা করা চলতে পারত। একটি জ্বরতপ্ত মনের কল্পনার তো কোন সীমাপরিসীমা থাকে না।

পদার্থবিদদের অবস্থাটা ঐ পুরাকালীন আবিষ্কারকদের চেয়েও খারাপ ছিল, কেননা, শেষোক্তরা যখন সাধারণ মানুষ এবং একটু অন্যভাবে বিন্যস্ত মূলতঃ একই পৃথিবী, পাহাড় এবং সমুদ্রই দেখতে পেতেন, তখন হতাশামিশ্রিত খানিকটা আনন্দের ভাবই তাদের মনে জেগে উঠত। নবপরিচিত জগতে বিজ্ঞানীরা এমন সব অদ্ভুত বস্তুর সন্ধান পেতে শুরু করলেন, কোন নামের দ্বারাই যাদের ঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না। পরমাণুর অস্বাভাবিক নতুন জগতের কোন ছবি অংকন করা কল্পনাতেও সম্ভব হয়ে উঠছিল না।

কিন্তু বিকাশমান বিজ্ঞান দাবী জানাচ্ছিল যে, নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু কিছু মানসিক ধারণা তৈরী হোক, তা সে সব ধারণা যতই অগতানুগতিক বলে মনে হোক না কেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গঠনের কাজটি ছিল কঠিন কিন্তু তাহলেও সেটি করতে হয়েছিল।

চারপাশের জগতের কল্পনীয় মডেলের ওপর ভিত্তি করে তত্ত্ব তৈরীর কাজটি নিশ্চয়ই অনেক বেশী সহজ হত। কিন্তু আনুবীক্ষণিক জগৎটা যদি অন্য ভাবে গড়ে উঠে থাকে? যদি ঐ জাতীয় কোন মডেল দিয়ে কোন কাজই না হয়?

বেশ, যদি এমন মডেলের পরিকল্পনা করা অসম্ভব যার মানসিক ছবি আঁকা যায়, তাহলে আমাদের এমন সব মডেল নিয়ে কাজ করতে হবে যাদের চিত্রায়ণ আদৌ সম্ভব নয়। বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল যদিও খুব বেশী বছর নয়, এবং এই মডেলগুলো একান্তেই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল, তবু তারা পদার্থবিদ্‌দের কাছে এতটাই প্রিয় ছিল যে ওদের ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নন। মনোভাবটা খুবই খারাপ, কারণ খুব শীঘ্রই একটা সময় আসবে—আমাদের গল্পে আমরা যদি আরো খানিকটা এগিয়ে যাই—যখন এই সব মডেলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের জায়গায় আরো বেশী অসাধারণ এমন কতকগুলো মডেল এনে বসাতে হবে, যাদের অনুধাবন করার কাজটা হবে আরো শক্ত। ঠিক এইভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে।

এই শতাব্দীর পদার্থবিদদের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, তাঁরা প্রতিদিনের পরিচিত জগৎ থেকে অনেক দূরবর্তী নানা বিমূর্ততার এবং মডেলের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে তাঁদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের নতুন জগৎ সম্বন্ধে এক সুদূরপ্রসারী তত্ত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়াও, এই ভিত্তির ওপর পদার্থবিদরা সমগ্র সভ্যতার ইতিহাসে কয়েকটি শ্রেষ্ঠতম কীর্তি অর্জন করতে পেরেছেন। তাঁরা পরমাণু কেন্দ্রকের শক্তি রহস্যকে আবিষ্কার করেছেন—যে জিনকে দীর্ঘকালের জন্য বোতলে পুরে রাখা হয়েছিল।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অস্তিত্ব ছাড়া পারমাণবিক শক্তিশিল্প এবং ইলেকট্রনিক্‌স্ বিদ্যার সঙ্গে আজ আমাদের পরিচয়ই ঘটত না।

। জটিল অথচ চিত্তাকর্ষক ।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা দুরূহ বিষয় কেননা তার কল্পনাগুলি অস্বাভাবিক এবং তার ধারণাগুলিকে ঠিকমত অনুধাবন করা যায় না। একথা ঠিক যে, কিছুটা দোষ কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার মধ্যেই আছে। শুধু এই কারণে নয় যে, এর পরিধি ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং এর পদ্ধতিগুলি অধিকতর উন্নত হচ্ছে ; আমরা জানি যে, কোন বিষয়ের মধ্যে যখন পরিবর্তন এবং বিকাশ ঘটছে তখন সে সম্বন্ধে কিছু লেখা সব সময়েই বেশ শক্ত, বিশেষ করে যখন সেই বিকাশ ঘটছে দ্রুতগতিতে ; সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাদি সম্বন্ধে লেখা তুলনায় অনেক সহজ। শুধু তাই নয়, আরো একটি কারণ হল এই যে, পদার্থবিদরাই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার আসল অর্থ নিয়ে এবং যে অতিক্ষুদ্র জগতের ব্যাখ্যা এ দিচ্ছে, তার বিশেষ বিশেষ দিক সম্বন্ধে আজো পর্যন্ত তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা বর্তমানে মহাকাশ যুগে প্রবেশ করেছি, যেখানে আবার পথ রচনার জন্যে পদার্থবিদ্যার ওপরেই ডাক পড়ছে। মহাজাগতিক দেশের পদার্থবিদ্যার সঙ্গে পার্থিব পদার্থবিদ্যার মূল পার্থক্যটা হল এখানেই যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগৎই হল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

বিরাটের সঙ্গে ক্ষুদ্রের মিল সম্বন্ধে যে প্রাচীন ধারণা তার প্রমাণ মেলে বাইরের মহাকাশে। বিশাল আকারের নক্ষত্র এবং অতিক্ষুদ্র পরমাণুরা যে এক জায়গায় মিলে যাচ্ছে তাই নয়, এক অখণ্ড সমপ্রভাব অংশরূপেই এরা রয়েছে।

দৃশ্যগোচর কোন প্রতিরূপের সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ে জনপ্রিয়ভাবে লেখা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্যেই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার আলোচনাতেও আমরা প্রকৃতির মধ্যে মডেল সম্ভব না হলেও সাদৃশ্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করব। অবশ্য এই সব সাদৃশ্য কোনমতেই পুরোপুরি সঠিক অথবা গভীর প্রকৃতির নয়। বিষয়বস্তুগুলো সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা তৈরী করার কাজে এরা আমাদের সাহায্য করছে মাত্র।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখতে পাব যে ইলেকট্রনেরা পরমাণবিক কেন্দ্রকের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, আমাদের কাছে এই কথাটির অর্থ—

আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিবাসীদের কাছে 'তুষার' হল সাদা একটি বস্তু, অনেকটা লবণের মত এবং আকাশ থেকে পড়ে এই কথাটির তাৎপর্যের চেয়ে কিছুমাত্র বেশী নয়। আমরা বর্তমানে ইলেকট্রনদের সম্বন্ধে যা জানি এবং যেভাবে এদের ছবি এঁকে থাকি, সেগুলোর তুলনায়, একটি পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রনের গতি এবং ইলেকট্রনের সত্তার বিষয়টি বহুগুণ বেশী জটিল। এ শুধু আজকের কথা বলা হচ্ছে না, আগামীকাল এবং হাজার বছর পরেও ব্যাপারটা একই থাকবে।

বাস্তবিকই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার বিকাশ ইলেকট্রনের ধর্মাবলীর সীমাহীন বৈচিত্র্য এবং অপরিমেয়তার একটি বাড়তি প্রমাণস্বরূপ। এবং অন্য সব কিছু সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বর্তমানে যে জ্ঞান তাও খুবই সীমাবদ্ধ প্রকৃতির। আমরা সবে পৃথিবীর ত্বক, তার মহাসাগর এবং বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে শুরু করেছি। আমরা সবে প্রান্তর, অরণ্য, পর্বত, নদী এবং মরুভূমির মাঝে জীবনের যে প্রকাশ তাকে বুঝতে শুরু করেছি।

তাই যদি হয়, তাহলে যাদের পর্যবেক্ষণ করা আরো অনেক শক্ত, সেই পরমাণু, পরমাণু কেন্দ্রক এবং প্রাথমিক বস্তুকণাদের সম্বন্ধে একই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করে ওঠা আমরা কিভাবে প্রত্যাশা করতে পারি? এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো কয়েক'শ, কয়েক হাজার বছরের অনুসন্ধানের কাজ অপেক্ষা করে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত আমরা জ্ঞানের একটি বেগবান নদীর উৎসমুখে পৌঁছেছি মাত্র।

তা হলেও এই নবাবিষ্কৃত জগতের অনুসন্ধানকারীদের কাছে কি বিচিত্র সব বিষয়ই না আত্মপ্রকাশ করে চলেছে! এই নব্যবিজ্ঞান কারিগরীবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার সম্মুখে কি প্রেরণাদায়ক এবং সত্যিকারের আশ্চর্যজনক সব দিগন্তই না উন্মুক্ত করে দিচ্ছে!

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, সৌরশক্তিচালিত ব্যাটারি—এরা হল এমনই কয়েকটি নাম। আমরা তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের যুগে সবে প্রবেশ করতে চলেছি এবং বাইরের মহাকাশে আমাদের অভিযান হয়েছে শুরু। সমুজ্জ্বল বর্তমান যুগের এই সব বিরাট

আবিষ্কার এবং এক উদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ যুগের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে, আমাদের শতাব্দীতে ষাট বছর আগে ম্যাক্স্ প্লাংক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উর্বর ভূমিতে এই বীজটি বপন করেছিলেন। অগণিত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক করেছেন তার সযত্ন পরিচর্যা।

। দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নতুন তত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপ

॥ তাপ এবং আলো ॥

কোন ঠাণ্ডা শীতের সন্ধ্যায় একটি গরম স্টোভের পাশে বসে গনগনে অগ্নিশিখার শব্দ শোনা এবং আগুনের তাপ অনুভব করা খুবই চমৎকার। কিন্তু কেন এই তাপের অনুভূতি? একটি স্টোভের পাশে গরমই বা অনুভব করা যায় কেন? ভিতরের আগুনকে চোখে না দেখেও, কেউ খানিকটা দূর থেকে অনুভব করতে পারেন।

একটি স্টোভ থেকে এক ধরণের অদৃশ্যরশ্মি নির্গত হচ্ছে যা থেকে তাপের অনুভূতির সৃষ্টি। এই রশ্মিদের তাপরশ্মি অথবা অবলোহিত রশ্মি বলা হয়।

একটু খেয়াল রেখে পর্যবেক্ষণ করলেই আমাদের নজরে পড়বে যে, তাপীয় বিকিরণ প্রকৃতির রাজ্যে একটি খুবই সাধারণ ঘটনা। একটি মোমবাতি, একটি বড় আগুন এবং আমাদের বিশাল সূর্য—এরা সবাই তাপ এবং আলো ছড়ায়। এমন কি বিরাট বিপুল দূরত্বে রয়েছে যে সব নক্ষত্র, ওরাও পৃথিবীতে তাপরশ্মি পাঠাচ্ছে।

একটি তপ্ত বস্তু যখন জ্বলে তখন তা থেকে নিশ্চিতভাবে তাপরশ্মিও নির্গত হয়। আলো এবং তাপের বিকিরণ আসলে একটিই প্রক্রিয়া। এই কারণেই তাপীয় প্রক্রিয়ার ফলে একটি বস্তু থেকে যে সব বিকিরণ ঘটে বিজ্ঞানীরা তাদের তাপীয় বিকিরণ নাম দিয়েছেন—আলো এবং প্রকৃত তাপীয় বিকিরণ, দুইই এর মধ্যে পড়ে।

গত শতাব্দীতে পদার্থবিদ্‌রা তাপীয় বিকিরণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। সূত্রগুলি আমাদের সকলেরই জানা। এরকম দুটি সূত্রের কথায় আসা যাক।

প্রথম সূত্রটি হল, একটি বস্তু যত তপ্ত হবে সে তত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকবে। যে পরিমাণ বিকিরণ প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত হবে তা বস্তুটির

তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বিপুলভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যদি তাপমাত্রা তিনগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে বিকিরণের পরিমাণ প্রায় একশ' গুণ বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় সূত্রটি হল, বিকিরণের যে বর্ণ, তাপমাত্রার বৃদ্ধির সঙ্গে তারও পরিবর্তন ঘটবে। একটি টর্চের অগ্নিশিখার নীচে ধরে থাকা একখণ্ড লোহার পাইপকে লক্ষ্য করুন। প্রথমে ওকে কালোই দেখাবে, কিন্তু তারপর লোহাটি থেকে আবছা লালচে আভা বেরোতে থাকবে, যার রং বদলে প্রথমে হবে লাল, পরে নারঙ্গী এবং তারপর হবে হলদে। এবং সর্বশেষে তপ্ত ধাতুখণ্ডটি সাদা আলো ছড়াতে শুরু করবে।

একজন অভিজ্ঞ ইস্পাতকর্মী বিচ্ছুরণের বর্ণ দেখেই একটি জ্বলন্ত পাইপের তাপমাত্রা খুবই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন। সামান্য লালচে আভা দেখতে পেলে তিনি বলবেন, তাপমাত্রা এখন ৫০০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছে, হলদে হলে ৮০০° সেন্টিগ্রেড এবং উজ্জ্বল সাদা রং হলে বুঝতে হবে তাপমাত্রা ১০০০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছে।

পদার্থবিদ্‌রা অবশ্য এ ধরণের খাপছাড়া গুণগত বর্ণনায় খুশী হতে পারেন না, তাঁরা চান সঠিক সংখ্যা। একজন পদার্থবিদের কাছে 'দিনটা ঠাণ্ডা' এ কথাটার যে অর্থ, 'তার মুখের আকার ছিল বড়' কথাটার অর্থ প্রায় একই। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হল একজনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোকে জানা, যেমন তার নাক, ঠোঁট, কপাল ইত্যাদি।

পদার্থবিদ্‌রা এমন বহু বিচিত্র বর্ণ এবং পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন যেখানে তাপীয় বিকিরণ ঘটে চলেছে। কিন্তু এই বিচিত্র অবস্থা তাঁদের একটুও খুশী করতে পারে নি। তাঁরা চাইছিলেন একটি 'প্রমাণ' বস্তু, একটা মানদণ্ড, যা হবে তপ্ত বস্তুদের বিকিরণের সূত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার ভিত্তিস্বরূপ। তখন অন্যান্য বস্তু কর্তৃক আলোর নিঃসরণকে এই 'প্রমাণ' বা 'স্ট্যাণ্ডার্ড' থেকে বিচ্যুতিরূপে গণ্য করা যেতে পারবে। এজাতীয় একটি বর্ণনা মনে মনে কল্পনা করুন : "লোকটির নাক ছিল প্রমাণ নাকের তুলনায় খানিকটা লম্বা, কপাল ছিল খানিকটা সরু, চিবুকটা ছিল অনেকটা বেশী বিস্তৃত, চোখদুটো ছিল সাধারণের তুলনায় খানিকটা সবুজ এবং মাপেও খানিকটা ছোট"। আমাদের কাছে এ ধরণের বর্ণনা কিছুটা অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু

পদার্থবিদ উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। তার কারণটা কি, সে কথা এবারে আসবে।

॥ কালোর চেয়েও কালো ॥

যতটা সম্ভব একই বর্ণের কয়েকটি বস্তু নিন। এবারে খুঁটিয়ে এদের পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করুন বর্ণের বিচারে এদের মধ্যে তফাৎটা কোথায়।

খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়বে যে, এদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। একটির হয়ত সামান্য রংয়ের আভা রয়েছে, আর একটির রং ঘন, গভীর ধরণের। এই পার্থক্যের কারণ হল, বস্তুটির ওপর যে পরিমাণ আলো এসে পড়ছে, তার কিছুটা সে শুষে নিচ্ছে, বাকিটা তার দেহ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। স্বভাবতই এই দুটি পরিমাণের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তার পরিবর্তনের প্রসার বিপুল। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বস্তু গ্রহণ করা যাক—একটি ঝকঝকে ধাতুখণ্ড এবং একটুকরো কালো ভেলভেট। ধাতুখণ্ডটির ওপর যে পরিমাণ আলো এসে পড়ছে, সে প্রায় তার সবটাই প্রতিফলিত করছে, কিন্তু ভেলভেটের টুকরোটি বেশীর ভাগ আলোই শুষে নিচ্ছে এবং কোন আলো সে প্রতিফলিত করছে না বললেই চলে।

যাদুবিদরা ভেলভেটের গুণটিকে ভালোভাবেই কাজে লাগিয়ে থাকেন, কারণ একটি বস্তু যদি বেশী আলো প্রতিফলিত না করে, তাহলে সে প্রায় অদৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে। মঞ্চের ওপর একটি কালো পটভূমির সামনে কালো ভেলভেটের ঢাকা একটি বাক্স প্রায় চোখেই পড়ে না এবং যাদুকর হরেক রকম খেলা দেখান; রুমাল, পায়রা, এমন কি তাঁর নিজেরও আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান ঘটাতে থাকেন।

পদার্থবিদরাও কালো বস্তুদের এই ধর্মটি বিশেষ মূল্যবান বলে বুঝতে পেরেছিলেন। প্রমাণ বস্তুর সন্ধানে নেমে তাঁরা কালো বস্তুকেই নির্বাচন করে নিলেন। একটি কালো বস্তু বেশীর ভাগ বিকিরণকেই শুষে নেয় বলে এই বিকিরণের দ্বারা অন্য সব বস্তুর চেয়ে বেশী মাত্রায় তপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রকারান্তরে, একটি কালো বস্তু যখন উচ্চ তাপমাত্রায় তপ্ত হয় এবং আলোর উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা অন্য যে কোন বস্তুর চেয়ে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তীব্রতর ভাবে বিকিরণ ঘটাতে থাকে। তাহলে তাপীয় বিকিরণের পরিমাণমূলক নিয়মগুলো প্রতিষ্ঠার জন্যে কালো বস্তু হল একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক বিকিরক।

আবার দেখা গেল, কালো বস্তুরা নিজেরাই বিভিন্ন রকমে বিকিরণ ঘটিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কয়লার ভুষি কালো ভেলভেটের তুলনায় বেশী কালো অথবা অল্প কালো হতে পারে, তবে তা নির্ভর করবে কি ধরণের জ্বালানী থেকে তা পাওয়া যাচ্ছে। এই পার্থক্যগুলো বেশী নয়, কিন্তু এগুলোর হাত থেকে রেহাই পেলেই ভালো।

এরপর পদার্থবিদরা সবচেয়ে কালো বস্তু—একটি বাক্সর কথা চিন্তা করলেন। তাপীয় বিকিরণকে ধরে রাখবার জন্যে এ হল একটি অত্যন্ত বিশেষ ধরণের বাক্স। এর ভেতরের দেয়ালগুলো ছিল কালো ভুষি দিয়ে মাখানো। একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে একটি আলোর রশ্মি ভেতরে প্রবেশ করলে আর বেরিয়ে আসতে পারে না, চিরকালের জন্যে সে বন্দী হয়ে পড়ে। পদার্থবিদ বলছেন যে, এই বাক্সটির মধ্যে যে পরিমাণ বিকিরণজাত শক্তি প্রবেশ করছে, তার সবটাই সে শুষে নেয়।

এবারে আসুন, আমরা বাক্সটিকে করে তুলি একটি আলোর উৎস ; এই কাজে ওটাকে লাগানোই ছিল উদ্দেশ্য। যথেষ্ট পরিমাণে তপ্ত হলে বাক্সটির দেয়ালগুলো ভাস্বর হয়ে উঠবে এবং দৃশ্যমান আলোক ছড়াতে শুরু করবে। আমরা আগেই বলেছি, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এরকম একটি বাক্স থেকে আলো এবং তাপের বিকিরণ অন্য যে কোন বস্তুর তুলনায় বেশী হবে। আমাদের বাক্স থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যে অন্য বস্তুগুলিকে আমরা ধূসর বলব।

যে বাক্সগুলি 'একেবারে কৃষ্ণতম', সেইগুলির ক্ষেত্রে তাপীয় বিকিরণের সমস্ত নিয়ম অবিকল বিধিবদ্ধ হয়েছিল—এদের 'কালো বস্তু', এই শ্রেণীগত নাম দেওয়া হল। সামান্য রদবদলসহ এই নিয়মগুলো ধূসর বস্তুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

। সঠিক নিয়মাবলী, মোটামুটি ব্যাপার নয় ।

পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায়, আমাদের নিয়মগুলোকে আরো সঠিকভাবে নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

প্রথম নিয়মটির বক্তব্য হল, একটি কালো বস্তুর বিকিরণের ক্ষমতা, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে আলো এবং তাপরূপে যে পরিমাণ শক্তি বস্তুটি ছড়াচ্ছে, তা এর পরম তাপমাত্রার * চতুর্থ শক্তিসূচকের সঙ্গে সমানুপাতিক। গত শতাব্দীর শেষভাগে দুজন জার্মান বিজ্ঞানী স্টেফান ও বোলত্‌জম্যান এই নিয়মটি আবিষ্কার করেছিলেন।

দ্বিতীয় নিয়মটির বক্তব্য হল, একটি কালো বস্তুর তাপমাত্রা যত বেড়ে চলবে, তা থেকে নির্গত উজ্জ্বলতম আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তত ছোট হতে থাকবে এবং বর্ণালীর বেগ্‌নী অংশের দিকে তা সরে যাবে। অস্ট্রিয়ার পদার্থবিদ ডব্লিউ উইনের (W. Wien) সম্মানার্থে এর নাম দেওয়া হয়েছিল উইন ডিস্‌প্লেসমেন্ট ল বা স্থানপরিবর্তনসূচক নিয়ম।

পদার্থবিদরা এখন তাপীয় বিকিরণের দুটি সার্বিক নিয়মকে হাতে পেয়ে গেলেন; নিয়ম দুটিকে সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। একটি বস্তু যত তপ্ত হতে থাকবে, তা থেকে আলোক বিচ্ছুরণের উজ্জ্বলতার যে বর্ণ, প্রথম নিয়মটির কাছ থেকে তার একটি সঠিক বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। মনে হতে পারে যে উইনের নিয়ম পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একেবারেই খাপ খাচ্ছে না, যেহেতু তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটি আরো বেশী পরিমাণে সাদা আলো ছড়াতে শুরু করবে। সাদা, বেগনী নয়।

আর একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যাক। আলোক বিকিরণের সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতার অনুষঙ্গী যে বর্ণ, উইনের নিয়ম শুধু তার সম্বন্ধেই বলছে, অন্য কোনকিছু সম্বন্ধে নয়। এটা মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, এই বিকিরণ ছাড়াও বহু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (অর্থাৎ, অন্য আর একটি বর্ণের) বিকিরণেরাও রয়েছে, যারা আরো কম তাপমাত্রায় শুরু হয়েছিল। একটি

* পরম তাপমাত্রার হিসেব করা হয় ॰ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (Celsius) ২৭৩ ডিগ্রি নিচ থেকে শুরু করে।

বস্তু যখন তপ্ত হয়, এর বিকিরণ বর্ণালীর বিস্তারকে বাড়িয়ে তোলে, বর্ণালীর নতুন নতুন অঞ্চলকে উদ্‌ঘাটিত করে। এর ফলে, তাপমাত্রা যদি যথেষ্ট বেড়ে ওঠে তাহলে আমরা পাই একটি দৃশ্যমান, পূর্ণাঙ্গ, নিঃসারণ বর্ণালী।

এ ব্যাপারটিকে তুলনা করা যায় একটি অর্কেস্ট্রার সঙ্গে, যেখানে ক্রমেই বেশী পরিমাণে যন্ত্র উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের স্বরসৃষ্টি করছে এবং এক সময়ে সমগ্র বাদ্যযন্ত্র এক বিরাট ঐকতানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—ট্রম্বোনের গভীর 'লাল' বনিয়াদ থেকে পিকোলোর সবচেয়ে উচ্চ, তীক্ষ্ণ 'বেগনী' পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। সাদা আলো হল একই সঙ্গে সমগ্র বর্ণালীটা। উইনের নিয়ম যে সঠিক তাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রকৃতি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন কোণ থেকে তাপীয় বিকিরণের অনুসন্ধানকারীদের এক আঘাত হেনে বসল।

॥ অতিবেগুনী বিপর্যয় ॥

পদার্থবিদরা সর্বজাগতিক নিয়মগুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। যখনই দেখা যায় যে, প্রতীত ব্যাপারকে একাধিক নিয়ম নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করছে, তখনই একটিমাত্র সাধারণ নিয়মের মধ্যে ওদের একত্র করবার চেষ্টা করা হয় যার চৌহদ্দির মধ্যে আলোচ্য সব বিষয়গুলোই ধরা পড়বে।

দুজন ইংরেজ পদার্থবিদ র‍্যালে ও জিন্‌স্ তাপীয় বিকিরণের নিয়মগুলোর বেলাতেও এজাতীয় একটি প্রচেষ্টা করেছিলেন। যে একীভূত নিয়মটি তাঁরা দাঁড় করালেন, তার বক্তব্য ছিল এই যে, একটি তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণের তীব্রতা পরম (absolute) তাপমাত্রার সঙ্গে সরাসরিভাবে আনুপাতিক এবং নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বর্গের সঙ্গে বিপরীতভাবে (inversely) আনুপাতিক।

পরীক্ষামূলক সন্ধানকাজের সঙ্গে এই নিয়মটি চমৎকারভাবে মিল খেয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে, দৃশ্যমান বর্ণালীর দীর্ঘ তরঙ্গের অংশটুকুতে সবুজ হলদে এবং লাল রংয়ের ক্ষেত্রেই এই মিলটি ঘটছে। বর্ণালীর নীল, বেগুনী এবং অতিবেগুনী রশ্মির অংশে দেখা গেল, এই নিয়মের জারিজুরি আর খাটছে না।

র‍্যালে জিন্‌সের নিয়ম অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছিল যে, তরঙ্গদৈর্ঘ মাপে যত ছোট হবে, তাপীয় বিকিরণের তীব্রতাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলবে। হাতে কলমে পরীক্ষায় কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া গেল না। উপরন্তু একটি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যকর ব্যাপার হল এই যে, ছোট থেকে আরো ছোট মাপের তরঙ্গদৈর্ঘের দিকে যত এগিয়ে আসা যাবে, বিকিরণের তীব্রতাও যেন সেই সঙ্গে সীমাহীনভাবে বেড়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছিল।

অবশ্যই তা ঘটে না। তরঙ্গের তীব্রতার এক সীমাহীন বৃদ্ধি কখনোই হতে পারে না। একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যদি 'সীমাহীনতায়' এসে পরিণতি লাভ করে, তাহলে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে বড় বস্তু, আরো বড়, এমন কি অকল্পনীয় রকম বিরাট সব বস্তু রয়েছে, কিন্তু একমাত্র মহাবিশ্ব ছাড়া সীমাহীন বড় আর কোন বস্তুই নেই।

বিকিরণের তত্ত্বের মধ্যে এই যে অদ্ভুত এক পরিস্থিতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাকেই 'অতিবেগুনী বিপর্যয়' নাম দেওয়া হল। এটা গত শতাব্দীর শেষভাগের কথা। সে সময়ে, কেউ কল্পনাই করে উঠতে পারেন নি যে, এ শুধু বিশেষ কোন একটি নিয়মের ভরাডুবি ছাড়া আরো অন্য কিছুকেও বোঝাচ্ছিল। আসলে এই নিয়মটি সৃষ্টি হয়েছিল যা থেকে সেই সমগ্র তত্ত্বই ধ্বসে পড়েছিল—ভরাডুবিটা হয়েছিল ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যারই।

॥ গোলকধাঁধার মধ্যে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা ॥

সে সময়ে কিছু পদার্থবিদ ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার বিকাশের পথে বিকিরণ তত্ত্বরূপ এই বাধাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন নি। কিন্তু যে কোন বাধাই চিন্তা করবার মত একটি ব্যাপার, কারণ তত্ত্বের মধ্যে সব কিছুই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আছে। কোন একটি বিষয় যদি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অন্য ঘটনাবলীর যে ব্যাখ্যা ঐ বিষয়টির কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তার ওপরেও আমরা আস্থা স্থাপন করতে পারি না। তত্ত্বটি যদি সামান্য বাধাকে অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে বড় কোন বাধা সে কাটাতে পারবে, তা আশা করা যায় কি?

পদার্থবিদ্‌রা বিকিরণ তত্ত্বের বাধাগুলো অতিক্রম করবার জন্যে বিপুল-

বিক্রমে চেষ্টা করে চললেন। বর্তমানে এই প্রচেষ্টাগুলোকে যুক্তির দিক থেকে অসংলগ্ন বলে মনে হয়। তবুও আর কিই বা প্রত্যাশা করতে পারা যায়? একটি তত্ত্ব যখন গোলমেলে অবস্থার মধ্যে এসে পড়ে, তার অবস্থাটা তখন দাঁড়ায় জলন্ত কোন বাড়ীর মধ্যে একটি বেড়ালের মত—যে বাড়ী থেকে বেরোনোর পথ হল একটিই এবং তা হল একেবারে নদীর মধ্যে। বেড়ালটি বাড়ীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে থাকে কিন্তু সে কখনোই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথাটা চিন্তা করে না, কারণ সেটা হবে বেড়ালটির সমগ্র প্রবৃত্তি-বিরোধী একটি কাজ।

সারা জীবন ধরে যে বাড়ীটির মধ্যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন, তাতে হঠাৎ আগুন ধরে গেলে তাঁরা যখন তার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের অবস্থাটাও দাঁড়ায় ঐ বেড়ালেরই মত। ঐ বাড়ীটি তাঁদের কাছে কতই না প্রিয় এবং ওর সঙ্গে তাঁদের পরিচয়টাও কত গভীর। তাঁরা আগুন নিবিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন, কিন্তু পালিয়ে গিয়ে বাড়ীটি পরিত্যাগ করার কথা তাঁরা চিন্তাই করতে পরেন না।

সে যাই হোক, একটু বেশী তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা এক গোলকধাঁধার মধ্যে এসে পৌঁছেছে। শুধু তাপীয় বিকিরণের তত্ত্বটি যে একমাত্র অন্ধ পথ ছিল তা নয়। ঐ একই বছরগুলোয় ঈথার তত্ত্বের সৌধটিও ভেঙ্গে পড়ল।

এই ভাঙ্গনের ব্যাপারটা এত দ্রুতগাতিতে ঘটল যে, অনেকে এক বিপুল হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। করবার মত আর কিই বা ছিল?

তথ্য যদি তত্ত্বের সঙ্গে খাপ না খায়, তাহলে তথ্য চুলোয় যাক। প্রকৃতি কোন নিয়মকেই মেনে চলতে চায় না। প্রকৃতি হল অপরিজ্ঞেয়। যাঁদের স্নায়ু দুর্বল তাদের প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল এই ধরণেরই।

বস্তুবাদী চিন্তায় যাঁরা অভ্যস্ত সেই বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়াটা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তত্ত্বের দ্বারা যদি তথ্যকে ব্যাখ্যা করে ওঠা সম্ভব না হয়, তাহলে আসল গলদটা তত্ত্বেরই। নতুন ভিত্তির ওপর তত্ত্বকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং কাজটা শুরু করতে হবে অনতিবিলম্বে।

ইতিহাসের কাছ থেকে আবার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বিরাট প্রয়োজনের সময় বিরাট মানুষ জন্ম নিয়ে থাকে। অপরিবর্তনীয় সংজ্ঞাকে

আঁকড়ে ধরে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা যে অন্ধগলির মধ্যে এসে ঢুকেছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখিয়ে দিলেন ম্যাক্স প্লাংক, যিনি ১৯০০ সালে কোয়ান্টাম ধারণাকে প্রবর্তন করেছিলেন, আর পথ দেখালেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, যিনি ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশ করলেন।

॥ নিষ্ক্রমণ পথ ॥

প্লাংকের আবিষ্কারটা ছিল কি ?

প্রথম বিচারে একে আদৌ কোন আবিষ্কার বলা যায় কিনা সন্দেহ। তপ্ত বস্তুর তাপীয় বিকিরণের ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে দুটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। পৃথকভাবে বিচার করে তাদের নির্ভুল বলেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু এক সঙ্গে যুক্ত করে একটি মাত্র নিয়মে যখন তাদের দাঁড় করানো হল, তখন অতিবেগুনী বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে তাদের দাঁড়াতে হল। এ যেন অনেকটা একই ধরণের চিন্তাধারায় অভ্যস্ত দু'জন লোকের দেখা হয়ে যাওয়া ; খানিকটা আলাপ আলোচনার পর দেখা গেল, তাঁরা যত সব 'উদ্ভট' ধারণা এনে হাজির করছেন।

সে সময়ে প্লাংকের বয়স ছিল চল্লিশ। বহু বছর ধরে তিনি তাপীয় বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, তত্ত্বটি এক গোলকধাঁধার মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে ; তাঁর সহকর্মীদের মত তিনিও এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিলেন। তিনি সমগ্র যুক্তির জালকে খুঁটিয়ে দেখলেন এবং সব দেখে শুনে নিশ্চিত হলেন যে, কোথাও কোন ভুল হয় নি। এরপর প্লাংক এক আলাদা রাস্তা ধরে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

পরবর্তীকালে প্লাংক স্মরণ করতেন, শতাব্দীর গোড়ার দিকের ঐ বছরগুলোয় তিনি যে কঠিন পরিশ্রম, তারুণ্যশক্তি ও প্রেরণার সঙ্গে কাজ করেছেন, এমনটা আর কখনো করেন নি। একেবারে অসম্ভব ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে খুবই সম্ভব বলে মনে হতে শুরু করল এবং ধর্মান্ধ শক্তির মত জেদের সঙ্গে তিনি তত্ত্বটির একটির পর একটি রূপায়ণ করে চললেন।

গোড়াতে তিনি খুবই সরল ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।

র‍্যালে এবং জীন্‌স্‌ তাপীয় বিকিরণের দুটি নিয়মকে একটি নিয়মের মধ্যে যুক্ত করেছিলেন এবং ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গদের ক্ষেত্রে পরীক্ষাকালে তাঁরা একটি খাপছাড়া ফল পাচ্ছিলেন। হয়ত এই নিয়মগুলোকে উইনের নিয়মের সঙ্গে একটু অন্যভাবে যুক্ত করে যুক্তিগ্রাহ্য কিছু ফল পাওয়া সম্ভব হতেও পারে।

পরীক্ষামূলক তথ্যরূপে প্লাংক একটি সাধারণ সূত্র হাতে পাবার চেষ্টা করছিলেন, যে সূত্রের সঙ্গে ঐ তথ্যের কোন বিরোধ দেখা দেবে না। কিছুটা অনুসন্ধানের পর এরকম একটি সূত্র তিনি খুঁজেও পেলেন। সূত্রটি ছিল একটু জটিল। এমন সব উক্তি সূত্রটির মধ্যে ছিল, আপাতদৃষ্টিতে যার কোন সুস্পষ্ট পদার্থগত অর্থ নেই—তা যেন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন কতকগুলো রাশির দুর্ঘটনাসংঘাত এক সংযোগ। কিন্তু ভারী আশ্চর্য, এই কল্পিত সূত্রটি পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে যাচ্ছিল।

এছাড়াও, এ সূত্রটি থেকে প্লাংক স্টেফান বোলত্‌জমান নিয়ম ও উইনের নিয়মের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন। সামগ্রিকভাবে দেখলে সূত্রটির মধ্যে কোন 'সমীক্ষা' ছিল না। পদার্থবিদ বলবেন, এ হল নির্ভুল একটি সূত্র।

জয়লাভ? বেরিয়ে আসবার একটা রাস্তা? ঠিক তা নয়। একজন সত্যকারের বিজ্ঞানীরূপে প্লাংক সন্দেহ প্রকাশ করতেই চাইছিলেন।

একটি পিয়ানোর চাবিগুলোকে যদি বার কুড়ি এলোপাথাড়ি আঘাত করা যায় তাহলে একটা কিছু সুর বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু এভাবে একটি সুন্দর সৃষ্টি হবে, তার প্রমাণ কোথায়? অন্য কিছু থেকে সূত্রটির ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। • বিজ্ঞান এমন কোন রীতি মানে না, যার দ্বারা বিজয়ী ব্যক্তিকে সমালোচনা করা না হয় এবং অত্যন্ত মূলগতভাবেই। বিজয়ী বক্তি প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রতিযোগিতার প্রতিটি পদক্ষেপ যতক্ষণ পর্যন্ত না সপ্রমাণিত করতে পারছেন, ততক্ষণ জয়ের ব্যাপারটা খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় না।

এবং ঠিক এখানেই প্লাংক ব্যর্থ হলেন। সূত্রটি ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো থেকে উদ্ভূত হতে চাইছিল না। তবুও অত্যাশ্চর্যভাবে পরীক্ষামূলক তথ্যের সঙ্গে ওটা বেশ মিলে যাচ্ছিল।

প্লাংক দেখলেন, তিনি এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে এসে পৌঁচ্ছেছেন।

তিনি কি ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের তথ্যবিরোধী মতকে গ্রহণ করবেন অথবা তথ্যগুলোর স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে পুরনো তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন? প্লাংক তথ্যের পক্ষই অবলম্বন করলেন।

॥ শক্তির কোয়ান্টাম ॥

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার মধ্যে এমন কি ছিল যার থেকে প্লাংকের সূত্রের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল? সেটা আর কিছুই নয়। সেটা হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক একটি আশ্রয় বাক্য: সে সময়কার পদার্থবিদদের কাছে এই উক্তিটি ছিল খুবই প্রচলিত এবং প্রায় ধ্রুবসত্য যে, শক্তি হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক।

প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে, কথাটা ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না; একেবারে গোড়া থেকেই পদার্থবিদ্যা বস্তুর বিচ্ছিন্নতাকে একটি মূলসূত্ররূপে মেনে নিয়েছিলেন। ব্যাপারটা তো খুবই পরিষ্কার। পৃথিবীতে যদি স্থান থাকে, তাহলে সব বস্তুকেই পরস্পরের থেকে পৃথক ভাবে থাকতে হবে এবং এদের সীমারেখাও থাকবে। বিভিন্ন বস্তুরা পরস্পরের মধ্যে খুশীমত ঢুকে পড়ে না। প্রত্যেকেরই সীমা কোন একটি জায়গায় এসে শেষ হচ্ছে।

হয়ত বস্তুদের অভ্যন্তরে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। তা অবশ্য নয়, এখানেও কোন অবিচ্ছিন্নতা আছে বলে মনে হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা অণুদের এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শূন্য স্থানের অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। অণুদের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে, শুধু এদের মধ্যেকার শূন্য স্থানটুকু হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন।

ঘটনাক্রমে, অণুর দল এই শূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ঘটাতে পারছিল। ফ্যারাডের সময় থেকেই, ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা অন্তর্বর্তী এমন কোন অন্তর্বর্তী মাধ্যমের অস্তিত্বকে দাঁড় করিয়ে এই ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছিল, যে মাধ্যমের মারফৎ অণুদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলাফল সঞ্চারিত হতে পারে।

শক্তির ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াবে? ধরে নেওয়া হয়েছিল যে অণুদের

যখন সংঘাত ঘটত, তখন যে কোন চিন্তনীয় পরিমাণে আদানপ্রদান ঘটত? এই আদানপ্রদানের ব্যাপারটি বিলিয়ার্ড বলেদের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো প্রচলিত তাদেরই অবিকল মেনে চলছিল। একটি সচল অণু যখন একটি স্থিতিশীল অণুকে আঘাত করে, তখন তার গতিশক্তির খানিকটা খোয়া যায় এবং অণু দুটি এরপর বিভিন্ন দিকে গতি লাভ করে। মুখোমুখি সংঘাত ঘটলে, সংঘাতী অণুটি একেবারে অচল অবস্থাও লাভ করে বসতে পারে, সে অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত অণুটি প্রথমটির গতি নিয়ে ছুটতে থাকবে। অণুরা সব সময়েই পরস্পরের মধ্যে শক্তির আদানপ্রদান করে চলেছে।

আর এক ধরণের শক্তির সন্ধান পাওয়া গেল, যা স্পষ্টতঃ আণবিক গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়—সে হল তরঙ্গপ্রবাহের শক্তি। যেহেতু ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করেছিলেন যে আলো হল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, সেহেতু আলোক বিকিরণের শক্তিকে (যেমন, তাপীয় উৎসজাত) সেই সব নিয়ম অনুসরণ করতে হবেই যেগুলিকে সকল তরঙ্গই মেনে চলে।

এই শক্তিও অবিচ্ছিন্ন। জলপ্রবাহের মত চলমান তরঙ্গের সঙ্গে একযোগে শক্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে উপযুক্ত হয়, ঠিক যেমন জল অবিরত এবং অবিভক্তভাবে একটি পাত্রকে পূর্ণ করে।

একখণ্ড মাখনকে যখন আমরা কেটে নিই, তখন আমরা কিন্তু টুকরো-টার অবিচ্ছিন্নতার কথা ভাবি না। আমরা ধরে নিই ওকে আমাদের খুশীমত যে কোন ছোট চেহারায় এনে দাঁড় করাতে পারব। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন অণুদের ধারণাটির প্রবর্তন ঘটল, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাখনের অণুর চেয়ে আকারে ছোট কোন মাখনের টুকরো নেই।

শক্তির ব্যাপারে এই রকম কোন বিশ্লিষ্টতার ধারণা প্রচলিত ছিল না। মনে হচ্ছিল যে, বস্তুর পারমাণবিক গঠন এমন কোন দাবী করে না যে, শক্তিও নানা 'টুকরো'র সমবায়ে তৈরী।

শক্তি যে টুকরো টুকরো নয়, তা বোঝার জন্য আমাদের চারিদিকে তাকিয়ে দেখাই যথেষ্ট। একটি মোমবাতির আলো বিকিরিত শক্তির

অবিচ্ছিন্ন ধারায় একটি ঘরকে ভরে তোলে, ঠিক যেমন সূর্য থেকে আলোর এক নিরন্তর প্রবাহ বয়ে চলে। অথবা ধরা যাক, পাহাড় থেকে নামার সময় একটি রেল এঞ্জিনের বা পতনশীল একখণ্ড পাথরের গতির (সেই সঙ্গে শক্তিরও) স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির ঘটনাটা।

শক্তিকে সংগ্রহ করে ছোট ছোট অংশে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, এ ব্যাপারটা মুহূর্তের জন্যে কল্পনা করুন। বেশ কয়েক বছর আগেকার ছায়াচিত্রের ঝাঁকুনিযুক্ত গতির কথা কারো মনে পড়ে যাবে। কেউ হয়ত একটি মোম-বাতির জ্বলে ওঠা এবং নিবে যাওয়া, সূর্যের ঝলকে ঝলকে আলো ছড়ানো, যেমন এক ঝলক বিকিরিত শক্তি এবং পরের ঝলকটি আসা পর্যন্ত এক স্তব্ধতা—এ জাতীয় ছবিগুলোর কথা ভাববেন। কিংবা ঢালু জমি বেয়ে নামার সময় ট্রেনের গতির ঝাঁকুনি, একটি পাথর জমিতে এসে আছড়ে পড়বার আগে বাতাসের মধ্য দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে তার নেমে আসা।

প্লাংক যখন প্রথমবারের মত নির্দেশ করলেন যে, বিকিরণের শক্তির (বস্তুর মতই) গঠন হল পারমাণবিক এবং একে সংগ্রহ করা ও মুক্তি দেবার কাজটা অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, ঘটে ছোট ছোট অংশের আকারে, ল্যাটিন কোয়ান্টাম (অর্থ হল রাশি) কথাটি থেকে তিনি যাদের নাম দিয়েছিলেন কোয়ান্টা, তখন খুব সম্ভব যে জবাবটা তিনি পেয়েছিলেন তা হল "একেবারেই অর্থহীন"। তিনি যদি তখন শুধু জানতে পারতেন পরিমাণের এই রকম রাশি থেকে কালক্রমে কি গুণরাজিই না উৎপন্ন হবে!

প্লাংকের সূত্রের জন্যে কোয়ান্টাম ধারণা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোয়ান্টা ছাড়া প্লাংকের সূত্র নিতান্তই ব্যর্থ হত এবং আরও অনেক অপ্রমাণিত তত্ত্বের মত বিজ্ঞানের পুরনো কাগজের ধূলিময় দপ্তরখানায় তোলা থাকতো। এই শক্তি কোয়ান্টাগুলিই প্লাংকের সূত্রের সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে কাজ করেছিল। কিন্তু ভিতটা প্রায় কোন কিছুর ওপরেই দাঁড়ায়নি, যেহেতু ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যায় এর জন্যে কোন জায়গাই ছিল না। সতর্ক প্লাংককে ঐ ব্যাপারটাই চিন্তিত করে তুলেছিল। সারাজীবনের একটি অভ্যাসকে ত্যাগ করা কখনোই খুব সহজ কাজ নয়।

রহস্যময় কোয়াণ্টা

'আলোর' একটি কোয়াণ্টাম হল খুবই সামান্য এক টুকরো শক্তি। সবচেয়ে ক্ষুদ্র ধূলিকণার মধ্যে কোটি কোটি পরমাণু রয়েছে। একটি ছোট জোনাকি পোকা যে পরিমাণ বিকীরিত শক্তি ছড়িয়ে থাকে, তার মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি কোয়াণ্টা।

এখন আমরা এই আলাদা শক্তির টুকরোগুলোর পরিমাণের মাত্রার কথায় আসব। প্লাংক যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন, তা হল— বিভিন্ন ধরণের বিকিরণের ক্ষেত্রে এই টুকরোগুলোর মধ্যে তফাৎ ঘটতে দেখা যাবে। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ যত ছোট হবে, অর্থাৎ তার কম্পনসংখ্যা যত বেশী হবে (সোজাকথায়, তা যত বেগুনী হতে থাকবে), শক্তির টুকরোও তত বেড়ে চলবে।

অংকের বিচারে, উভয়ের সম্পর্ককে প্লাংকের বিখ্যাত সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যথা :

$$E = hv$$

এখানে, 'E' হল কোয়াণ্টামের শক্তির পরিমাণ ; 'v' হল কোয়াণ্টামের কম্পনসংখ্যা, 'h' হল একটি আনুপাতিক সংখ্যা, আমাদের পরিচিত সব ধরণের শক্তির ক্ষেত্রেই যার পরিমাণ সমান হতে দেখা যায়। একে বলা হয় 'প্লাংকের ধ্রুবক' অথবা 'কাজের কোয়াণ্টাম'। পদার্থবিজ্ঞানের কাছে এই সংখ্যাটির মূল্য যত বেশী, পরিমাণেও সে ঠিক ততটাই ছোট : 6×10^{-27} আর্গ প্রতি সেকেণ্ডে।

একটি মোমবাতিকে বা সূর্যকেও আমরা যে ক্রমাগতভাবে জলতে দেখি, তার মূলে রয়েছে কোয়াণ্টামের এই অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ। ব্যাপারটা বোঝার জন্যে একটি 25 ওয়াটের ইলেকট্রিক আলোর বাল্‌ব্‌ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলো কোয়াণ্টা বিকীরিত হচ্ছে, তার একটা হিসেব করা যাক। বিকীরিত আলো যদি হলদে রংয়ের হয়, তাহলে প্লাংকের সূত্রের সাহায্যে আমরা যে সংখ্যাটি পাচ্ছি, তা হল 6×10^{19} অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে

৩

শক্তির টুকরোর সংখ্যা 6 লক্ষ কোটির কোটিগুণ। একটি ছোট 25 ওয়াটের বাল্‌ব্‌ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে এর সবটা বিকীরিত হচ্ছে।

সহজেই বোঝা যায়, এই মাত্রার শক্তি মানুষের চক্ষুগোচর নয়। তবুও ব্যাপারটা তা নয়। মানুষের চোখ যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি যন্ত্র, তা সোভিয়েত পদার্থবিদ এস. ভ্যাভিলভের পরীক্ষার দ্বারা পরিষ্কারভাবেই প্রদর্শিত হয়েছে। একজন পরিদর্শককে কিছু সময়ের জন্যে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল (চোখের স্পর্শকাতরতা বাড়ানোর জন্যে) এবং তারপর একটি অত্যন্ত দুর্বল আলোর উৎসকে জ্বালানো হল, যে আলো প্রতি সেকেণ্ডে কয়েকটি মাত্র কোয়াণ্টাকে সৃষ্টি করছিল। চোখ এদের প্রায় পৃথক সত্বারূপেই লিপিবদ্ধ করেছিল।

কোয়াণ্টার মাত্রা আলোচনার বিষয় নয়, বরং যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওরা পরস্পরকে অনুসরণ করে চলে, সেটাই হচ্ছে বক্তব্য। আমরা আগেই দেখেছি, এমনকি একটি ছোট আলোও প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি কোয়াণ্টা নির্গত করে থাকে। অন্য যে কোন যন্ত্রের মত, মানুষের চোখও ঘটনা ঘটার কিছুটা সময় পরে কাজ করে। যে সব ঘটনা ক্রমিকভাবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে, চোখ তাদের লিপিবদ্ধ করতে পারে না। চোখের এই জাড্যতা—জাতীয় ধর্মই সচল ছায়াচিত্রের প্রদর্শনীকে সম্ভব করে তুলেছে। পর্দার ওপর আমরা একটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহকে ঘটতে দেখি, যদিও আমরা জানি ছবিগুলো আসলে আলাদা আলাদা ফ্রেমের আকারে রয়েছে।

আলোর উৎস থেকে যে শক্তির কোয়াণ্টা ছড়িয়ে যায়, তারা পরস্পরকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, যার জন্যে মানুষের চোখে আলো একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের আকারে প্রতিভাত হয়।

ভ্যাভিলভ তাঁর পরীক্ষাবলীর অনুষ্ঠান করেছিলেন ১৯৩০এর দশকে, যখন প্লাংকের কোয়াণ্টার ধারণা সাধারণের মাঝে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্লাংক সরাসরি পরীক্ষার দ্বারা তাঁর আবিষ্কারের বিষয়টি প্রমাণ করে উঠতে পারছিলেন না।

হাতেকলমে পরীক্ষায় একটি সূত্র প্রমাণিত হচ্ছে, অথচ কোন তত্ত্ব থেকে তার সমর্থন মিলছে না, এই ব্যাপারটা গোড়াতে সব সময়েই কেমন যেন

সন্দেহজনক বলে মনে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে, কারণ সূত্রটি যে তর্কবিচারের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল প্রচলিত চিন্তাধারার সম্পূর্ণই বিরোধী। সে কারণেই, প্লাংক যখন বার্লিনের বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন, তখন তা বিজ্ঞান মহলগুলোতে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারল না। বিজ্ঞানীরাতো মানুষই, কাজেই সাধারণের ধরাছোঁয়ার অনেক বেশী বাইরে কোনকিছুকে আয়ত্ত করতে তাঁদেরও সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্লাংক নিজেও ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ওপর তাঁর আক্রমণের সাহসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন এবং তার ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পরে যে সব বিপুল অগ্রগতি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবকে সূচিত করে তুলল, অবশ্যই প্লাংক তা কখনো কল্পনা করে উঠতে পারেন নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি বছর—১৯০১, ১৯০২, ১৯০৩, ১৯০৪ সাল কেটে গেল, কিন্তু কোয়াণ্টার তত্ত্বের প্রতি কারো বিশেষ কোন মনোযোগ আকৃষ্ট হল না। বিষয়টির ওপর যে আলোচনাপত্রগুলো প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোকে হাতের আঙুলেই গোনা যায়।

॥ একটি অবর্ণনীয় পরিস্থিতি ॥

কিন্তু তারপর ১৯০৫ সালে সুইস পেটেণ্ট অফিসের একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত কর্মী, অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন, বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে আলোকবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব, 'ফিজিক্যালিস্কে রুন্তস্কাউ' নামক জার্মান পত্রিকায় প্রকাশ করলেন।

যে সময়ে আইনষ্টাইন এই গবেষণাকাজ সুরু করেছিলেন, তখন ঐ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কাজ বেশ কয়েক বছর এগিয়ে গেছে। ১৮৭২ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. স্তলেতভ্ ঐ প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীকালে দুজন জার্মান পদার্থবিদ হার্ৎজ্ এবং লেনার্ড এ বিষয়ে গবেষণা করেন।

স্তলেতভ্ একটি পাত্র থেকে বাতাস পাম্প করে বার করে দিয়ে তার

মধ্যে দু'টি ধাতব পাত রাখলেন এবং একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর দুই মেরুর সঙ্গে এদের যুক্ত করে দিলেন। স্বভাবতই, বায়ুহীন স্থানের মধ্য দিয়ে কোন বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটছিল না। কিন্তু যখনই একটি পারদ বাতির আলো কোন একটি ধাতব পাতের ওপর ফেলা হচ্ছিল, বৈদ্যুতিক বর্তনীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে সুরু করল। বাতিটি যখন নিবিয়ে ফেলা হল, বিদ্যুৎপ্রবাহও তখন থেমে গেল।

স্তলেতভ্ এই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, বিদ্যুতের বাহকেরা (ইলেকট্রনেরা) পাত্রের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং তারা কেবল তখনই জন্মলাভ করেছিল যখন ধাতব পাতটি আলোকিত করা হয়েছিল।

এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তপ্ত কোন তরল পদার্থের উপরিভাগ থেকে অণুরা বায়ুর মধ্যে যেভাবে লাফিয়ে ওঠে, অনেকটা একইরকম ভাবে এই ইলেকট্রনেরাও আলোকিত ধাতুটি থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল। সে যাই হোক, 'অনেকটা একইরকমভাবে' কথাটির আসল অর্থ হল 'সম্পূর্ণ ভিন্নরকমভাবে'। ধাতু থেকে ইলেকট্রনের নির্গমন হল মূলগতভাবে একেবারে আলাদা একটি ব্যাপার এবং উপরন্তু এর প্রকৃতিও ছিল অপরিচিত।

আলো হল একটি বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ। ঐকটি তরঙ্গ কিভাবে ধাতু থেকে ইলেকট্রনকে ধাক্কা মেরে বার করে দিতে পারে, সেটা কল্পনা করা শক্ত। এখানে শক্তিসম্পন্ন অণুদের কোন সংঘাত ঘটছে না, যার ফলে একটি অণু হয়ত তরল পদার্থের উপরিভাগ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে।

আর একটি চমৎকার ব্যাপার লক্ষ্য করা হয়েছিল। পরীক্ষিত প্রতিটি ধাতুর ক্ষেত্রেই দেখা গেল, আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে। এই তরঙ্গদৈর্ঘ ছাড়িয়ে গেলেই পাত্রের মধ্যেকার ইলেকট্রনেরা সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায় এবং আলো যত জোরালোই হোক না কেন, বিদ্যুতের প্রবাহও বন্ধ হয়ে যায়।

এ একেবারেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, ধাতু থেকে ইলেকট্রন বেরোচ্ছে, কারণ আলো কোনরকমভাবে এদের শক্তি জোগাচ্ছিল। আলোর জোর যত বেশী হবে, বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তিও তত বেড়ে চলবে। ধাতব পাত অনেক বেশী শক্তি গ্রহণ করে এবং অনেক বেশী পরিমাণ ইলেকট্রন তা থেকে ধাক্কা মেরে বার করে দেওয়া যায়।

কিন্তু আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ যাই হোক না কেন, ধাতব পাত শক্তি গ্রহণ করে চলবেই। এটা ঠিক যে, তরঙ্গদৈর্ঘ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণও কমে আসে এবং ধাতবপাত থেকে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যাও কমে যায়, কিন্তু তবুও একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ সেখানে ঘটতে থাকবেই। অথচ হাতেকলমে পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছিল, আদৌ কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটছে না। কারো মনে হতে পারে, ইলেকট্রনেরা বিকীরিত শক্তিকে আর গ্রহণই করছে না।

শক্তিরূপী যে খাদ্যকে ইলেকট্রনদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের এত বাধ্যবাধকতা কেন, তা বোঝা যায়ই বা কিভাবে? এ ছিল এমন একটা ব্যাপার, পদার্থবিদ্‌রা কিছুতেই যা আয়ত্ত করে উঠতে পারছিলেন না।

॥ ফোটন ॥

আইনস্টাইন আলোকবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াকে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেন। আলোর প্রভাবে ধাতুখণ্ড থেকে ইলেকট্রন নির্গমনের প্রকৃত প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে তিনি একটি ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতুখণ্ডটির ওপর ইলেকট্রনেরা দল বেধে জড়ো হয়ে থাকে না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইলেকট্রনেরা ধাতুখণ্ডের সঙ্গে কোন বলের প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে। ধাতু থেকে এদের ছিটকে বার করে দিতে হলে অল্প পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। স্তলেতভের পরীক্ষায় আলোক তরঙ্গেরা এই শক্তিকে যুগিয়েছিল।

কিন্তু আলোকতরঙ্গের একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ আছে, যা এক ভগ্নাংশ বিশেষ এবং একটি ইলেকট্রন যে সামান্য আয়তন জুড়ে থাকে তার মধ্যেই এর সবটুকু শক্তি যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। অর্থাৎ কিনা, আলোকপ্রক্রিয়ায় একটি আলোকতরঙ্গ একটি ক্ষুদ্র 'কণিকার' মত ব্যবহার করে। এ একটি ইলেকট্রনের ওপর আঘাত হেনে, তাকে ধাতু থেকে স্থানচ্যুত করে।

এ নিশ্চয়ই একটি আলোককণা, নিউটনের ভাষায় কণিকা (করপাস্‌ল), কারণ তিনি আলোকে তরঙ্গরূপে নয়, কণাপ্রবাহ বা কণাস্রোত বলে মনে করতেন। তাহলে এ জাতীয় একটি কণার শক্তির মাপটা হবে কত। হিসেব

করে দেখা যাচ্ছে, সে মাপটা খুবই ছোট। তাহলে ধরেই নেয়া যাক না কেন যে, এ হবে হুবহু কোয়ান্টামের মাপের সমান, পাঁচ বছর আগে প্লাংক যার কল্পনা করেছিলেন।

তাই আইনস্টাইন বললেন যে, আলো হল সোজা কথায় শক্তির কোয়ান্টামের প্রবাহ; একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সব কোয়ান্টামের মাপ একেবারে এক, অর্থাৎ কোয়ান্টামগুলি সবাই শক্তির সমপরিমাণ অংশকে বয়ে নিয়ে চলেছে। পরবর্তীকালে, আলোর শক্তির এই কোয়ান্টামদের নাম দেওয়া হয়েছিল ফোটন।

ব্যাখ্যার কাজটা এবারে সম্পূর্ণ হয়ে এল। স্বল্পপরিমাণ শক্তি বহন করে একটি ফোটন একটি ইলেকট্রনকে যথেষ্ট পরিমাণ বলের দ্বারা আঘাত করে ধাতুখণ্ড থেকে তাকে ছিটকে বার করে দেয়।

অন্যদিকে, ফোটনের শক্তি যদি ধাতুখণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রনের বাঁধনকে নস্যাৎ করে দেবার মত যথেষ্ট না হয়, তাহলে অবশ্যই ইলেকট্রনেরা বেরিয়ে আসবে না এবং কোন বিদ্যুৎপ্রবাহও সৃষ্টি হবে না। প্লাংকের সূত্র অনুযায়ী, একটি কোয়ান্টামের শক্তির পরিমাণ তার কম্পনসংখ্যার দ্বারা নিরূপিত হবে এবং আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বেশী হবে, কম্পনসংখ্যাও তত কমবে। কাজেই এটা তো বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আলোকবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ব্যাপারটা সোজা কথায় হল এই: যদি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যধিক হয়, তাহলে ধাতুখণ্ড থেকে ইলেকট্রনকে স্থানচ্যুত করবার মত যথেষ্ট শক্তি ফোটনদের থাকবে না।

উপরন্তু, আলো যত তীব্রই হোক না কেন তাতে বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটবে না; একহাজারটি হোক বা মাত্র দুটি ফোটনই হোক, ধাতুখণ্ডটির ওপর আঘাত হেনে ইলেকট্রনদের ওপর যদি তারা গোলাবর্ষণ করে, ইলেকট্রনরা নির্বিকার থাকবে। ফোটনেরা যথেষ্ট পরিমাণ শক্তির অধিকারী হলেই অবস্থাটা পালটে যাবে। এক্ষেত্রে, আলোর তীব্রতা যত বেশী হবে, তত বেশী ফোটন প্রতি সেকেণ্ডে ধাতুখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ইলেকট্রনেরাও অনেক বেশী সংখ্যায় নির্গত হবে, ফলে তৈরী হবে এক জোরালো বিদ্যুৎপ্রবাহ।

এভাবে, একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু প্লাংক প্রকল্পের মত,

এটিও ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিস্তার ভিত্তিতে ফাটল ধরাল। ক্ল্যাসিকাল পদার্থ-বিদ্যায় আলোকে গণ্য করা হয় বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গরূপে, কোনক্রমেই হাল আমলের ফোটনরূপে নয়। আইনস্টাইন-এর তত্ত্ব আলোর মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে দু' শতাব্দীর পুরনো যুক্তিতর্ককে আবার খুঁচিয়ে তুলল।

॥ আলো কি ॥

প্রকৃতপক্ষে, যুক্তিতর্কের ব্যাপারটা কখনোই ক্ষান্ত হয় নি। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিস্তার সৃষ্টির গোড়ার দিকে সমস্যাটার উদ্ভব হয়েছিল এবং এর জীবনটা এক ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কাটে। সমস্যা ছিল এই: আলো আসলে কি, তরঙ্গ না কণিকা?

দুটো দৃষ্টিভঙ্গী পদার্থবিস্তার জগতে প্রায় একই সঙ্গে এসে হাজির হয়। নিউটন বলেছিলেন, আলোককণার প্রবাহকে নির্গত করেই বিভিন্ন বস্তু উজ্জ্বল দেখায়। নিউটনের সমসাময়িক, হল্যাণ্ডের হাইগেন্‌স্‌ বলেছিলেন যে, বস্তুরা আন্দোলিত হয়ে চারপাশের ঈথারে তরঙ্গ সৃষ্টি করে দীপ্তিমান হয়।

প্রতিটি তত্ত্বেরই সমর্থকের দল ছিল এবং গোড়া থেকেই তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছিল। এই সংঘর্ষটা ছিল খুবই জোরালো ধরণের এবং তা একশ' বছরেরও ওপর ধরে চলছিল। প্রথমে হয়ত একপক্ষের জয় হল আবার তারপরে অপরপক্ষেরা জয়ী হলেন।

পরিশেষে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইয়ং, ফ্রেসনেল এবং ফ্রাউনহোফেরের পরীক্ষাদির ফলে আলোর তরঙ্গবাদেরই চূড়ান্ত জয় হল বলে অনেকে মনে করলেন। সগু আবিষ্কৃত আলোর ব্যতিচার, অবচ্যুতি ও সমবর্তন জাতীয় ঘটনাগুলো হাইগেন্‌সের তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যাচ্ছিল অথচ নিউটনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এদের একেবারেই দুর্বোধ্য ঠেকছিল।

আলোকবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে চলল। বহু সমুজ্জল আলোকবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হল এবং আলোকবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় জটিল যন্ত্রপাতি তৈরী হতে লাগল। পরিশেষে, ম্যাক্‌সওয়েল আলোকতরঙ্গের বিদ্যুৎচৌম্বক প্রকৃতির কথা প্রমাণ করে আলোকবিজ্ঞানের গঠনপর্বের কাজ সম্পূর্ণ করলেন। তরঙ্গবাদের জয়লাভ হল পূর্ণ এবং তর্কাতীত।

কিন্তু পঞ্চাশ বছর পার হবার আগেই আলোর কণিকাবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটল। যে আলোকবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তরঙ্গবাদ অক্ষম হয়েছিল—প্রায় নিখুঁত এক গঠনকাজের মধ্যে এক বিরক্তিকর ত্রুটি ছিল যেটি—বিবাদী তত্ত্ব আশ্চর্যভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বসল।

শতাব্দী-সঞ্চিত তর্কের ঝড় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু এবারে লড়াইটা বাধল এক নতুন স্তরে। দুই বিরোধী পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং একটা মিটমাট করে নিতে দু' পক্ষই রাজী ছিল। ক্রমে ক্রমে পদার্থবিদ্‌রা বুঝতে পারলেন যে, এই আশ্চর্য এবং অবশ্যম্ভাবী ধারণাটিই তাদের গ্রহণ করতে হবে যে, আলো একাধারে তরঙ্গধর্মী এবং কণিকাধর্মী।

কিন্তু তাহলে আলো কেন এই দ্বৈতরূপে কখনোই সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে না? কখনো এ শুধু কণিকার আকারে দেখা দেয়।অথচ অন্য সময়ে এ শুধু থাকে তরঙ্গের রূপে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে আমরা পরে আবার আলোচনা করব।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের মধ্যে যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি মাথা তুলে দাঁড়াল, তাও মোটেই সহজ ছিল না। দেখা যাচ্ছিল যে, আলোকবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনদের হাতে যে কোন পরিমাণ শক্তি তুলে দিলেই কিন্তু ওদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। শক্তির পরিমাণকে এক অত্যন্ত নির্দিষ্ট মাত্রায় অথবা তার চেয়ে বেশী হতে হবে, তা নাহলে আলোকশক্তির ভাগে কোন সাড়াই মিলবে না।

আরো দেখা গেল, একটি ইলেকট্রন যদি কোন বলের দ্বারা তার প্রতিবেশী ইলেকট্রনগুলোর সঙ্গে বাঁধা না পড়ে, তাহলে ওর বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং সব ধরণের শক্তিপুঞ্জের আঘাতেই সে সাড়া দিয়ে বসে। কিন্তু ঐ ইলেকট্রনটি যদি কোন ধাতুখণ্ডের মধ্যে আস্তানা নিয়ে থাকে, তাহলে ওকে যেন ভাবালুতায় পেয়ে বসে এবং ও আবার নির্দিষ্ট মাপের শক্তিরই প্রার্থী হয়।

ব্যাপারটা কেন এমন হয়, আরো কুড়ি বছর পরে তার ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল।

॥ পরমাণুদের ভিজিটিং কার্ড ॥

ইতিমধ্যে, একজন তরুণ ডাচ্ পদার্থবিদ, নীল বোর নতুন কোয়ান্টাম ধারণাকে বর্ণালীবিন্যাসরূপী বিশিষ্ট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে চেষ্টা করছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বর্ণালীবিজ্ঞানের ওপর শত শত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ণালী বিশ্লেষণের কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল এবং রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপুলভাবে কার্যকরী হয়ে উঠছিল।

বর্ণালীর আবিষ্কারের জন্যে নিউটনের বহুমুখী প্রতিভাকেই কৃতিত্ব জানাতে হয়। কিন্তু বর্ণালী বিশ্লেষণের পদ্ধতি মাত্র একশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছে। ১৮৫৯ সালে, বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ বুন্‌সেন নিউটনের পুরনো পরীক্ষাটাই আবার করলেন। তিনি আলোকরশ্মির পথে একটি ত্রিপার্শ্ব কাঁচকে রেখে আলোকে তার বর্ণালীতে ভেঙে ফেললেন। বুন্‌সেনের পরীক্ষায়, সূর্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল লবণের দ্রবণে ভেজানো একটি জ্বলন্ত কম্বলের টুকরো। নিউটন দেখতে পেয়েছিলেন যে, সূর্যের আলোকরশ্মি অনেকগুলি বর্ণের একটি স্তবকে প্রসারিত হয়ে যায়। বুন্‌সেন আদৌ কোন স্তবক দেখতে পান নি। কম্বলটির গায়ে যখন আবার নুন (সোডিয়াম ক্লোরাইড) মেশানো হল, তখন বর্ণালীর মধ্যে শুধু কয়েকটি সরু রেখার সন্ধান পাওয়া গেল, এছাড়া আর কিছুই নয়। এদের মধ্যে একটি রেখা ছিল উজ্জ্বল হলুদ-বর্ণের।

বুনসেন আর একজন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী কারশফ্‌কে এ ব্যাপারে আগ্রহান্বিত করে তুললেন। তাঁরা দু'জনেই এই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন যে, ত্রিপার্শ্ব কাঁচটির ভূমিকা ছিল শুধু আপতিত আলোকরশ্মিগুলিকে তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলাদাভাবে ভাগ করে ফেলা। সূর্যের বর্ণালীর প্রশস্ত স্তবক থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, দৃশ্য আলোর সবগুলো তরঙ্গদৈর্ঘ্যই তার মধ্যে রয়েছে। যখন আলোর উৎস ছিল একটি জ্বলন্ত কম্বল, তখন যে হলুদ রঙের রেখাটি দেখা দিচ্ছিল তার থেকে বোঝা গেল যে, খাবার নুনের বর্ণালীর একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে।

সোডিয়াম ক্লোরাইডের সূত্র হল NaCl। হলুদ রঙের রেখাটি কোন্ মৌলিক পদার্থ (সোডিয়াম অথবা ক্লোরিন) থেকে এসেছে? এটা খুব সহজেই পরীক্ষা করা যায়। সোডিয়ামের জায়গায় হাইড্রোজেনকে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাহলে আমরা পাব হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, HCl বা যাকে আবার জলে মেশালে পাওয়া যাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। কম্বলের টুকরোটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে নিয়ে, একটি বুনসেন বার্নারের আলোকশিখায় ধরা হল এবং বর্ণালী গ্রহণ করা হল। হলুদে রঙের রেখাটি কোন চিহ্ন না রেখেই অন্তর্ধান করেছে, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে এ রেখাটির মালিকানা ছিল সোডিয়ামের।

আবার ব্যাপারটিকে যাচাই করে নেওয়া হল। সোডিয়ামকে বজায় রেখে ক্লোরিণের জায়গায় দেওয়া হল অনুপ্রস (কষ্টিক্ সোডা, NaOH)। পরিচিত রেখাটি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণালীর মধ্যে ফুটে উঠল। আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইলো না। সোডিয়াম যে কোন বস্তুর মধ্যেই থাক না কেন বর্ণালীর উজ্জ্বল হলুদ রেখাটির দ্বারাই ওর অস্তিত্ব ধরা পড়ে যাবে—এ যেন হল ওর ভিজিটিং কার্ড।

পরবর্তীকালে জানা গেল যে এ ব্যাপারে সোডিয়াম কোনো ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেকটি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের নিজস্ব বর্ণালী রয়েছে। কিছু কিছু বর্ণালী সোডিয়ামের তুলনায় অনেক বেশী জটিল এবং কোন কোন সময়ে ওদের মধ্যে বহুসংখ্যক রেখা প্রকাশ পেয়ে বসে। কিন্তু মৌলিক পদার্থটি যে কোন যৌগিক পদার্থ অথবা বস্তুর মধ্যেই থাক না কেন, এর বর্ণালী সব সময়েই হবে সুস্পষ্ট, এ যেন একটি মানুষের ফটোগ্রাফের মত ব্যাপার।

জনতার মধ্যে একজন ব্যক্তিমানুষের সন্ধান করতে গিয়ে কেউ প্রত্যেকের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, রসায়নবিদরা যেমন রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন শিলার নমুনার মধ্যে মৌলিক পদার্থের সন্ধান করে থাকেন। কিন্তু কাজটা অনেকটা সহজ হবে যদি লোকটির একটি ফটোগ্রাফ সঙ্গে থাকে। ঠিক এইভাবেই বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে অনুসন্ধানের কাজটা চালিয়ে যাওয়া হয়। মৌলিক পদার্থদের এমন সব জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে পরিচয়পত্রের সাহায্যে খোঁজাখুঁজি

করতে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না—যেমন সূর্য এবং বহুদূরের তারাদের দেশে, ব্লাষ্ট ফার্ণেসরূপী নরককুণ্ড এবং প্লাজমার মধ্যে।

যা প্রয়োজন তা হল সব অংশগ্রহণকারীদের ফটোগ্রাফ। বর্তমানে মৌলিক রাসায়নিক পদার্থের সংখ্যা একশোরও বেশী এবং এদের নিজস্ব বর্ণালী অনুযায়ী প্রায় সবাইকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

॥ বস্তুরা আলো ছড়ায় কেন? ॥

বর্ণালী বিশ্লেষণের সাফল্য ছিল খুবই বিপুল, কিন্তু একেবারে গোড়ায় একটি ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। বর্ণালীবিজ্ঞানের সৌধটি তাপীয় বিকিরণের তত্ত্বের ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং এই তত্ত্বের যা কিছু মুল গলদ তার সব চিহ্নই এ ধারণ করছিল। একটি বিশেষ প্রশ্নের এ যা উত্তর দিত তার মধ্যেই নিহিত ছিল এর মূল দুর্বলতা। প্রশ্নটি হল: বিভিন্ন বস্তু তপ্ত হলে আলো ছড়ায় কেন?

এই আলো নির্গত হয় কিভাবে? নিশ্চয়ই বস্তুর অংশবিশেষ অণু এবং পরমাণুদের দ্বারাই সেটা ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণুরাও আরো দ্রুতগতিতে নড়াচড়া করতে শুরু করে। পারস্পরিক সংঘাত অনেক বেশী তীব্র আকারের হয় এবং প্রায়ই ঘটে এবং অণুর দল এত দ্রুতগতিতে আন্দোলিত হয় যে, ওরা আলো ছড়াতে শুরু করে। এই ছিল পুরনো পদার্থবিদ্যার মতামত। কিন্তু তাহলে বস্তুরা ঘরের তাপমাত্রাতেই আলো ছড়ায় না কেন, যেহেতু অণুরা এখনো গতিশীল অবস্থায়ই রয়েছে। এ প্রশ্নের কোন জবাব কিন্তু পাওয়া যায় নি।

এরপর ১৮৯৮ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী টমসন যখন পরমাণুর প্রথম মডেলটি তৈরী করলেন, মনে হল যেন বিচ্ছুরণের সমস্যার সমাধান ঘটেছে। এই মডেলটিতে, পরমাণুরা ছিল ধনাত্মক আধানের মেঘপুঞ্জ, যাদের মধ্যে ঋনাত্মক ইলেকট্রনেরা যথেষ্ট সংখ্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাতে তারা ধনাত্মক আধানকে সামলে উঠতে পারে। ইলেকট্রনেরা ধনাত্মক মেঘপুঞ্জের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ফলে এদের গতিও মন্থর হয়ে পড়ে।

কিন্তু ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণিকাদের

গতিশ্বহ্বর হলে এদের বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ নির্গত করতে হবে। মনে হতে পারে, সেই বিকিরণ হল, তপ্ত অবস্থায় বস্তুরা যে আলো ছড়ায়, সেই আলো। প্রথম দৃষ্টিতে, এই ব্যাখ্যা বেশ যুক্তিসহ বলেই মনে হয়েছিল। একটি বস্তু যত তপ্ত হবে, পরমাণুদের মধ্যে ইলেকট্রনদের গতিও তত বেড়ে উঠবে এবং ধনাত্মক আধানযুক্ত মেঘের আকর্ষণজনিত বিতরণও বাড়তে থাকবে, ফলে বিকিরণের তীব্রতা যাবে বেড়ে।

ব্যাপারটা হয়ত তাই হয়ে দাঁড়াত যদি বিকিরণ ঘটানোর সময় ইলেকট্রনদের শক্তি না খরচা করতে হত। কিন্তু ইলেকট্রনরা যখন আলোক বিকিরণ করে, তখন এদের গতিও দ্রুতগতিতে কমে আসতে বাধ্য। এক সেকেণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যেই, এরা পুডিংয়ে কিসমিসের মত ধনাত্মক মেঘের মধ্যে সমাধি লাভ করে বসত।

কিছু একটা ভুল থেকে যাচ্ছিল। কয়েক বছর পরে পরিষ্কার বোঝা গেল, টম্‌সনের পরমাণু মডেল অন্যান্য ক্ষেত্রেও কার্যকরী হবে না। বহু প্রশ্নেরই জবাব মিলছিল না। আবার ইলেকট্রনেরা সরাসরি ধনাত্মক মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের আধানকে নিরপেক্ষ করেই বসছে না কেন? এই মডেল থেকে যে স্বল্প কয়েকটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাতেকলমে পরীক্ষার সঙ্গে তাদের তীব্র সংঘাত বাঁধছিল।

১৯১১ সালে, বিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড পরমাণুর একটি নতুন মডেলের প্রস্তাব আনলেন। রাদারফোর্ড সদ্য আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থদের আলফা রশ্মির দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুদের ওপর আঘাত হানছিলেন। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছিল যে, এই রশ্মিরা ধনাত্মক আধানযুক্ত কণিকাদের সমবায়ে তৈরী।

পরমাণুরা যেভাবে আলফা কণাদের বিক্ষেপণ ঘটাচ্ছিল, সেই সম্পর্কে গবেষণা করে রাদারফোর্ড সুদূরপ্রসারী কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হলেন। আলফা কণারা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, যেন ওরা টমসন পরমাণুর সমগ্র ধনাত্মক মেঘের দ্বারা বিকর্ষিত হচ্ছে না, বরং পরমাণুর কেন্দ্রে সন্নিভূত অতি সামান্য খানিকটা অংশের দ্বারাই ব্যাপারটা ঘটছে। পরমাণুর সমগ্র ধনাত্মক আধান এই ক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় অংশে সন্নিভূত হয়ে আছে বলে মনে হয়।

রাদারফোর্ড পরমাণুর এই অংশটির নাম দিলেন কেন্দ্রক। তাহলে ইলেকট্রনেরা রয়েছে কোথায়? পুরনো সেই ধারণাটি যে ইলেকট্রনেরা আকর্ষণরূপী বৈদ্যুতিক বলের দ্বারা পরমাণুর মধ্যেকার ধনাত্মক আধানের সঙ্গে বাঁধনে জড়িয়ে আছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যেহেতু ইলেকট্রনেরা পরমাণু কেন্দ্রক থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন বল রয়েছে যা ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রকের পারস্পরিক আকর্ষণরূপী বৈদ্যুতিক বলকে সামলে রেখেছে।

এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, এই বলকে সব সময়েই কার্য্যকরী অবস্থায় থাকতে হবে। পরমাণুরা বেশ দীর্ঘ সময় টিকে থাকে, কাজেই ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রকের মধ্যেকার পারস্পরিক আকর্ষণরূপী বলের মতই এই বিরোধী বলটিকেও চিরন্তন হতেই হবে।

হয়ত যুক্তির সঙ্গেই ভাবা চলত যে, এটি ছিল কেন্দ্রাতিগ বল। ইলেকট্রনেরা যদি পরমাণুর কেন্দ্রকের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে এই বলটি দেখা দেয়। এটা হিসেব করে বলা যেত যে, এই বলটি ইলেকট্রনদের কেন্দ্রকের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বার হাত থেকে বাঁচানোর মত যথেষ্ট শক্তি রাখে কিনা। হিসেবে দেখা গেল, এ-কাজটা এই বলের পক্ষে সম্ভব যদি ইলেকট্রনরা কেন্দ্রকের চারপাশে প্রতি সেকেণ্ডে বহু হাজার কিলোমিটার গতিতে ঘুরে চলে এবং কেন্দ্রক থেকে এদের দূরত্ব এক সেন্টিমিটারের দশ কোটিভাগের মত একটা অংকে বজায় থাকে।

এই ছিল রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল। একটি দড়ির প্রান্তে বাঁধা একটি গোলকের চারদিকে ঘোরানোর ঘটনাটি থেকে নিউটন গ্রহজাগতিক মহাকর্ষের ধারণার নির্দেশটি পেয়েছিলেন; এই একই ধারণা থেকে রাদারফোর্ড পরমাণুর গ্রহজাগতিক গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে অভিনব এবং অত্যন্ত সঠিক (ভবিষ্যতে যা দেখা গেছে) একটি তত্ত্ব গড়ে তুললেন।

বিভিন্ন বস্তু কেন আলো নির্গত করে সে সমস্যায় আমরা এখন ফিরে আসতে পারি এবং পরমাণুর নতুন মডেলের মধ্যে তার উত্তরটাও খুঁজতে পারি। কেন্দ্রকের চারপাশে ইলেকট্রনদের যে গতি, তা হল ত্বরণজনিত গতি (ইলেকট্রনেরা বক্রপথ ধরে চলে)। কাজেই, বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ ঘটবেই। ক্ল্যাসিকাল নিয়মগুলো পরমাণুর টমসন মডেল এবং রাদারফোর্ড

মডেল উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, সাফল্যের পরিমাণও একই। আলোক বিকিরণের মধ্য দিয়ে, ইলেকট্রনের শক্তি ব্যয় হয়। তার ফলে এক সেকেণ্ডের দশলক্ষভাগের এক ভাগের মত সময়ের জন্যে এর গতিটা মন্থর হয়ে আসে এবং পরিণামে পরমাণুকেন্দ্রকের ওপর গিয়ে সে পড়বেই, যেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের গতি মন্থর হতে হতে অবশেষে সেটি জমির ওপর এসে আছড়ে পরে। কৃত্রিম উপগ্রহের মত ইলেকট্রনের গতির ভাগ্যও একই হওয়া উচিত। এ ধরণের পরিস্থিতিতে, একটি পরমাণুর আয়ুও খুব শীঘ্রই খতম হয়ে আসবে।

কিন্তু পরমাণুরা টিকে রয়েছে। ইলেকট্রনদের তাহলে শক্তি ছেড়ে দেওয়া ও আলো নির্গত করা কাজগুলো চালানো উচিত নয়। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ তপ্ত হলে আলো ছড়ায়!

॥ নীল্‌স্ বোরের লেখা পরমাণুর জীবনী ॥

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা আবার এক গোলকধাঁধার মধ্যে এসে পড়ল। যা ভাবা গিয়েছিল, তার চেয়েও এ আরো খারাপ পরিস্থিতি। তপ্ত পদার্থদের আলোক বিচ্ছুরণের কারণটা এ ধরে উঠতে পারছিল না এবং বর্ণালীর অস্তিত্বের বিষয়টারও কোন ব্যাখ্যা এর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে ভেজানো কম্বলের টুকরোটার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। এই লবণটির বর্ণালী একটিমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ নিয়ে গড়ে উঠেছে।

যদিও আমরা ধরে নিই যে, এই রেখাটি নির্গত হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রন থেকে, পরমাণুর মধ্যে যার গতি মন্দীভূত হচ্ছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যার মুখোমুখী এসে আমরা দাঁড়াব। ক্ল্যাসিকাল পদার্থ-বিদ্যার নিয়মগুলোর বক্তব্য হল, এরকম একটি ইলেকট্রন শুধু একটি রেখাকে নয়, বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি সমগ্র বর্ণালীরেখার সমষ্টিকে নির্গত করে যাবে এবং বর্ণালীটির মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতাও দেখা যাবে না। একটি

ইলেকট্রনের বর্ণালীর সঙ্গে সূর্যের বর্ণালীর কোন তফাৎ থাকা উচিত নয়। অথচ আমরা একটিমাত্র হলুদ রংয়ের রেখাই পাচ্ছি!

বোর বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা গোলমাল রয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কি? হয়ত পরমাণুর রাদারফোর্ড মডেলটিরই যত ত্রুটি? না, এত তাড়াতাড়ি এই মডেলটিকে ত্যাগ করা ঠিক হবে না। বোরের শিক্ষক আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডেরও একই মত। ভেবে ঠিক করা হল, মডেলটিকে সংস্কার এবং উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো হবে যাতে এই মডেলের মধ্যে একটি ইলেকট্রন পরমাণুকেন্দ্রকের চারপাশে ঘুরতে পারে, আলো ছড়াতে পারে অথচ কেন্দ্রকের ঘাড়ে এসে পড়বে না।

বছরটা ছিল ১৯১২ সাল। আইনস্টাইন তাঁর ফোটনের আবিষ্কারের দ্বারা যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা সব পদার্থবিদের স্মৃতিতেই উজ্জ্বল হয়ে ছিল। মাত্র তিন বছর আগে, আইনস্টাইন স্বয়ং তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন—আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। স্বভাবতই, ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ওপর এই সব আক্রমণ তরুণ পদার্থবিদদের উদ্দীপ্ত না করে পারে নি এবং এ তাদের চিন্তাধারার মধ্যে বলিষ্ঠতাকে সঞ্চার করেছিল।

বোর সমস্যাটি নিয়ে ভেবেই চললেন এবং অবশেষে একটি চিন্তা তার মাথায় এল। একটি পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রন সব সময়েই আলো ছড়াবে কেন? এর গতির মধ্যে সব সময়ে একটি ত্বরণ ঘটছে বলেই কি? এ ধারণাটা ছেড়ে দিয়ে বলা যাক যে, একটি পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রনের গতির যখন ত্বরণ ঘটছে তখনো তার আলো ছড়াবার কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? কেন্দ্রকের চারপাশে ইলেকট্রনটিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথেই ঘুরে বেড়াতে হবে, তার যেভাবে খুশী সেভাবে নয়। ইলেকট্রনটি যদি আলো নির্গত না করে, তাহলে সে পরমাণুটির মধ্যে তার যতক্ষণ খুশী, ততক্ষণই থাকতে পারবে।

কিন্তু এজাতীয় একটি পরিস্থিতির মুখোমুখী হবার জন্যে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার কোন উপায়ই জানা ছিল না। উপরন্তু, অন্য কোন তত্ত্বকে অনুসরণ করে যে এর উদ্ভব হয়েছিল, তাও নয়। বোর তা প্রমাণ করতে

পারলেন না। কাজেই সবিনয়ে তিনি একে একটি ধারণা বলে আখ্যাত করলেন। প্রসঙ্গক্রমে, বোর তাঁর নিজের তত্ত্বের চৌহদ্দির মধ্যে এই পরিস্থিতির কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। দশ বছর পরে খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রমাণটি মিলল। সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। তাহলে আলো না ছড়িয়ে ইলেকট্রনের ঘুরে বেড়ানোর জন্যে এরকম কটি সম্ভাব্য কক্ষপথ রয়েছে? বোরের গণনা থেকে দেখা যাচ্ছিল যে, সে সংখ্যাটি বেশ বড়, হয়ত অসীম পরিমাণে বড়। চিনে নেবার বিশেষ লক্ষণটি কি? কেন্দ্রক থেকে গড়পড়তা দূরত্ব: কিছু কক্ষপথ রয়েছে কাছাকাছি, আবার কিছু রয়েছে দূরে। তাহলেও, প্রশ্নটা দূরত্বঘটিত নয়, বরং আপন কক্ষপথে ইলেকট্রন কি পরিমাণ শক্তির অধিকারী হয়ে আছে, তাই হল আসল ব্যাপার। এ ব্যাপারটা বোঝা যায়, কারণ একটি ইলেকট্রন পরমাণুকেন্দ্রকের যত কাছে থাকবে, কেন্দ্রকের ঘাড়ে গিয়ে পড়ার ঘটনাটা বাঁচানোর জন্যে তাকে তত দ্রুতগতিতে দৌড়োতে হবে। বেশী দূরবর্তী একটি ইলেকট্রনের পক্ষে বিপরীত ঘটনাটা হল সত্য, কেন্দ্রকের আকর্ষণের টান ওর ওপর অত বেশী জোরালো নয়, কাজেই ও অনেক মন্থরগতিতে চলতে পারে।

সিদ্ধান্তটা তাহলে হল এই, ইলেকট্রন শক্তির মাপ অনুযায়ী ইলেকট্রনের বিভিন্ন রাস্তার (কক্ষপথ) মধ্যে তফাতটা দেখা দেয়। একটি ইলেকট্রন যতক্ষণ নিজস্ব কক্ষপথে থাকবে, ততক্ষণ আলোর নির্গমন ঘটবে না।

বোর এই পর্যায়ে একটি দ্বিতীয় ধারণাকে তুলে ধরলেন। ধরা যাক, ইলেকট্রন তার কক্ষপথ থেকে কম শক্তির আর একটি কক্ষপথে পাড়ি জমাল। বাড়তি শক্তিটা তাহলে গেল কোথায়? শক্তির এভাবে হঠাৎ কোথাও অন্তর্ধান ঘটতে পারে না।

বোর বললেন, পরমাণুর বাইরে তার খোঁজ করতে হবে।

পরমাণু থেকে এই শক্তি নির্গত হয় একটি কোয়ান্টামের আকারে, আলোক শক্তির। ওই একই কোয়ান্টামকে আইনস্টাইন নাম দিয়েছিলেন ফোটন।

একটি ইলেকট্রন একটি ফোটনকে নির্গত করার পর একটি আলাদা কক্ষপথে আশ্রয় নেয় এবং তারপর আর আলো সে ছড়াবে না। যে অস্তি

[illegible] যে একটি কক্ষপথ থেকে আর একটি কক্ষপথে ঝাঁপ দিয়েছিল, তার মধ্যেই ফোটনকণিকাটি নির্গত হয়ে এলো।

ইতিমধ্যে ফোটনকণিকাটি অন্যান্য পরমাণুদের মধ্য দিয়ে তার পথ তৈরী করছিল এবং পরিশেষে পদার্থটির বাইরে এসে হাজির হল। এই আলো আমাদের চোখে এসে পড়তে পারে, এটিকে একটি ত্রিপার্শ্ব কাঁচের মধ্য দিয়ে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে পাঠিয়ে তার ছবি তোলা যেতে পারে। ফোটন-কণিকাদের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে, তা বেশ কয়েকবার রূপান্তরিত হবার পরই ফোটোগ্রাফিক প্লেটে একটি কালো রেখার আকারে তার আসল প্রতিবিম্বটি ফুটে উঠবে।

এই রেখাটির নিজের সম্বন্ধে বলবার অনেক কিছুই আছে। প্লেটের ওপর এর অবস্থানের পরিমাপ করে আমরা ফোটনকণিকার তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম্পনসংখ্যা দুই-ই বার করে ফেলতে পারি। এরপর আমরা আলোক-কণিকার কম্পনসংখ্যা এবং শক্তির মধ্যে যে প্লাংক সম্পর্ক বিদ্যমান, তাকে গ্রহণ করব এবং ফোটনের শক্তির মাপ নির্ণয় করব। এই শক্তি পরমাণুটির পুরনো এবং নতুন কক্ষপথের মধ্যে শক্তির মাপে যে পার্থক্য, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। প্লেটে এই বর্ণালী রেখাটির জায়গা যতখানি কালো হয়েছে, তা সেখানে ফোটনের সংখ্যার পরিমাণকে নির্দেশ করছে : ফোটনের সংখ্যা যত বেশী হবে, রেখাটি তত কালো হবে। আবার ফোটনের সংখ্যা যত বেশী হবে, যে পদার্থ থেকে এদের জন্ম তারাও হবে তত বেশী উজ্জ্বল।

বর্ণালীর কি সহজ এবং সুন্দর একটি ব্যাখ্যা এভাবে পাওয়া গেল।

একটি নির্দিষ্ট পদার্থের সব পরমাণুরাই হুবহু একই রকম। অতএব, সব ইলেকট্রনেরাই একই অবস্থাধীনে বাস করছে। কাজেই দুটি কক্ষপথের মধ্যে ইলেকট্রনদের ঝাঁপ দেবার সময় যে ফোটনেরা নির্গত হচ্ছে, তারাও সবাই হবে একই ধরণের। দুটি কক্ষপথের মধ্যে ইলেকট্রনদের স্থান পরিবর্তনরূপী সমগ্র ব্যাপারটির সর্বশেষ বিশ্লেষণে যা পাওয়া যাচ্ছে তা হল—একটিমাত্র সম্পূর্ণ নিজস্ব বর্ণালী রেখা।

আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি যে, ঐ ধরণের বেশ কয়েকটি পুরনো এবং নতুন কক্ষপথ রয়েছে। একটি ইলেকট্রন পালা করে তাদের যে কোন একটিতে অবস্থান করতে পারে।

একটি বেশী শক্তির কক্ষপথ থেকে কমশক্তির আর একটি কক্ষপথে ইলেক্ট্রনদের প্রত্যেকটি ঝাঁপ একটি ফোটনকে সৃষ্টি করে বসে। কিন্তু বিভিন্ন কক্ষপথের মধ্যে যেহেতু শক্তির মাপে পার্থক্য রয়েছে, ফোটনদের শক্তির মাপ এবং কম্পনসংখ্যা হবে আলাদা আলাদা। একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটে তখন এক সার সরু বর্ণালীরেখা ধরা পড়বে। হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালীও ঠিক এরকম দেখতে। তাতে আছে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘের কয়েক দশক রেখা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সোডিয়ামের মত মাত্র একটি রেখার সরল বর্ণালী পাওয়া খুবই দুর্লভ। দশের কয়েক গুণ রেখা নিয়েই সাধারণত বর্ণালী গড়ে ওঠে এবং বহু ক্ষেত্রে এদের মধ্যে হাজার হাজার রেখার সন্ধানও পাওয়া যায়। কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের বর্ণালী এত জটিল যে এদের জট ছাড়ানোর কোন আশা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কিছু কিছু নিয়ম আছে যারা এ কাজটাকে সহজ করে তোলে।

বোরের তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে, পদার্থবিদ্‌রা কিছু কিছু জটিল বর্ণালী বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টায় প্রায় মাথা খুঁড়ে মরছিলেন। বোর যখন প্রমাণ করলেন যে, বর্ণালী হল একটি পরমাণুর জীবনকথা, আর একটু সঠিক করে বলতে গেলে পরমাণুর ইলেকট্রনদের জীবনকথা, তখন কাজটা অনেক সরল হয়ে এল। যেটুকু কাজ করবার থাকল, তা হল একটি পরমাণুর বিভিন্ন ইলেকট্রন কক্ষপথগুলোকে একত্রিত করে চলা, যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্ণালীর পরিদৃশ্যমান রেখাগুলোকে পাওয়া যায়।

বিপরীতক্রমে, একটি বর্ণালী পরীক্ষা করে, পারমাণবিক ইলেকট্রনেরা যে যে পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, সে সম্বন্ধে কেউ সব ধরণের সিদ্ধান্তই টেনে বসতে পারেন। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে, পরমাণুর ইলেকট্রন খোলক সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি, তা ওদের বর্ণালীকে অত্যন্ত খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়েই পাওয়া গেছে।

॥ কোথা থেকে আমরা শক্তির পরিমাপ করব? ॥

বোরের কাছ থেকে যখন আমরা বুঝলাম একটি পরমাণু থেকে কিভাবে আলো নিঃসৃত হয়, তখন এবারে আমরা প্রশ্ন করব—কেন। কেন বিভিন্ন

পদার্থ শুধুমাত্র বেশী তাপমাত্রাতেই আলো ছড়ায় এবং কেনই বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আলো ছড়ানো তারা বন্ধ করে বসে?

এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমাদের একটু অন্য আলোচনায় যেতে হবে। পরমাণুর যে একটি অতিশয় প্রত্যয়জনক ছবি আমরা এই মাত্র এঁকেছি, তাকে উল্‌টোভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। এটা অবশ্য এরমধ্যে কিছু ভুলত্রুটি রয়েছে বলে নয়। না! শুধু ইলেকট্রনের কক্ষপথের সারিবদ্ধতাকেই উল্‌টে দিতে হবে।

আমাদের বিবেচনায় মনে হয়েছিল, পরমাণুকেন্দ্রীনের কাছাকাছি কক্ষপথগুলোর শক্তির মাপই সবচেয়ে বেশী, তাই থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে একটি ইলেকট্রন যখন কেন্দ্রকের কাছ থেকে বাইরের কোন কক্ষপথে ঝাঁপ খায় তখনই একটি ফোটন নির্গত হবে। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্‌টোভাবে ঘটে।

জমিতে একটি গর্ত খুঁড়ে এই ব্যাপারটা আসলে কি তা আমরা বোঝবার চেষ্টা করি। গর্তটার তলায় এবং জমির ওপরে গর্তটির কাছে একটি করে গোলক রাখুন। দুটি গোলকের মধ্যে কোন্‌টির শক্তি বেশী?

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন: "প্রশ্নটা পরিষ্কার হল না। প্রথমতঃ আপনি কি ধরণের শক্তির কথা বলছেন। স্থৈতিকশক্তি অথবা গতীয়শক্তি? দ্বিতীয়তঃ, আপনি কোন্‌ অনুভূমিক থেকে স্থৈতিক শক্তির পরিমাপ করছেন? যদি পৃথিবীর অনুভূমিককে গ্রহণ করেন, তাহলে জমির ওপরে বলটির স্থৈতিক শক্তির পরিমাণ শূণ্য ধরা যেতে পারে; সে অবস্থায় গর্তের মধ্যে বলটির স্থৈতিক শক্তির পরিমাণ হবে শূণ্যের চেয়েও কম, অর্থাৎ ঋনাত্মক। কিন্তু আমরা যদি গর্তের তলদেশ থেকে স্থৈতিক শক্তির পরিমাপ করি, তাহলে জমির ওপরে বলটির স্থৈতিক শক্তি হবে শূণ্যের চেয়ে বেশী। যেহেতু দুটি গোলক স্থির অবস্থায় রয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই ওদের গতীয় শক্তির পরিমাণ হবে শূণ্যের কোঠায়। আমরা প্রথম নির্দেশক কাঠামোটিকে (ফ্রেম অফ রেফারেন্স) নিয়ে চেষ্টা করে দেখি।

কিন্তু ধরা যাক বলটি গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। তখন এর স্থৈতিক শক্তির সঙ্গে আমরা এর গতীয় শক্তিকে যোগ করব। দু'টি শক্তির যোগফল, বা মোট শক্তি, কিন্তু স্পষ্টতই ঋনাত্মক স্তরেই থেকে যাবে যদি না গোলকটি

গর্ত থেকে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আবার অন্যদিকে মোট শক্তিটা হয়ে দাঁড়াবে ধনাত্মক যদি বলটি লাফিয়ে ওপরে ওঠে এবং জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে।

পাঠকের কাছে এই দীর্ঘ আলোচনা কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হতে পারে কিন্তু বর্তমানে এবং পরবর্তীকালে অনেক বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝার ব্যাপারে এটা কাজে আসবে। আলোচ্য ব্যাপারটা হল, শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, একটি পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রনের অবস্থা গর্তের মধ্যে গোলকের অবস্থার মতই। একটি মুক্ত, স্বাধীন, ইলেকট্রন হল জমির ওপরে গোলকটির মতন। পদার্থবিদরা একটি মুক্ত অথচ স্থির অবস্থায় থাকা ইলেকট্রনের সমগ্র শক্তিকে শূণ্যের কোঠায় ধরে নিয়ে এজাতীয় ইলেকট্রনদের শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

অবশ্য, একটি ইলেকট্রন এবং একটি গোলকের মধ্যে সাধারণভাবে বিশেষ কোন মিল নেই। সম্ভবত, একমাত্র মিল হল এই যে, এদের উভয়েরই গতিবিধির মধ্যে খানিকটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বলটি স্বেচ্ছায় গর্ত ছেড়ে যেতে পারে না এবং একটি ইলেকট্রনের পক্ষেও এর পরমাণুকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর ঠিক সেই কারণেই পরমাণুরা টিকে রয়েছে।

গোলকটি যত গর্তের ওপরের কাছাকাছি আসবে, তলা থেকে এর দূরত্বও তত বাড়বে এবং এর সমগ্র শক্তির পরিমাণটাও বেড়ে উঠবে (যার অর্থটা হল, ঋনাত্মক শক্তির পরিমাণটা কমে আসবে)। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই ধরণের। কেন্দ্রক থেকে এর দূরত্ব যত বাড়বে, এর সমগ্র শক্তির পরিমাণও তত বেশী হবে; কেন্দ্রকের যত কাছাকাছি এ থাকবে, এর শক্তির পরিমাণটাও হবে কম (স্বভাবতই এর ঋনাত্মক শক্তির পরিমাণটাও হবে বেশী)।

তাহলে আলোচনার সারবস্তু হল এই যে, যখন একটি ইলেকট্রন কেন্দ্রকের কাছাকাছি কোন কক্ষপথের দিকে ঝাঁপ খাবে, তখন এ নিজের শক্তিকে ফেলবে কমিয়ে, যার জন্যে ঠিক এ ধরণের স্থান পরিবর্তনের সময়েই ফোটনেরা নির্গত হয়। অন্যদিকে, কেন্দ্রক থেকে কক্ষপথের দূরত্ব যত বেশী হবে, পরমাণুর ঘর ছেড়ে পালানোর কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে যাবে ইলেকট্রন এবং তার শক্তির পরিমাণও তত বাড়তে থাকবে। এবারে আমরা আমাদের পুরনো গল্পে ফিরে আসি।

কিন্তু আবার আমাদের সেই গোলকের কথাতেই আসতে হবে। গোলকটার পতন ঘটছে না কেন ? এ হল মূঢ় প্রশ্ন, কেন না পড়বার মত কোন জায়গাই তো কোথাও নেই।

অল্প তাপমাত্রার পরিবেশে একটি পারমাণবিক ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ঐরকম। ঝাঁপ খেয়ে পড়বার মত কোন জায়গা নেই। ইলেকট্রনটি পরমাণুর সবচেয়ে কাছাকাছির কক্ষপথটিতে অবস্থান করছে; এখান থেকে পড়তে হলে একমাত্র কেন্দ্রকের ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হয়, পৃথিবী ভেদ করে গোলকটির পতনের মতই যে কাজটা সমানই অসম্ভব। ইলেকট্রনটির শক্তির পরিমাণ সবচেয়ে নিচু কোঠায়। হারাবার মত এর আর কিছুই নেই। কাজেই, এ কোন আলোই ছড়াতে পারবে না।

এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইলেকট্রনটিকে গোড়াতে নিশ্চয়ই কেন্দ্রক থেকে খানিকটা দূরের কোন কক্ষপথে থাকতে হবে, যাতে কেন্দ্রকের কাছাকাছি কোন কক্ষপথে সে এসে হাজির হতে পারে। প্রশ্নটা হল: ইলেকট্রন বাইরের কোন কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছচ্ছে কিভাবে ? একটি গোলক কোন সিঁড়ির মাথায় গিয়ে যেভাবে পৌঁছয়, এও ঘটছে ঠিক একইভাবে। ধরুন: আমরা নিজেরাই হয়ত গোলকটিকে ঐখানে রেখে দিলাম, যাকে বলা যায়, কিছু শক্তি যেন ওটাকে দেওয়া হল।

ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। বাইরের কোন কক্ষপথে ইলেকট্রনটিকে স্থাপনের জন্যে আমাদের কিছু শক্তি ওকে দিতে হবে। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, যে শক্তি ইলেকট্রনটিকে দিতে হবে তারা অন্ততঃ পক্ষে দুটি কক্ষপথের মধ্যেকার শক্তির মাত্রাভেদের সমান হওয়া চাই।

শক্তি অর্পণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। একটি সাধারণ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হল, পরমাণুদের তাপীয় গতিতে যখন একটি পরমাণু যথেষ্ট বেগে আর একটি পরমাণুর সঙ্গে সংঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সঠিক মাপের শক্তি ত্যাগ করে বসে। ঘরের তাপমাত্রায়, এধরণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, কিন্তু তার শক্তির মাপ খুবই অল্প। তাপমাত্রা যখন কয়েকশ' বা কয়েক হাজার ডিগ্রীতে পৌঁছে

যায়, তখন সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তির আদানপ্রদান ঘটতে থাকে, ইলেকট্রনেরা লাফিয়ে নতুন কক্ষপথে পৌঁছয় এবং আলো নির্গত হয়।

শক্তি প্রয়োগ করা হল। ইলেকট্রনটি এখন একটি বাইরের কক্ষপথে রয়েছে। তারপরে কি ঘটবে? ইলেকট্রনটির বাইরের কক্ষপথে বেশী সময় যাপনের অনুমতি কেন্দ্রকের কাছ থেকে মেলে না। কেন্দ্রক ইলেকট্রনটিকে ভেতরের একটি কক্ষপথে টেনে নামিয়ে নেয় এবং ইলেকট্রনটির ভেতরের দিকে ঝাঁপ খাবার সময় একটি ফোটন নির্গত হয়ে বসে। আমাদের দৃষ্টিতে ফোটনটি ধরা পড়ে এবং আমরা তখন বলি যে, পদার্থটি আভা দিচ্ছে বা আলো নির্গত করছে।

পদার্থটি এখন আলো ছড়াচ্ছে। তাপমাত্রাকে খানিকটা বাড়িয়ে দেখা যাক কি হয়। তখন পরমাণুদের তাপীয় গতি আরো জোরদার হয়ে ওঠে। সংঘাতগুলো ঘন ঘন এবং তীব্রভাবে ঘটতে থাকে। ইলেকট্রনটি তার সবচেয়ে ভেতরের কক্ষপথে খুব অল্প সময়ই যাপন করে। পরমাণুরা আরো ঘন ঘন এমন একটি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছতে থাকে, পদার্থবিদরা যাকে বলেন 'উত্তেজিত অবস্থা', তারপরে ফিরে আসে স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তারা আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বসে।

এই অবস্থায়, প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ফোটন সৃষ্টি হতে থাকে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে তারাও প্রায় বরফের স্তূপের মত বেড়ে উঠতে থাকে (স্তেফান বোল্‌ত্‌জ্‌মান নিয়মের কথা স্মরণ করুন)।

কিন্তু শুধু যে ফোটনের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে, তাই নয়। ইলেকট্রনদের ঝাঁপ খাবার দূরত্বের দৈর্ঘও বেড়ে চলে। প্রতিবেশী কক্ষপথগুলোয় গোড়ার দিকে ছোটখাট ঝাঁপ খাওয়া এবং ফিরে আসার ঘটনাগুলো, কেন্দ্রক থেকে অনেক দূরের কক্ষপথগুলোয় বিরাট বড় দৈর্ঘের ঝাঁপ খাওয়ায় পরিণতি লাভ করে। এই সব কক্ষপথগুলো থেকে লাফিয়ে ফিরে আসার সময় ইলেকট্রনেরা অত্যন্ত শক্তিশালী ফোটনদের সৃষ্টি করে বসে। আমাদের জানা আছে, একটি ফোটনের শক্তির মাপ যত বেশী হবে, এর কম্পাংক তত বাড়বে এবং তরঙ্গদৈর্ঘও তত ছোট হবে। ফলে নির্গত আলো আরো উজ্জ্বল এবং বেগুনী হয়ে উঠতে থাকে (উইনের স্থানপরিবর্তনসূচক নিয়মটি স্মরণ করুন)।

বোরের তত্ত্ব এভাবে একই সঙ্গে তাপীয় বিকিরণের তত্ত্ব এবং বর্ণালী-বিন্যাস বিজ্ঞান, উভয়েরই প্রাথমিক নিয়মগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বসল। এই বিরাট সাফল্য অর্জনের পর, আলো এবং পারমাণবিক প্রক্রিয়াগুলির কোয়ান্টাম প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। অল্প কিছুকালের মধ্যেই বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই এই ব্যাপারটি মেনে নিলেন।

॥ প্রথম বাধাগুলো ॥

বোরের তত্ত্বের সম্পূর্ণ জয় হল, এ কথাটা বলার সময় হয়ত এখনো আসে নি। পরবর্তী দশ বছরে তত্ত্বটির এক বিপুল সমৃদ্ধি ঘটল। যে ঘটনাবলী ছিল এর বিষয়ীভূত, তার পরিধিগত ঘটল এক বিপুল প্রসারণ। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল পরমাণুদের দ্বারা আলোক নিঃসরণ এবং আলোক শোষণের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াবলী এবং পরমাণু ও অণুদের বিস্তৃত গঠন প্রকৃতি। ১৯১৪ সালে কসেল কোয়ান্টাম রসায়নবিদ্যার ভিত্ প্রতিষ্ঠা করলেন, যা বর্তমানে ঐ বিষয়ের ওপরে লেখা প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯১৬ সালে সমারফেল্ড্ পারমাণবিক বর্ণালীর উৎপত্তি বিষয়ে আরো সঠিক একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। আজো পর্যন্ত তা জটিল সব বর্ণালীর বিশ্লেষণের কাজে সাহায্য করছে। নতুন তত্ত্বটি সদ্য আবিষ্কৃত পরমাণু এবং অণুদের চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক গুণাবলীর ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছিল।

একই সময়ে, বোরের তত্ত্বকে ক্রমেই আরো বেশী বাধাবিপত্তির মুখামুখী হতে হচ্ছিল। এ অনেক নতুন তথ্যের কোন ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছিল না, যাদের মধ্যে আবার কয়েকটি ছিল এর সৃষ্টির মূলে।

প্রথম মুসকিলটা বাধল সেই বর্ণালীরই ব্যাপারে, বোরের তত্ত্ব যার ব্যাখ্যার কাজে সাহায্য করেছিল। গোলমালটা হচ্ছিল এই কারণে যে, ব্যাখ্যার কাজটা প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দ্বারা নয়, উজ্জ্বলতার দ্বারাও বর্ণালী রেখাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বোরের তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা ইলেকট্রনের কক্ষপথের শক্তিরূপী সিঁড়ির ধাপগুলোর মধ্যেকার যে দূরত্ব, তা বার করে ফেলতে পারি (অর্থাৎ,

এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ, এক কক্ষপথ থেকে আর এক কক্ষপথ পর্যন্ত ইলেকট্রনদের লাফানোর ফলে যে সব ফোটনের উদ্ভব হয়, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য। কিন্তু বর্ণালী রেখাদের উজ্জলতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই তত্ত্বটি যেন এক অসহায় অবস্থার মধ্যে এসে পড়ল। বর্ণালীর মধ্যে ফোটনদের সংখ্যা কিভাবে হিসেব করা যাবে, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা এর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ওপর বোরের তত্ত্বের জয়লাভের কথা ঘোষণা করা এখনো একটু বেশী তাড়াহুড়োর কাজ হয়ে যাবে। যদিও বোর পূর্বসূরীদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁকে আবার তাঁদের কাছেই ফিরে আসতে হল। তথাকথিত প্রতিবন্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই ব্যাপারটা ঘটল।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা ছিল এই। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা বর্ণালীর উজ্জলতার হিসেবের কাজটা করতে পারছিল ঠিকই, কিন্তু ওদের উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছিল না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বর্ণালীর মূল ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল, কিন্তু বর্ণালী রেখাদের উজ্জলতার হিসেব করে উঠতে পারছিল না। বোর সিদ্ধান্তে এলেন যে, দুটো তত্ত্বকেই কাজে লাগাতে হবে এবং যে সব ক্ষেত্রে ওদের পরস্পরের বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে সেখানে একই সঙ্গে ওদের প্রয়োগ করতে হবে।

কিন্তু সেটা ঘটছে কোথায়? ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী, পারমাণবিক কেন্দ্রকের চারপাশে কোন কক্ষপথে ভ্রাম্যমান একটি ইলেকট্রন ক্রমেই কেন্দ্রকের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে থাকবে এবং পরিশেষে ওর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়বে। তারই মধ্যে, ইলেকট্রনটি একক রেখাবর্জিত একটি অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীকে সৃষ্টি করে বসবে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী, একটি পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রন ভিন্ন ভিন্ন রেখার বিকিরণ ঘটায়, বা আমরা বলি, একটি বিচ্ছিন্ন বর্ণালীর বিকিরণ ঘটায়। দুটি বর্ণালীর মধ্যে সাধারণভাবে কি মিল রয়েছে?

ইলেকট্রনের কক্ষপথের শক্তিরূপী সিঁড়ির ধাপগুলোর বিভিন্ন উচ্চতা রয়েছে। উচ্চতা তত কম হবে, কেন্দ্রক থেকে কক্ষপথের দূরত্ব যত বাড়বে। একটি লম্বা সিঁড়ির তলা থেকে তাকালে, পরিপ্রেক্ষিতে, যে রকম দেখায়, পরমাণুর মধ্যে শক্তিরূপী সিঁড়িটা তুলনামূলকভাবে অনেকটা যেন সেরকম:

দূরপ্রান্তের ধাপগুলোকে দেখাবে অনেকটা কাছাকাছি। সিঁড়িটির ক্ষেত্রে, এ শুধু দৃষ্টির বিভ্রম, কিন্তু পরমাণুর ক্ষেত্রে এ হল একটি বাস্তব ঘটনা।

শক্তির অনুভূমিকের উচ্চতার সঙ্গে ফোটনের শক্তি বা তার বর্ণালী রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, কেন্দ্রক থেকে দূরের কক্ষপথগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে বর্ণালীর বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সব রেখা, সেগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি হতেই হবে; তার ফলে সেইখানে সমগ্র বর্ণালীটির একটি অবিচ্ছিন্ন চেহারা ফুটে ওঠে।

অতএব কোয়ান্টাম বর্ণালীর বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অংশের সঙ্গে ক্ল্যাসিকাল বর্ণালীর একই অংশের বিশেষ কোন বস্তুগত পার্থক্য ধরা পরবে না। এই ক্ষেত্রে, প্রথম বর্ণালীর উজ্জ্বলতাকে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ভিত্তিতে হিসেব করা চলতে পারে। এরপর আমরা এ হিসেবের পদ্ধতিকে সমগ্র কোয়ান্টাম বর্ণালীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারি। এটাই হল প্রতিবন্ধ পদ্ধতি।

সমগ্র ধারণাটি অপূর্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু পদার্থবিদরা হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। পরীক্ষার মাধ্যমে বর্ণালীরেখার যে উজ্জ্বলতা পাওয়া গেল, তাত্ত্বিক বিচারের ফলাফলের সঙ্গে তার পার্থক্য ধরা পড়ল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এছাড়া আর কিই বা প্রত্যাশা করা চলত। যে তত্ত্বকে সাহায্যের জন্যে বাইরের কাছে হাত পাততে হয়, তাকে বিশেষ বলিষ্ঠ বলা চলে না। যাকে আবার সাম্প্রতিক বিরোধীপক্ষের কাছেই সাহায্যের জন্যে যেতে হয়, তা বাস্তবিকই দুর্বল।

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যাকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা, ইংরেজ পদার্থবিদ ব্র্যাগের ভাষায় যেন সপ্তাহের যুগল দিনগুলোতে 'ক্ল্যাসিকাল ধর্ম' এবং অযুগল দিনগুলোতে 'কোয়ান্টাম ধর্ম'কে প্রচার করার মত একটা ব্যাপার। যদিও বিজ্ঞান কখনো কখনো দুই দেবতার শরণাপন্ন হয়, এবং তাতে কাজও হয় বটে, কিন্তু আসলে এ হল তত্ত্বটির একটি দুর্বলতারই পরিচয়পত্র।

নতুন তত্ত্বটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে যে, বোরের তত্ত্বের মধ্যে প্রতিবন্ধ পদ্ধতিই একমাত্র বিচ্যুতি ছিল না। আসলে, একেবারে গোড়া থেকেই এর সব কটি মৌল আশ্রয়বাক্যই ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছিল।

বোর ইলেকট্রনের গতিবিধি সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করলেন, অথচ পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের বিভিন্ন কক্ষপথের ধারণাকে প্রয়োগ করে বসলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, ইলেকট্রনেরাও ঠিক সেইভাবে পরমাণুর কেন্দ্রকের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে।

ইলেকট্রনের কক্ষপথে থাকাকালীন অবস্থায় বিকিরণের ঘটনাকে বোর নিষিদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এটা করার সপক্ষে যথেষ্ট ভাল যুক্তিও কিন্তু তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বোরের তত্ত্ব থেকে পরমাণুদের মধ্যে ফোটনদের উৎপত্তির ব্যাপারে একটি সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু ব্যাপারটি কি তা রহস্যাবৃত রয়েই গেল। এর স্বীকার্যদের কোন একটি থেকেও এর কোন ধারণা করে ওঠা যাচ্ছিল না।

বোরের তত্ত্বের এই দ্বৈত প্রকৃতি খুব শীঘ্রই নিজেকে প্রকাশ করল। নতুন নতুন সব তথ্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল, তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে যা খাপ খাচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও তত্ত্বটির মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর ছিল। পরমাণুর জগতকে বোঝার জন্যে বোরের তত্ত্ব ছিল এক বিরাট অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। আবার এর সীমাবদ্ধতাও ছিল। অনেক কিছুই এ ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল যা ছিল দুর্বোধ্য এবং ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু আবার প্রায় একই পরিমাণ অংশের কোনরকম ব্যাখ্যাই এর কাছ থেকে মেলে নি।

শীঘ্রই নতুন করে পা ফেলার সময় এসে গিয়েছিল। সে কাজ শুরু হল। প্রথম পদক্ষেপটি ফেললেন ফরাসী পদার্থবিদ লুই দ্য ব্রগ্‌লি।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

বোরের তত্ত্ব থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা

॥ অসাধারণ একটি প্রবন্ধ ॥

১৯২৪ সালে, ইংরেজী 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এক অপরিচিত পদার্থবিদ লুই দ্য ব্রগলির একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক তাঁর তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলো তুলে ধরেছিলেন। জড় তরঙ্গদের সম্ভাব্য অস্তিত্বই ছিল দ্য ব্রগলির আলোচনার বিষয়বস্তু।

জড়বস্তুর তরঙ্গ? সাধারণভাবে পরিচিত শব্দ, আলো এবং ঐ জাতীয় অন্য সব তরঙ্গ, যারা যথেষ্ট বাস্তব এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাদের উপলব্ধি করা যায় বা বিভিন্ন যন্ত্রে যারা লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠে, তাদের মতই কি নয় ঐ তরঙ্গগুলো?

না, দেখা গেল যে, দ্য ব্রগলির মনে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের তরঙ্গের কথা। তাঁর ধারণাগুলো ছিল এতই অভিনব ও উল্টোপাল্টা যে, মৌলিকত্বের দিক থেকে সেগুলি শক্তির কোয়ান্টা সম্বন্ধে প্লাংকের পঁচিশ বছর আগেকার ধারণার সঙ্গে সহজেই তুলনীয় হতে পারে। পদার্থবিদ্যায় ঐগুলির গুরুত্বের বিষয়েই শুধু নয়, যেভাবে অগণিত পদার্থবিদ ওদের গ্রহণ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গেও কথাটা প্রযোজ্য: সেটি ছিল খোলাখুলি অবিশ্বাসের মনোভাব।

সে যাই হোক, এই জড় তরঙ্গগুলো আসলে কি ব্যাপার?

সে আলোচনায় প্রবেশ করার আগে, 'সাধারণ' তরঙ্গদের উপর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক; এদের পরীক্ষানিরীক্ষার কাজটা ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

॥ সাধারণ তরঙ্গ সম্পর্কে অল্প কিছু ॥

একটি পুকুরে একটি ঢিল ছুঁড়ে লক্ষ্য করুন, ঢেউগুলো কিভাবে জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে, পৃষ্ঠদেশীয় তরঙ্গই কার্যত একমাত্র তরঙ্গশ্রেণী, যা গতিশীল অবস্থায় সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য।

মনে হতে পারে যে, ঢেউয়ের সঙ্গে জলও বুঝি নড়ছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। একটি ছোট ছেলে তার খেলনার জাহাজের পেছনে কিভাবে পাথর ছুঁড়ছে, লক্ষ্য করুন ; সে হয়ত আশা করছে, এভাবে জাহাজটাকে জলের ধারে ফিরিয়ে আনা যাবে। ঢেউগুলো জাহাজের তলা দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর জাহাজটা একই জায়গায় শুধু ওঠানামা করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, জল প্রবাহিত হচ্ছে না, শুধু উপরনীচ করছে। বড় বড় পাথর ছুঁড়ে বড় আকারের ঢেউ তৈরী করলে জলে সামান্য একটি গতি বা প্রবাহ সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা বেশী দূর পর্যন্ত পৌঁছয় না।

জলের ওপরকার উচুঁ ঢেউয়ের এই 'বয়ে নিয়ে' যাবার ক্ষমতাকে ঢেউয়ের ঘাড়ে চড়ার খেলার সময় কাজে লাগান হয়, খেলাটি অস্ট্রেলিয়ায় এবং অন্যত্র খুব প্রচলিত। খেলোয়াড় একটি বড় কাঠের টুকরোর ওপর দাঁড়ান এবং নিয়মিতভাবে আসতে থাকা বড় আকারের ঢেউগুলোর সঙ্গে ওঠানামা করতে করতে তীরের দিকে এগিয়ে চলেন। তিনি একটি ঢেউয়ের ঘাড়ে চড়ে বসেন এবং তীব্রগতিতে তীরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন, কিন্তু নড়াচড়ায় সামান্যতম ভুল হলেই তিনি দেখবেন, ঢেউয়ের উচুঁ মাথার পরিবর্তে ওর নীচু অংশটায় পৌঁছে গেছেন।

এই বিপজ্জনক ও উত্তেজনাপ্রবণ খেলায়, ঢেউটি খেলোয়াড়কে ঘাড়ে নিয়ে ঠিক পাইলটের মত পথ দেখিয়ে তাকে তীরে পৌঁছে দেয়। পাইলট বা পথনির্দেশক তরঙ্গ কথাটা মনে রাখবেন। পরে আবার আমরা এর কথায় ফিরে আসব।

গত শতাব্দীতে, পদার্থবিদরা জানতে পারলেন যে, শব্দও একটি গতিশীল তরঙ্গ। দেখা গেল, শব্দ তরঙ্গেরা বাতাস, জল এবং কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। শব্দ তরঙ্গের মধ্যে কোন্ বস্তুটি কাঁপতে থাকে ? যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে তার কণিকারাই কেঁপে ওঠে, যেমন বাতাস ও জলের অণুরা এবং পদার্থের পরমাণুরা।

বাতাস, জল এবং অন্যান্য বস্তুরূপী মাধ্যমকে সরিয়ে নিন, শব্দ তরঙ্গ অন্তর্ধান করবে। বায়ুহীন প্রদেশে কোন শব্দ শ্রুত হবে না। ভবিষ্যতের মহাকাশযাত্রীরা দূরবর্তী বায়ুহীন গ্রহজগতে এক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার পরিবেশে সম্ভবত আগ্নেয়গিরির বিরাট অগ্ন্যুদ্গারকে পর্যবেক্ষণ করবেন। শুধু তাঁদের

পায়ের তলায় জমির কাঁপুনিকে অনুভব করতে পারবেন। চাঁদের জমিতে, এক পরম নিস্তব্ধতার মধ্যে মহাকাশযানের যাত্রা শুরু হবে। পৃথিবীতে আমরা যেমন দেখি, সেখানে কিন্তু রকেটের এঞ্জিনের কোন গর্জনই শোনা যাবে না।

গত শতাব্দীর পদার্থবিদরা অণুরূপভাবে বৈদ্যুতিক আধানের গতিসঞ্জাত বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন।

পৃথিবীতে বর্তমানে দূরের নক্ষত্র এবং নীহারিকাদের যে আলো এবং বেতারতরঙ্গ এসে পৌঁছচ্ছে, তারা তাদের যাত্রা শুধু করেছিল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর আগে। তাদের যাত্রাপথ তৈরী হয়েছিল সুবিশাল এবং বায়ুশূন্য আন্তঃর্নাক্ষত্রিক মহাকাশের মধ্য দিয়ে। চাঁদের জমিতে, এক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ পরিবেশে মহাকাশযাত্রীরা দেখবেন, তাঁদের মহাকাশ রকেটের তলদেশ থেকে চোখঝলসানো আগুনের স্রোত বেরিয়ে আসছে।

বায়ুহীন শূন্যে দেখা যায়, কিন্তু শোনা যায় না। সেইটেই হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ এবং যান্ত্রিক তরঙ্গ (শব্দতরঙ্গেরা যাদের অন্তর্ভুক্ত), এদের মধ্যে সবচেয়ে মূলগত পার্থক্য। বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গদের বিস্তারের জন্যে কোন আভ্যন্তরীণ মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। বরং, কোন মাধ্যম থাকলেই এদের গতি কমে আসে।

॥ জড় তরঙ্গদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ॥

জড় তরঙ্গদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। দ্য ব্রগলির বক্তব্য ছিল এই যে, এই তরঙ্গেরা যে কোন বস্তুর গতি থেকেই তৈরী হয়, তা সে একটি গ্রহ, একটি পাথর, একটি ধূলোর কণা বা একটি ইলেকট্রন, যাই হোক না কেন। বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গদের মত, এই তরঙ্গেরা এক পরম বায়ুহীন প্রদেশের মধ্য দিয়ে বিস্তারলাভ করতে পারে। কাজেই, এরা যান্ত্রিক তরঙ্গ নয়। কিন্তু এরা সব পদার্থের গতি থেকেই উৎপন্ন হয়, যারা বৈদ্যুতিক-ভাবে আধানযুক্ত নয় তাদের গতি থেকেও। অতএব, এরা বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ নয়।

ও সময়ে পদার্থবিদরা অন্য কোন ধরণের তরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন

না। কাজেই এই জড় তরঙ্গেরা বাস্তবিকই ছিল এ পর্যন্ত অজ্ঞাত কোন নতুন ধরণের তরঙ্গ। পুরনো পদার্থবিদরা একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে বসলেন, যত সব বাজে ব্যাপার।

তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সম্ভাব্য সব জাতের তরঙ্গের ইতিমধ্যেই আবিষ্কার ঘটেছে। এই ছোকরা লুই দ্য ব্রগলি জড় তরঙ্গের কথা বলছে, কিন্তু যান্ত্রিক এবং বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ, এরা কি জড় তরঙ্গ নয়? জড় বিনা কোন তরঙ্গ নেই, প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই নেই।

এটা ঠিক যে, দ্য ব্রগলি তাঁর তরঙ্গদের একটি বেশ ভাল গোছের নাম দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি কিই বা করতে পারতেন? বিজ্ঞানীরা নতুন বিষয়দের ঠিকমত বুঝে ওঠবার আগেই তাদের নামকরণ ঘটে যায়।

দ্য ব্রগলির ক্ষেত্রে ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। ঐ জড় তরঙ্গেরা এত জটিল বলে প্রমাণিত হল যে, পদার্থবিদরা এখনো পর্যন্ত ওদের নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চালাচ্ছেন। দ্য ব্রগলির তরঙ্গগুলিকে আমাদের একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে, কারণ এরা হল বর্তমান কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ।

॥ দ্য ব্রগলির তরঙ্গদের আমরা দেখতে পাই না কেন? ॥

পদার্থবিদরা দ্য ব্রগলিকে গোড়ায় যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, এটি সম্ভবত ছিল তাদের মধ্যে একটি। বেশ, দেখা যাক, আমরা তরঙ্গদের সাধারণত কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? শুধু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়, যন্ত্র হিসেবে যাদের অবশ্য মোটেই নিখুঁত বলা চলে না। মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় প্রতি সেকেণ্ডে 20 থেকে 16,000, এই কম্পাংকের শব্দতরঙ্গ অনুভব করে। এই কম্পাংকগুলি সেই সকল শব্দের অনুরূপ, বাতাসে যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ প্রায় 17 মিটার থেকে 2 সেন্টিমিটার। মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় যে আলোর তরঙ্গে সাড়া দেয়, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ 0.4 থেকে 0.8 মাইক্রনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তরঙ্গদের সম্বন্ধে কিছু জানার ব্যাপারে ওরা হল যেন প্রকৃতির 'জানালার' মত (অবশ্য, আমরা যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের তরঙ্গদের কথা বাদ দিই)। পদার্থবিদরা বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনধিগম্য তরঙ্গগুলিকে এমন তরঙ্গদৈর্ঘে রূপান্তরিত করেন, যারা এই দুটি 'জানালার' মধ্যে অবস্থিত।

এর ফলে তরঙ্গদের চরিত্র গবেষণার সম্ভাবনাটা বিপুলভাবে বেড়ে ওঠে। মহাবিশ্বের গভীর প্রদেশ থেকে মিটার এবং সেন্টিমিটার স্তবকের যে সব বেতারতরঙ্গেরা পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে, রেডিও গ্রাহকযন্ত্রেরা তাদের গ্রহণ করে এবং তাইতেই আমরা তাদের অনুধাবন করতে পারি। স্ফুলিঙ্গায়ণ গণকযন্ত্র * পারমাণবিক কেন্দ্রক থেকে নির্গত গামা রশ্মিকে ধরার কাজটা সম্ভব করে তোলে। এরা হল বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ, যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিলিমিটারের বহু কোটি ভাগের বহু কোটি ভাগ।

এখন বোঝা যাচ্ছে, তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে এলাকা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে, সেটা খুবই প্রশস্ত। তাহলে, দ্য ব্রগলির তরঙ্গদের সন্ধান আমরা পাই নি কেন?

প্রশ্নটা হল: পাওয়া যাবে কিভাবে? যান্ত্রিক তরঙ্গেরা (যেমন, শব্দতরঙ্গেরা), যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিটারের কোঠায়, কানে শুনেই ওদের ধরা যেতে পারে। কিন্তু একটি রেডিও, নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে টিউন করা হলেও, ঐ তরঙ্গদের ধরে উঠতে পারবে না। রেডিও কেবলমাত্র বেতারতরঙ্গদের কাছেই সাড়া দেয়। আর একদিক থেকে দেখলে, বেতারতরঙ্গেরা মানুষের কান বা অন্য যান্ত্রিক উপকরণের দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয় না, যদিও তারা দৈর্ঘ্যে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

প্রতিটি গ্রাহকযন্ত্র কেবলমাত্র তার নিজস্ব ধরণের তরঙ্গের কাছেই সাড়া দেয়। কান সাড়া দেয় শব্দতরঙ্গের কাছে, চোখ সাড়া জোগায় বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের কাছে। কিন্তু দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের ধরার উপায় কি, যেহেতু ওরা ঐ দু'টি শ্রেণীর একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়? আসলে যে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, ঐটিই হল তার উত্তর। পরে এ বিষয়ে আরো কিছু আমরা জানতে পারব।

যদি আমরা এই জড় তরঙ্গদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি, তাহলে আর একটি উত্তর পাওয়া যাবে। দ্য ব্রগলি নতুন তরঙ্গদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের

* স্ফুলিঙ্গায়ণ গণকযন্ত্র পারমাণবিক কণিকাদের এবং গামা রশ্মির কোয়ান্টাকে লিপিবদ্ধ করার জন্যে বিশেষ ধরণের কেলাস (ক্রিস্ট্যাল) ব্যবহার করে। যখন একটি কণিকা অথবা বিকিরণের কোয়ান্টাম এ জাতীয় কেলাসের ওপর এসে আছড়ে পড়ে, তখন একটি ছটা বা স্ফুলিঙ্গায়ণ নির্গত হয় এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠে।

অক্কে গতিশীল পদার্থদের ভর এবং বেগের ব্যাপারকে যুক্ত করে একটি পারস্পরিক সম্পর্ককে লাভ করলেন। সেটি ছিল এরকম :

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

এই সম্পর্কটির মধ্যে λ (ল্যাম্বডা) দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘকে ব্যক্ত করছে এবং m ও v হ'ল যথাক্রমে, পদার্থটির ভর এবং বেগ ; h হ'ল আমাদের পুরনো বন্ধু, প্লাংকের ধ্রুবক।

এই সমীকরণটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর অর্থ হল এই যে, দ্য ব্রগলি তরঙ্গেরা কোয়াণ্টাম প্রকৃতির অধিকারী। পরে আমরা আবার এই সমীকরণটির প্রসঙ্গে আসব। ইতিমধ্যে, দ্য ব্রগলিকে অনুসরণ করে, কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘেরা আমাদের চারপাশের পদার্থদের গতির অনুরূপ হয়, তা বার করে ফেলা যাক। একটি গ্রহ, একটি প্রস্তরখণ্ড এবং একটি ইলেকট্রনের বেলায় সংক্ষেপে হিসেবটা করা যাক।

একনজর তাকালেই দেখা যাবে যে, এই তরঙ্গদৈর্ঘেরা হবে খুবই ছোট, যেহেতু সমীকরণের লব হল প্লাংকের ধ্রুবক, যা খুবই ছোট একটি সংখ্যা : 6.6×10^{-27} আর্গ প্রতি সেকেণ্ডে।

পৃথিবী গ্রহের কথা নেয়া যাক। এর ভর হল 6×10^{27} গ্র্যাম এবং সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে এর বেগ হল প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 3×10^{6} সেন্টিমিটার। দ্য ব্রগলির সম্পর্কের মধ্যে এই সংখ্যাগুলোকে বসিয়ে আমরা দেখছি, পৃথিবীর তরঙ্গের দৈর্ঘ দাঁড়াচ্ছে

$$\lambda = \frac{6.6 \times 10^{-27}}{6 \times 10^{27} \times 3 \times 10^{6}} = 3.6 \times 10^{-61} \text{ সেন্টিমিটার}$$

এটি হল এক অসম্ভব ক্ষুদ্র সংখ্যা। বর্তমানে চালু বা আগামী ভবিষ্যতের কোন যন্ত্রের দ্বারা এত ক্ষুদ্র একটি সংখ্যাকে লিপিবদ্ধ করে ওঠা যাবে না। এই সংখ্যাটি যে কত ছোট তার দৃষ্টান্ত দেবার জন্যে অন্য কোন তুলনা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

এক টুকরো পাথরের তরঙ্গদৈর্ঘ কি দাঁড়ায় দেখা যাক। 100 গ্রামের

এক খণ্ড পাথর নেওয়া হল যা প্রতি সেকেণ্ডে 100 সেন্টিমিটার গতির সঙ্গে ছুটে চলেছে : দ্য ব্রগলির সূত্র থেকে আমরা দেখছি

$$\lambda = \frac{6.6 \times 10^{-27}}{100 \times 100} = 6.6 \times 10^{-31} \text{ সেন্টিমিটার}$$

পৃথিবীর দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় এ যে বিশেষ কিছু দাঁড়াল, তা নয়। এই তরঙ্গকে যে কখনো ধরা যাবে, তার একেবারে কোন আশা নেই বলেই মনে হচ্ছে। পারমাণবিক কেন্দ্রক যা কিনা যে কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নাগালের বহুদূর বাইরে রয়েছে তার বহু লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের চেয়েও ছোট হল এই সংখ্যাটি।

এবারে ইলেকট্রনকে নেওয়া যাক। এর ভর হল প্রায় 10^{-27}গ্র্যাম। একটি ইলেকট্রন যদি এক ভোল্ট বিভবের পার্থক্যযুক্ত কোন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে গতি লাভ করে, তাহলে যে বেগ এ লাভ করবে তার পরিমাণ হল প্রতি সেকেণ্ডে 6×10^7 সেন্টিমিটার। দ্য ব্রগলি সম্পর্কের মধ্যে এই সংখ্যাগুলোকে বসালে আমরা পাব

$$\lambda = \frac{6.6 \times 10^{-27}}{6 \times 10^7 \times 10^{-27}} = 10^{-7} \text{ সেন্টিমিটার}$$

এ একেবারে আলাদা একটি ব্যাপার। 10^{-7} সেন্টিমিটার হল রন্‌জন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি একটি সংখ্যা, যা সনাক্ত করা সম্ভব। অতএব, তাত্ত্বিকভাবে, একটি দ্য ব্রগলি ইলেকট্রন তরঙ্গের অস্তিত্ব আমাদের আবিষ্কার করে ফেলা উচিত।

॥ তরঙ্গটি পাওয়া গেল ॥

কিন্তু কিভাবে? দ্য ব্রগলি তরঙ্গ রয়েছে তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে এবং যান্ত্রিকভাবে একে সনাক্ত করার কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটি তরঙ্গ আদতে একটি তরঙ্গই এবং এর প্রকৃতি যাই হোক না কেন, এমন কিছু প্রতীত ব্যাপার নিশ্চয়ই রয়েছে, যেখানে এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। একটি অবচ্যুতির পরীক্ষায় দ্য ব্রগলি তরঙ্গকে ধরার চেষ্টা করা হল, যে পরীক্ষাটি করার মূল কারণ ছিল এই যে, অবচ্যুতি সম্পূর্ণভাবেই একটি তরঙ্গ-

ঘটিত ব্যাপার। অবচ্যুতির ব্যাপারটা হল এই যে, একটি তরঙ্গ যখন কোন বাধায় মুখোমুখি হয়, তখন সে সেই বাধাকে ঘুরে এড়িয়ে চলে। সে সময় তরঙ্গটি তার সোজা পথ থেকে খানিকটা বিচ্যুত হয় এবং বাধার পেছনে 'ছায়া'র স্থানের মধ্যে প্রবেশ করে।

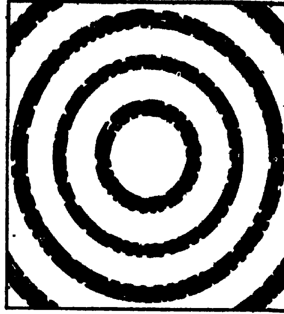
গোলাকার কোন বাধা বা ছিদ্রপথ থেকে, তরঙ্গের পক্ষে অস্বচ্ছ কোন পর্দার মধ্যে—তরঙ্গের যে অবচ্যুতির ছবি তৈরী হয়, তা হল পরপর সাজানো অন্ধকার এবং আলোর কতকগুলো বলয়ের এক বিশেষ সমাবেশ। ধূলোয় ভরা কাচের মধ্য দিয়ে রাস্তার আলোর দিকে তাকালে এই ধরণের একটি ছবি চোখে পড়বে। তুষারে ঢাকা রাতগুলোতে, চাঁদ কতকগুলো আলো এবং অন্ধকার বলয় দিয়ে ঘেরা থাকে : চাঁদের আলোর অবচ্যুতি ঘটায় বাতাসে নৃত্যরত বরফের ছোট ছোট কেলাসের দানা।

অবচ্যুতি তরঙ্গের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আলোর অবচ্যুতির আবিষ্কারই আলোর তরঙ্গবাদের স্বপক্ষে এক অত্যন্ত জোরালো যুক্তির কাজ করেছিল।

কিন্তু আলোর তরঙ্গদের তরঙ্গদৈর্ঘ ইলেকট্রনদের দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের তুলনায় বহু শতগুণ, এমন কি বহু হাজার গুণ বড়। আলোর অবচ্যুতি ঘটানোর জন্যে যে সব উপকরণ তৈরী করা হয়েছে, যেমন—চীর, পর্দা, অবচ্যুতি জাল—এরা ছিল বড় স্থূল ধরণের। তরঙ্গদের অবচ্যুতিকে পর্যবেক্ষণের জন্যে যে সব বাধাকে ব্যবহার করা হয়, তাদের মাত্রা তরঙ্গ-দৈর্ঘের মাপের সঙ্গে তুলনীয় অথবা তার চেয়ে ছোট হওয়া চাই। আলোর তরঙ্গদের ক্ষেত্রে যা সম্ভব, দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের ক্ষেত্রে তা একেবারেই অসম্ভব।

১৯২৪ সালের মধ্যে দ্য ব্রগলি ইলেকট্রন তরঙ্গদের অবচ্যুতিকে নির্ণয় করার জন্যে কি কি বস্তুকে ব্যবহার করতে হবে তা জানা গিয়েছিল। বার বছর আগে, জার্মান বিজ্ঞানী লাউয়ে কেলাসের সাহায্যে রনৃজন-রশ্মির অবচ্যুতিকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দেখলেন, কেলাসের মধ্য দিয়ে আসা রনৃজন-রশ্মির প্রভাবে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপরে সারি সারি কালো এবং সাদা বিন্দু ফুটে উঠেছে। কয়েক বছর পরে ডেবাই ও শেরার গুঁড়ো পদার্থের ছোট ছোট কেলাসের নমুনার ওপর লাউয়ের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন এবং অবচ্যুতির বলয়দের পেলেন। এই সব

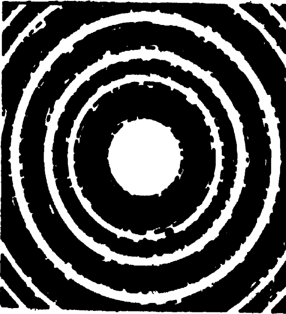
ক্ষেত্রে, অবচ্যুতির ব্যাপারটা সম্ভব হচ্ছিল কারণ কেলাসদের পরমাণুগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব (রন্‌জন-রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ একটি 'পর্দার' মধ্যেকার চীরের মত), তা ছিল রন্‌জন-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাণের সমান: 10^{-8} সেন্টিমিটার।



রন্‌জন-রশ্মির প্যাটার্ন

কিন্তু দ্য ব্রগলি তরঙ্গের দৈর্ঘ এই পাল্লার মধ্যেই রয়েছে। যার অর্থটা হল, এই জাতীয় তরঙ্গদের অস্তিত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে ইলেকট্রনেরা, একটি কেলাসের মধ্য দিয়ে গিয়ে, একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর অবচ্যুতির যে প্যাটার্নটা তৈরী করবে, তা অবিকল রন্‌জন-রশ্মির প্যাটার্নের মতই।

দ্য ব্রগলি তাঁর নতুন ধারণাকে উপস্থাপিত করার কয়েক বছর পরে অ্যামেরিকার দু'জন বিজ্ঞানী, ডেভিসন ও জার্মার এবং সোভিয়েট পদার্থবিদ্‌ তারতাকভ্‌স্কি কেলাসের দ্বারা ইলেকট্রনদের অবচ্যুতির একটি পরীক্ষায় এই ধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন করলেন। কিন্তু 'ইলেকট্রন রশ্মি' এবং রন্‌জন-রশ্মির সাদৃশ্যটাই যথেষ্ট ছিল না। পরীক্ষাটি এক অসাধারণ কুশলী বুদ্ধির দাবী জানাচ্ছিল।



ইলেকট্রন অবচ্যুতির প্যাটার্ন

রন্‌জন-রশ্মি কেলাসের মধ্য দিয়ে প্রায় কোন রকম বাধা না পেয়েই যেতে পারছিল, কিন্তু ইলেকট্রনেরা এক মিলিমিটারের মাত্র এক ভগ্নাংশ পুরু একটি কেলাসের স্তরের মধ্যেই পুরোপুরিভাবে বন্দী হয়ে পড়ল। কাজেই যা দরকার ছিল তা হল, পাতলা কেলাসের প্লেট বা ধাতুর পাত, অথবা হয়ত

বাধাজাতীয় কোন বস্তু নিয়ে কাজ করা, অ্যাপার্চার বা ছিদ্রপথ নয়। এ ক্ষেত্রে, ইলেকট্রনের রশ্মিকে সামান্য কোণাকুণিভাবে কেলাসের সম্মুখভাগে ফেলা হল, যাতে ইলেকট্রনেরা কেলাসের গভীরে প্রবেশ না করে তার ওপরেই যেন একটু গড়িয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে ফিরে আসতে পারে। এর ফলে, কেলাসটির একেবারে বাইরের স্তরে যে সব পরমাণুরা রয়েছে, তাদের ওপর থেকেই ইলেকট্রনদের অবচ্যুতি ঘটল। যে ইলেকট্রনদের ক্ষেত্রে অবচ্যুতি ঘটল, তারা ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। *

তারতাকভ্স্কি ইলেকট্রন রশ্মিকে বহু ছোট ছোট কেলাস নিয়ে গড়ে ওঠা একটি পাতলা পাতের ওপর ফেললেন। কয়েক মিনিট দীর্ঘ সময় ধরে এক্সপোজার বা উদ্ঘাটনের কাজ চলল।

পরিস্ফুটনের পর, ফটোগ্রাফটির ওপর প্রকৃত অবচ্যুতির বলয়দের রূপরেখা ফুটে উঠল। এই প্রথম প্লেটগুলো, যাদের দাম ছিল ওদের সমান ওজনের সোনার চেয়েও বেশী, তাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পদার্থবিস্থার গবেষণাগারগুলোতে পাঠানো হল। সেখানে ওদের খুব যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হল। আর কোন সন্দেহ রইল না। জড় তরঙ্গদের সম্বন্ধে দ্য ব্রগলির বলিষ্ঠ প্রকল্প হাতেকলমে পরীক্ষায় প্রোজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হল। ইলেকট্রনেরা কণিকাদের ধর্ম এবং তরঙ্গদের ধর্ম উভয়কেই প্রকাশ করে থাকে।

॥ দ্বি-মুখা কণিকা ॥

এই সব সিদ্ধান্তমূলক পরীক্ষাগুলো হবার আগেই, বিজ্ঞানীরা দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের প্রকৃত অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। কণিকারূপী ইলেকট্রন-দের আচরণে এই যে দ্বৈত প্রকৃতি, তা অনুধাবণের উপায়ই বা কি?

ঐ সময়ে, একটি ইলেকট্রন আসলে কি, তা পদার্থবিদ্রা জানতেন। এ হল একটি অতি ক্ষুদ্র এবং হাল্কা বস্তুকণা, সামান্য পরিমাণ বৈদ্যুতিক আধানকে যে বয়ে নিয়ে চলেছে। বেশ দীর্ঘকালের মধ্যে এ প্রশ্নটা কেউ

* ইলেকট্রনেরা দৃশ্য আলো, বা রন্জন-রশ্মির মতই একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে ঝাপসা করে তুলতে পারে।

করেন নি যে, এই কণিকাটির চেহারাটা কিরকম বা এর ভেতরেই বা কি ঘটছে। একটি ইলেকট্রনকে কার্যতঃ পর্যবেক্ষণ করার কোন উপায়ই ছিল না, এর আভ্যন্তরীণ গঠনের ছবিটা কিরকম তা নিরূপণ করার জন্যে চেষ্টার তো কোন কথাই নেই।

কিন্তু ইলেকট্রন যদি একটি কণিকা হয়, তাহলে কণিকার ধর্মগুলোও এর মধ্যে নিশ্চয়ই থাকবে। সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনের মধ্যে তরঙ্গের গুণ কি করে থাকতে পারে, যেখানে কণিকা ও তরঙ্গ হল একেবারেই ভিন্ন জাতের?

জড় তরঙ্গদের ব্যাখ্যা দেবার প্রথম প্রচেষ্টা দ্য ব্রগলি নিজেই করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, পদার্থবিদরা যখন প্রথম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা, অভ্যাসবশতঃ, চিত্রকল্প মডেল নিয়েই কাজ করে চললেন। বোর-রাদারফোর্ড তত্ত্বে, পরমাণু ছিল গ্রহজগতের মত একটি ব্যাপার, যেখানে ইলেকট্রনরূপী গ্রহেরা সূর্যরূপী কেন্দ্রকের চারদিকে ঘুরে চলেছে, একমাত্র তফাৎটা ছিল এই যে, ইলেকট্রনেরা প্রায়ই তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করতে পারত, গ্রহদের ক্ষেত্রে যেটা একেবারেই সম্ভব নয়।

কিন্তু তারপরে এল আলোর কোয়াণ্টাম—ফোটন। আইনষ্টাইন দেখালেন, ফোটনও একই সঙ্গে তরঙ্গ এবং কণিকার ধর্মাবলীর অধিকারী হয়ে আছে। স্বভাবতই, এ ধরণের একটি দ্বৈত বস্তু ছিল কোন চিত্রকল্প রূপায়ণের আয়ত্তের বাইরে।

কাজেই পদার্থবিদ্যা প্রথম একটি অচিত্রিতব্য সত্ত্বার মুখোমুখী হল। দ্য ব্রগলির আবিষ্কারের ফলে, এই অকল্পনীয়তাকে বস্তুকণাদের ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র ইলেকট্রন থেকে শুরু করে বিশাল জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তুদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে হল। এ ছিল সত্যিই এমন একটি ব্যাপার যার কাছ থেকে পালিয়ে আসতে হয়।

এটা কল্পনা করাই বা কিভাবে সম্ভব যে, একটি ইলেকট্রন তার গতিপথে কোন বাধা পেলেই, অবচ্যুতির ফলে, ঘুরে গিয়ে তার পিছনে এসে হাজির হবে। ব্যাপারটা তা নয়, তরঙ্গ এবং কণিকা—এরা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র সত্তা। একটি বস্তু হয় তরঙ্গ নয়ত কণিকারূপে থাকতে পারে।

তবুও দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের অস্তিত্ব রয়েছে। এ 'হয় এটি নয় ওটি', তা

নয়, কিন্তু একসঙ্গে 'দুই-ই'। অসংযোজনীয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যে কিছু একটা করতে হল। তা শুধু অবচ্যুতিপরায়ণ ইলেকট্রনের অনন্য ও বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই নয়। একটি ইলেকট্রন যদি তরঙ্গধর্মের অধিকারী হয়, তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের পৃথিবীর অন্য সব বস্তু, সবচেয়ে ক্ষুদ্র থেকে সর্ববৃহৎ, সবাইকেই ঐ ধর্মের অধিকারী হতেই হবে।

দ্য ব্রগলি পথদেশক তরঙ্গের ধারণার মাধ্যমে এই অস্বাভাবিক সংশ্লেষণের প্রারম্ভের প্রস্তাবনা করলেন।

। পথদেশক তরঙ্গ ।

ঢেউয়ের মাথায় চড়ে খেলাটার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। খেলোয়াড় একটি উঁচু ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসেন, যে তাকে ঘাড়ে করে তীরে পৌঁছে দেয়। তরঙ্গটি একটি পথদেশকের মত কাজ করে।

দ্য ব্রগলির ধারণা হচ্ছে এই যে, জড় তরঙ্গেরা একইরকমভাবে গতিশীল বস্তুর কণিকাদের ক্ষেত্রেও পথদেশকের ভূমিকা গ্রহণ করে। একটি কণিকা যেন একটি তরঙ্গের ওপর চেপে বসে এবং জড় তরঙ্গ যেখানেই তাকে বয়ে নিয়ে যাক না কেন, সেও গিয়ে হাজির হয়।

দ্য ব্রগলি বলছেন, এই তরঙ্গের দৈর্ঘ বেশ বড় হতে পারে। একটি ইলেকট্রন যখন অল্প গতিবেগের অধিকারী, তখন ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ খোদ ইলেকট্রনের তুলনায় বহু হাজার গুণ বড় হয়। বেগ যত বেড়ে চলে, কণিকাটি যেন তরঙ্গটিকে নিজের দেহের মধ্যে টেনে নেয়, তার ফলে তরঙ্গটি মাপে ছোট হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু গতিবেগ বেশী হলেও ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ ইলেকট্রনের মাত্রার তুলনায় তবুও বেশীই থাকে।

ইলেকট্রন তরঙ্গকে অথবা তরঙ্গ ইলেকট্রনকে, কে কাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, তাতে কিছুই এসে যায় না। আসল কথাটা হল এই যে, তরঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে এবং সব সময়ের জন্যে ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। ইলেকট্রনটি থামলেই ইলেকট্রন তরঙ্গের অন্তর্ধান ঘটে। সেই মুহূর্তটিতে, দ্য ব্রগলি সম্পর্কের অংকটিতে হরের মান হয়ে দাঁড়ায় শূন্য এবং তরঙ্গদৈর্ঘ হয়ে পড়ে এক অসীম সংখ্যা। অন্যভাবে বলতে গেলে, তরঙ্গটির শীর্ষ এবং

তলদেশ পরস্পরের মধ্যে এত দূরত্ব বজায় রেখে চলে যে, ইলেকট্রন তরঙ্গ তার তরঙ্গরূপ হারিয়ে বসে।

দ্য ব্রগলির ছবিটি যথেষ্টই স্পষ্ট ; একটি ইলেকট্রন তার তরঙ্গের ঘাড়ে চেপে চলেছে। কিন্তু তরঙ্গটি এল কোথা থেকে? কণিকাটি যখন এক পরম শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে চলেছে, তখনো তরঙ্গ কণিকাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। যার অর্থটা হল এই যে, তরঙ্গ শুধু কণিকাটির দ্বারাই সৃষ্ট হচ্ছে। এখন সেটা ঘটছে কিভাবে?

এ প্রসঙ্গে দ্য ব্রগলির প্রকল্পের বক্তব্য কিছু নেই। এমনও হতে পারে, প্রকল্পটি অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে পারে, যেমন একটি কণিকা এবং তার তরঙ্গের মধ্যে কি ধরণের পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটছে, তরঙ্গটি কিভাবে কণিকার সঙ্গে একত্রে এগিয়ে চলেছে, কণিকাটির সঙ্গে অন্যান্য কণিকার এবং ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ওটির যে দশা হয়, যেমন ধরুন, কণিকারা যখন কোন বাধা অথবা কোন ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর এসে আপতিত হয়, তরঙ্গটি কিভাবে সেই দশার ভাগীদার হচ্ছে। না, প্রকল্পটির কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন প্রত্যয়জনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সমস্যার মধ্যে একটি পথ খুঁজে বার করার জন্যে, দ্য ব্রগলি কণিকাকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার চেষ্টা করলেন। তরঙ্গকেই কণিকারূপে কল্পনা করা যাক না কেন? অর্থাৎ কণিকাটিকে তার তরঙ্গদের একটি সমন্বয়রূপ বলে ধরে নিন, পদার্থবিদ্‌রা যার নাম দিয়েছিলেন একটি তরঙ্গ প্যাকেট। একটি প্যাকেটের অল্পসংখ্যক ছোট মাপের ঢেউয়ের সমষ্টিরূপে গড়ে ওঠার কথা ; দুটি বা তার বেশী প্যাকেট যখন পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন তাদের উচিত কণিকাদের মত ব্যবহার করা—ঠিক একটি ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের ফোটনের মত, যখন সেই ফোটন কোন ধাতুখণ্ড থেকে একটি ইলেকট্রনকে নির্গত করিয়ে বসে। কিন্তু প্যাকেটটি যতই জমাট হোক না কেন, একটি কণিকার সঙ্গে ওর চেহারার যতই মিল থাক না কেন, ওর উপাদান হল তরঙ্গ। এ থেকে নিশ্চিতভাবে এটাই বোঝা যায় যে, এমন ঘটনা নিশ্চয়ই রয়েছে যেখানে এ নিজের একেবারে গোড়াকার তরঙ্গ চরিত্রকে প্রকাশিত করে বসবে।

কিন্তু প্রকৃতি এ প্রস্তাবকেও প্রত্যাখান করলেন। দেখা গেল যে, তরঙ্গ

প্যাকেটগুলো যতই জমাট হোক না কেন, ওরা একটি কণিকাকে গড়ে তুলতে পারে না। এটা মূলগতভাবেই অসম্ভব। ব্যাপারটা হল এই যে, এ প্যাকেটগুলো কালক্রমে দ্রুতগতিতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এমন কি পুরোপুরি বায়ুশূন্য প্রদেশেও এটি ঘটে। অতি সামান্য সময় অন্তর অন্তর একটি প্যাকেট আকাশ দেশে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও মুছে যায় যে, পূর্বেকার ঘন কণিকাটি প্রায় হোমিওপ্যাথিক অনুপাতে পাতলা হয়ে পড়ে। তবুও আমরা জানি যে, কণিকারা নিশ্চিতভাবেই স্থায়ী এবং কালক্রমে তাদের ছড়িয়ে পড়ার কোন ধরণের লক্ষণ একেবারেই নেই।

এই মডেলটিকেও ছাড়তে হল। তরঙ্গ এবং কণিকার মত পারস্পরিক স্বতন্ত্র দুটি বাস্তব উপাদানকে একটি মাত্র প্রতিবিম্বের মধ্যে যান্ত্রিকভাবে একত্রীভূত করার প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করে নি এবং তা হতেও পারত না। কিন্তু তা পরের দিকে হয়েছিল। দ্য ব্রগলি কিন্তু যে 'সেণ্টরটিকে' খাড়া করেছিলেন, যার মাথাটা ছিল কণিকা আর শরীরটা ছিল তরঙ্গ দিয়ে তৈরী, তাকে ছেড়ে দিতে চাইছিলেন না।

দু বছর কেটে গেল। ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে, সমস্ত পৃথিবী থেকে পদার্থবিদ্‌রা ব্রাসেলসে সল্‌ভে কংগ্রেস উপলক্ষে এসে হাজির হলেন। এই কংগ্রেসে তরঙ্গ এবং কণিকাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে দ্য ব্রগলির রূপায়ণটি পুরোপুরিভাবে এবং জোরালোভাবে প্রত্যাখান করা হল। আগামী বহু বছর ধরে, এই সম্পর্কের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপায়ণ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। দু'জন তরুণ জার্মান পদার্থবিদ্‌ ভার্ণার হাইসেনবার্গ এবং আরউইন শ্রোয়েডিংগার কংগ্রেসে বিষয়টি উপস্থিত করেছিলেন।

॥ একত্রে অথবা স্বতন্ত্রভাবে ॥

হাইসেনবার্গ এবং শ্রোয়েডিংগার দ্য ব্রগলির ধারণাগুলোকে কবর দিলেন, কিন্তু তা করার সময় এত বাগ্মিতার সঙ্গে নিজেদের বক্তব্যকে উপস্থিত করলেন যে, তা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পরবর্তীকালের সমগ্র বিকাশের ধারাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

বস্তুদের গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তরঙ্গদের বিষয়ে দ্য ব্রগলির প্রধান

ধারণাটি বেশ কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা ক্রুতভাবে সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। দ্য ব্রগলির প্রথম নিবন্ধটি প্রকাশের পর এক বছর পেরোতে না পেরোতেই জার্মান পদার্থবিদ্ ম্যাক্স বর্ণ দ্য ব্রগলি তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাকে উপস্থিত করলেন।

বর্ণের ছাত্র, হাইসেনবার্গ—যাঁর বৈজ্ঞানিক জীবন সবে শুরু হয়েছিল, এই সমস্যাটির ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। দ্য ব্রগলির গবেষণাকাজ সম্বন্ধে আর একদল পদার্থবিদ তুমুলভাবে আলোচনা করছিলেন; শ্রোয়েডিংগার ছিলেন এই দলে।

এবং তারপর—কিন্তু আমরা ঘটনাগুলোর কালানুক্রমিক বর্ণনার মধ্যে যাব না। একটি ছায়াচিত্রের একেবারে শেষের ঘটনাটি গোড়াতে দেখিয়ে দিলে যা ঘটছে তা বুঝতে সাহায্য করে এবং নাটকীয় প্রভাবকেও বাড়িয়ে তোলে।

যে পরীক্ষাটিতে ইলেকট্রনের অবচ্যুতি প্রমাণিত হয়েছিল, তার কথাটা স্মরণ করুন। তাতে একটি ইলেকট্রনরশ্মি একটি কেলাসের ওপর (অথবা খুব পাতলা একটি ধাতুর পাতের ওপর) এসে আঘাত করছিল। কেলাসের পরমাণুদের ওপর থেকে রশ্মির ইলেকট্রনদের অবচ্যুতি ঘটছিল এবং একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর আঘাত হেনে ইলেকট্রনরা সেটিকে ঝাপসা করে দিয়ে অবচ্যুতির বলয়দের দাগ ফুটিয়ে তুলছিল।

এখানে এই কথাটা জুড়ে দিতে পারি যে, একটি জ্বলন্ত ধাতব ফিলামেন্ট যে ইলেকট্রন রশ্মিকে সৃষ্টি করছিল তার গঠনটা ছিল একটু বিশেষ ধরণের। ক্ষুদ্রবৃত্তাকার ছিদ্রযুক্ত একটি পর্দাকে উৎস এবং কেলাসের মধ্যে বসানো হল। এর ফলে, ইলেকট্রন রশ্মি পর্দার মধ্য দিয়ে যাবার পর এর মধ্যে নির্দিষ্ট মাপের প্রস্থচ্ছেদজনিত মাত্রা দেখা দিল।

একেবারে শুরুতে, যখন ধরুন, ইলেকট্রনের সংখ্যা ছিল দশের কয়েকগুণ মাত্র, তখনই যদি আমরা পরীক্ষাটি বন্ধ করে দিতাম, তাহলে কি ঘটত? ফটোগ্রাফিক প্লেটটি যখন পরিস্ফুটন করা হত, তখন তাকে দেখাত অনেকটা কোন অনভিজ্ঞ বন্দুকধারীর গুলির আঘাতে ছিদ্রযুক্ত একটি নিশানির মত। প্লেটটা জুড়ে এলোপাথাড়িভাবে যে কালো বিন্দুগুলো ছড়িয়ে থাকত, সেগুলো হত আলাদা আলাদাভাবে ইলেকট্রনগুলোর আঘাতের চিহ্ন।।

পরীক্ষাটি আরো কিছুটা চালানোর পর আমরা দেখতে পাব, ইলেকট্রনগুলো নিশানির যে জায়গাগুলোতে আঘাত হেনেছে, সেখানে ক্রমশই একটি শৃংখলা আত্মপ্রকাশ করছে। ইলেকট্রন কয়েক হাজার বার আঘাত করার পর, প্লেটটিতে অন্ধকার এবং আলোর সেই সব বলয় পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতই যাদের সনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

এ হল একটি চমৎকার তথ্য। সহজেই বোঝা যায়, অবচ্যুতির ঘটনায় অংশগ্রহণকারী ইলেকট্রনের সংখ্যা যতক্ষণ কম থাকবে, ততক্ষণ তরঙ্গের কোন ধর্মই প্রকাশ পাবে না। বেশী সংখ্যায় ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেই এই সব ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। সোজাভাবে বলতে গেলে, কণিকাদের তরঙ্গধর্ম শুধু তাদের বৃহৎ সমাবেশের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

উত্তরটা খুঁজে পাবার জন্যে আমরা পরীক্ষাটা আর একবার করে দেখব। ইলেকট্রনের অবচ্যুতি সম্পর্কে একই পরীক্ষা, তবে ভিন্নভাবে করা হয়েছে। আমরা ইলেকট্রনের একটি শক্তিশালী উৎসকে নিলাম এবং একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে অল্প সময়ের জন্যে তার সামনে উদ্‌ঘাটিত করলাম। অবচ্যুতির চিত্রটি তখন তাড়াতাড়ি গড়ে উঠবে। অথবা আমরা ইলেকট্রনের একটি দুর্বল উৎসকেও নিতে পারি এবং উদ্‌ঘাটনের সময়কে বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে যদি সমানসংখ্যক ইলেকট্রন প্লেটের ওপর আঘাত হেনে বসে, তাহলে একেবারে একই ধরণের অবচ্যুতির চিত্র তৈরী হবে।

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ক্ষেত্রে যখন কেলাসের ওপর ইলেকট্রনদের সবগুলির একই সঙ্গে অবচ্যুতি ঘটে, তখন সমাবেশজাতীয় একটা কিছু ঘটছে সে কথা কেউ বলতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যখন ইলেকট্রনেরা কেলাসটির ওপর এককভাবে আঘাত হানে, তখন একটি সমাবেশের ধারণাকে আদৌ প্রয়োগ করা যায় না। রেলকর্মীদের কি ধরণের দল আপনি পেতেন, যদি তাদের একজন একদিন ওয়েলডিংয়ের কাজ করত, আর একজন পরের দিন একটি বোল্‌ট নড়াত এবং তৃতীয় একব্যক্তি একমাস পরে সেটিকে চেপে বসিয়ে দিত?

ইলেকট্রনদের যখন অবচ্যুতি ঘটে, তা একসঙ্গে হাজার হাজার সংখ্যাতেই হোক বা একটি একটি করেই হোক, তার ফলে যে ছবিটি পাওয়া যায় তা উভয় ক্ষেত্রে একই ধরণের। সিদ্ধান্তটি তাহলে খুবই পরিষ্কার হয়ে

ওঠে ; প্রতিটি ইলেকট্রন ওর নিজস্ব বিচিত্র ধর্মগুলোকে অন্যদের থেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করছে, যেন অন্য ইলেকট্রনগুলোর আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই।

॥ গুলিছোঁড়ার চত্বরে একবার ঘুরে আসা ॥

যে নিশানিটি আমরা নষ্ট করে ফেলেছি, সেটি আবার নেওয়া যাক। নিশানিটিকে নষ্ট করেছিল অল্প কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন। প্রথম নজরে মনে হবে যে, ইলেকট্রনগুলো সম্পূর্ণ এলোপাথাড়িভাবে প্লেটটির ওপর এসে আছড়ে পড়েছিল।

একটি ব্যাপার কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসে। পর্দাটির যে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনেরা আবিভূর্ত হয়েছিল, তার একটি পরিমাপ নিয়ে, সেই পরিলেখকে নিশানির ওপর প্রক্ষেপ করা যাক। মনে হবে যে, সবগুলো ইলেকট্রনেরই এই পরিলেখর মধ্যে জায়গা করে নেওয়া উচিত, তা তারা ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর যত এলোপাথাড়িভাবেই এসে পড়ুক না কেন। আসলে, অনেকগুলো আঘাতচিহ্নই কিন্তু সীমারেখার অনেকটা বাইরে রয়েছে।

এখানে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত একটি ঘটনা ঘটছে। আমরা যদি নিশানিটিকে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, ইলেকট্রনেরা আদৌ এলোপাথাড়িভাবে প্লেটটির ওপর আঘাত হানছে না। নিশানির ওপর আঘাতের সংখ্যা যখন কম, এমনকি তখনো একটিও আঘাতের চিহ্ন নেই এমন ফাঁকা জায়গা রয়েছে এবং আবার এমন জায়গা রয়েছে যেখানে আঘাতের চিহ্নগুলো যেন দল বেঁধে খুব কাছাকাছি জড়ো হয়ে আছে। এই সব জায়গাগুলোর মধ্য দিয়ে যদি একটি রেখাকে টানা যায়, তাহলে ছোট ছোট বলয় দেখা যাবে।

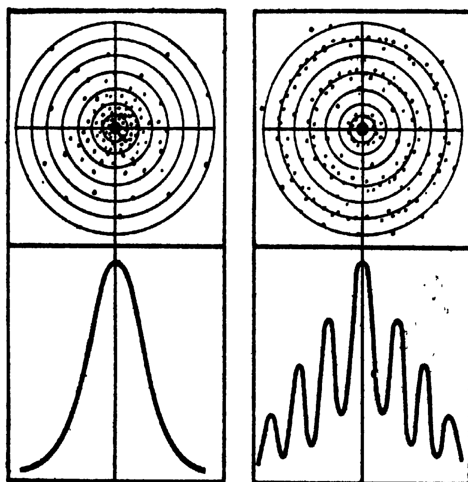
এটা অবশ্য ঠিক যে, ঐ বলয়গুলোর চেহারা খুবই স্পষ্ট নয়, কিন্তু প্লেটের ওপর আঘাতকারী ইলেকট্রনদের সংখ্যা যত বেড়ে চলে, তত ঐ বলয়গুলো পরিস্ফুট হতে থাকে।

একটি চাতুরীর আশ্রয় নেয়া যাক। রাইফেল ছোঁড়ার একটি সাধারণ

নিশানি নিন এবং ইলেকট্রনেরা ফটোগ্রাফিক প্লেটের যেখানে যেখানে আঘাত হেনেছে, সেখানে গর্ত করুন। এরপর একজন ওস্তাদ নিশানদারকে নিশানিটি দেখান এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হয়, লক্ষ্য করুন।

"গুলি ছোঁড়ার ভারী মজার কায়দা তো। 10 নম্বরে ঐ আঘাতগুলোর দিকে তাকান, কিন্তু 9 বা 8 নম্বরে একটিও আঘাত নেই। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ওটা করা হয়েছিল কি? সবগুলোই 10, 7, 4 এবং 1 নম্বরে?"

আমরা কিন্তু কিছুই বলছি না। কিছু সময় পরে প্রধান নিশানদার ব্যক্তিটি আবার বলে বসেন, "যত সব বাজে ব্যাপার! একজন যতই চেষ্টা করুক না কেন, কখনো একটি নিশানির ওপর ঐভাবে গুলি ছুঁড়তে পারত না। তার কারণটা হল এই। লোকটি যদি সবে শিক্ষার্থী হয়, তার আঘাতগুলো



এলোপাথাড়িভাবে পড়বে, সমস্ত নিশানিটার ওপর তা মোটামুটি সমভাবেই ছড়ানো থাকবে। একজন অভিজ্ঞ নিশানদারের নিশানির চেহারাটা হবে একেবারে অন্যরকম: অনেকগুলো আঘাতচিহ্ন নিশানির চোখটার চার-পাশে দল বেঁধে রয়েছে, মাত্র অল্প কয়েকটি রয়েছে বাইরের বলয়গুলোর

মধ্যে। নিশানিটির প্রতিটি বলয়ের মধ্যে সব আঘাতচিহ্নগুলোকে আমরা গুণে ফেলি এবং একটি রৈখিক চিত্র রচনা করে ফেলি।

"একটি অক্ষের ওপর সাজানো যাক বলয় সূচক সংখ্যা (অথবা নিশানির চোখ থেকে দূরত্ব, ব্যাপারটি একই হল) এবং অন্যটির ওপর দুটি বলয়ের মধ্যে আঘাতের সংখ্যা। আমরা নিশানির প্রান্ত ভাগের দিকে যত এগিয়ে যাব, তত নীচের দিকে প্রসারিত একটি সরল রৈখিক চিত্র পেতে থাকব।

"এবারে আপনার নিশানিটি নিন। এক্ষেত্রে রৈখিকচিত্রটি কেন্দ্র থেকে দু' পাশের দিকে, ওপরে নীচে আন্দোলিত হতে থাকবে। যেভাবে এ নীচের দিকে নামছে, তার সঙ্গে আমাদের আগের বক্ররেখাটির তফাৎ রয়েছে।

"আমাদের অভিজ্ঞ নিশানদারের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নিয়মগুলো বলবৎ থাকছে। যে বক্ররেখাটি আমরা পাচ্ছি, তা এলোপাথাড়ি ভুলত্রুটির রেখা, বা গসের রেখা নামে পরিচিত। আপনার ক্ষেত্রেও একটা এলোপাথাড়ি ব্যাপার রয়েছে। তবে তা একটি স্বতন্ত্র নিয়মকে মেনে চলে, গুলিছোঁড়ার চত্বরে যে নিয়মটি হল একেবারেই নবীন আগন্তুক।"

এবারে আমাদের নিশানির কথায় ফিরে আসা যাক।

॥ সম্ভাবনার তরঙ্গ ॥

এটা অবশ্য ঠিক যে, গুলি ছোঁড়ার সময় কখনোই তরঙ্গ জাতীয় একটি বক্ররেখার সাক্ষাৎ মেলে না। ইলেকট্রনেরা বন্দুকের গুলি নয়। একটি গুলির ভর এত বেশী যে, ওর পক্ষে তরঙ্গ ধর্মকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কেলাস থেকে প্রতিফলিত হবার পর ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ইলেকট্রনদের গতিপথের বিতরণসূচক এই রেখাকেই দ্য ব্রগলি তরঙ্গ বলা হোক—বর্ণ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন।

এক মিনিট অপেক্ষা করুন। 'কাগুজে' তরঙ্গ এবং আসল তরঙ্গের মধ্যে সম্পর্কটা কি? আসল তরঙ্গটি ইলেকট্রনের সঙ্গে এগিয়ে চলে, যেখানে আমাদেরটি কাগজের ওপরেই থেকে যায়।

সে যাই হোক, দুয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ইলেকট্রনদের আঘাতের যে রৈখিকচিত্র, তা কল্পনাবিলাস নয়।

একটি গতিশীল ইলেকট্রনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি আসল তরঙ্গের অস্তিত্বকে ঐ চিত্র প্রতিফলিত করছে। কিন্তু এই তরঙ্গটির যে তাৎপর্য, তা দ্য ব্রগ্‌লির প্রদত্ত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ক্ল্যাসিকাল নিউটোনীয় পদার্থবিদ্যার সুনিশ্চিত বক্তব্য হল এই যে, পর্দার ছিদ্র থেকে বেরোনোর পর, যতক্ষণ না ইলেকট্রনটি কেলাসটির ওপর আঘাত হানছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর একটি সরল রেখার পথেই এগিয়ে চলা উচিত। এরপর, একটি বিলিয়ার্ড বল টেবিলের পাশ থেকে যেমন ঠিকরে ফিরে আসে, ঠিক তেমনিই ইলেকট্রনটিও কেলাসটির একটি পরমাণু থেকে প্রতিফলিত হয়ে বসে। পরিশেষে, ইলেকট্রনটি কেলাসটি থেকে ফটোগ্রাফিক প্লেটের দিকে এগিয়ে যায় এবং ওর ওপরে একটি পথরেখা রচনা করে।

এখানে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার হাত কাঁপছে বা চোখ যার ক্লান্ত। পৃথিবী থেকে এখানে কোন হাওয়া বা তপ্ত বায়ুর স্রোত এসে পৌঁছচ্ছে না, যার ফলে নিশানার ব্যাপারটা গোলমেলে হতে পারে। এরা হল আদর্শ পরিস্থিতি, কাজেই লক্ষ্যভেদ অভ্রান্ত হওয়া উচিত—প্রতিবারই একেবারে নিশানির চোখের মধ্যে। সোজা কথায় বলতে গেলে, ইলেকট্রনদের ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর পর্দার মধ্যেকার ছিদ্রের একটি অবিকল পরিলেখ রচনা করে তোলা উচিত। যদি ছিদ্রটি একটি অতি ক্ষুদ্র গর্তের আকারে থাকে, তাহলে ফটোগ্রাফে একটি ছোট বিন্দুই ফুটে উঠবে, আর কিছুই নয়।

কিন্তু ইলেকট্রনেরা ক্ল্যাসিকাল নিয়মকে মেনে চলতে রাজী নয়। একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর পরিবর্তে, উজ্জ্বল ও অন্ধকার বলয়ের সমগ্র একটি দল আমরা লাভ করে বসলাম। বেঠিকভাবে গুলি ছোঁড়ার জন্যে যে এটা হচ্ছে তা নয়। যদি ধরেও নিই যে ব্যাপারটা তাই, তবু ইলেকট্রনেরা গসের নিয়ম অনুযায়ী বিস্তৃতি লাভ করবে। প্রকৃতপক্ষে, এদের বিক্ষেপণটা ঘটে, একটি 'তরঙ্গ' নিয়ম অনুযায়ী যা হল একেবারেই একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার।

ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ইলেকট্রনদের বিতরণ-সূচক বক্ররেখার চেহারাটা তরঙ্গের মত। আলো এবং রঞ্জন-রশ্মির অবচ্যুতিজনিত ছবির তীব্রতার মধ্যে একই ধরণের তরঙ্গ-আকৃতির প্রকাশ ঘটে। আলো ও রঞ্জন-রশ্মি তো নিশ্চিতভাবেই তরঙ্গ।

অতএব, দ্য ব্রগ্‌লি যা কল্পনাও করতে পারেন নি, তার চেয়েও অনেক

সূক্ষ্মভাবে ইলেকট্রনদের তরঙ্গ ধর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটছে। একটি ইলেকট্রন তরঙ্গ ইলেকট্রনরূপী যাত্রীসমেত কোন বিমান নয়। এই তরঙ্গ ফটোগ্রাফিক প্লেটের কোন বিন্দুর ওপর একটি ইলেকট্রনের আঘাতের সম্ভাবনাকে নির্ধারণ করছে। এর আর একটি ভাল নামকরণ তাই হতে পারে—'সম্ভাবনা তরঙ্গ'; ম্যাক্স বর্ণ ঐ নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

॥ পদার্থবিদ্যার জগতে সম্ভাবনার প্রবেশ ॥

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার কোথাও 'সম্ভাবনা' শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে না। প্রতিটি কণিকা অথবা বস্তুর গতি তার ওপরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বলের দ্বারা অত্যন্ত নিশ্চিত ও সঠিকভাবে পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে, এভাবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কোন বস্তুর অবস্থান এবং বেগ যে কোন মুহূর্তে, এক সেকেণ্ড পরে অথবা দশ লক্ষ বছর বাদে কি দাঁড়াবে, তা আমরা পরম নিশ্চয়তার সঙ্গে আগে বলে দিতে পারি, যদি সেই বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বল এবং যে নির্দেশ কাল থেকে আমরা গণনা শুরু করেছি, সেই নির্দেশকালে ঐ বস্তুটির অবস্থান আমাদের জানা থাকে।

এরপর গত শতাব্দীর মধ্যভাগে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্যাসীয় পদার্থদের আভ্যন্তরীণ গতির বিষয় গবেষণা শুরু হল। প্রায় সেই সময়েই এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, গ্যাসীয় অণুদের গতির ক্ষেত্রে নিউটনের সমীকরণকে সরাসরিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

নিজেই বিচার করে দেখুন। অত্যন্ত সামান্য আয়তনের গ্যাসের মধ্যেও বহু লক্ষ কোটি অণু রয়েছে। এদের গতির একটি সঠিক চিত্র যদি দিতে হয়, তাহলে প্রতিটি অণুর গতির সমীকরণগুলোকে লিখে ফেলা এবং সমাধান করার প্রয়োজন দেখা দেবে। অণুরা কখনো স্থির অবস্থায় নেই, ওরা সব সময়েই অন্য অণুদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে, কারো গা থেকে ঠিকরে ফিরে আসছে, কারো বা গায়ে আছড়ে পড়ছে, এবং এই ঘটনাগুলো প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ বার করে ঘটছে।

সব অণুদের জন্যে নিউটনের সমীকরণগুলোকে লিখে ফেলার কল্পনা করাটাই একটা নিতান্ত অবাস্তব ব্যাপার। শুধু সমীকরণগুলো লিখতেই

লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাবে। আরো বহু লক্ষ বছর যাবে সেগুলোর সমাধান করতে। ইতিমধ্যে, অবশ্য এই সব গতির জায়গা বহু আগেই দখল করে বসবে অন্য গতিরা।

এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার একটি যুক্তিপূর্ণ পথের সন্ধানে নেমে পদার্থবিদরা দেখতে পেলেন যে, প্রতিটি একক গ্যাসের অণু, যা এক অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অন্য অণুদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে, তার গতির ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করাটা উচিত নয়। বরং তাঁদের আগ্রহ থাকা উচিত গ্যাসের সমগ্র পরিমাণ সম্বন্ধেই : যেমন, তার তাপমাত্রা, ঘনত্ব, চাপ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।

আলাদা আলাদাভাবে অণুদের বেগ নির্ণয় করার কোন প্রয়োজন নেই। গ্যাসের অবস্থার সব বৈশিষ্টেরই সমগ্র অণুব্যবস্থাকে একটি সমাবেশ রূপে নির্দেশ করা উচিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রধানত গ্যাসীয় অণুদের গড় বেগের দ্বারাই নির্ণীত হয়। বেগ যত বাড়বে, তাপমাত্রাও তত বেড়ে চলবে।

কিন্তু এই সম্পর্কগুলো সঠিকভাবে জানবার জন্যে, অণুদের গড় বেগ নির্ণয় করার কোন উপায় খুঁজে বার করতে হবে। ঠিক এই রকম একটি পরিস্থিতিতেই সম্ভাবনা তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটল।

এর বক্তব্য ছিল : "একটি গ্যাসের অণুদের প্রতি মুহূর্তে একই পরিমাণ বেগ রয়েছে, এটা মনে করা বৃথা। বরং, তাদের আলাদা আলাদা বেগ রয়েছে এবং আরো ব্যাপারটা হল এই যে, এ সব বেগ সংঘাতের ফলে সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। সে যাই হোক, বেগের এই সব পরিবর্তনের এলোপাথাড়ি প্রকৃতি সত্বেও প্রদত্ত পরিস্থিতিতে প্রতিমুহূর্তেই একটি গড়, স্থায়ী, আণবিক বেগ বর্তমান রয়েছে। একটি অণুর ক্ষেত্রে যা এলোপাথাড়ি ব্যাপার, বহু অণুর ক্ষেত্রে তাই একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এটাই অত্যধিক সংখ্যার সম্ভাবনা সূত্র। আমাদের গ্যাসের আয়তনের মধ্যে অণুর সংখ্যা প্রকৃতই যথেষ্ট বেশী, বাস্তবিক এত বেশী যে স্বল্পমাত্র ইতস্তত বা সন্দেহ প্রকাশ না করেও সূত্রটিকে এখানে প্রয়োগ করা যেতে পারে।"

পদার্থবিদরা অণুদের বৃহৎ সমষ্টির প্রকৃতিকে সম্ভাবনা তত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী পরিসাংখ্যিকভাবে হিসেব করতে শুরু করলেন। কিন্তু একটি

ব্যাপারে তাঁরা সম্ভাবনা তত্ত্বের সঙ্গে একমত হতে চাইছিলেন না। তাঁরা বলে চললেন যে, আণবিক গতির মধ্যে কোন এলোপাথাড়িভাব নেই, প্রতিটি সংঘাত, প্রতিটি অণুর একক গতি নিউটোনীয় নিয়মগুলোর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং যদি কেউ লক্ষ লক্ষ সমীকরণের সমাধান করতে চান, তাহলে তিনি কোন গড় মানের সাহায্য ছাড়াই এই সব গতির চরিত্রকে চরম নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। আমরা অবশ্য তা করি না; কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে তা করা যেতে পারে। আমরা একটি গ্যাসের গতিকে সম্ভাবনা নিয়ম, পরিসংখ্যানের নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করি, কিন্তু তাদের সকলকেই ধারণ করে রয়েছে নিউটোনীয় বলবিদ্যার সঠিক নিয়মগুলো।

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা নিজের সম্বন্ধে একটু বেশী নিশ্চিত ধারণা পোষণ করত; একক অণুদের গতির বিচারে নিউটনের নিয়মগুলোকে সামান্যী-করণের কোন যুক্তিই ছিল না। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যার বিকাশ থেকে এর প্রমাণ মিলেছিল। অণুরা বিলিয়ার্ড বল নয়। ওরা গতিশীল হয়, সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং তা করার সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মকে মেনে চলে।

॥ সতর্ক ভবিষ্যদ্‌বাণী ॥

এরা ছিল সব নতুন নিয়ম, ইলেকট্রন, পরমাণু এবং অণুরা যে সব নিয়মকে মেনে চলছিল। প্রথমেই বিদ্রোহী হল ইলেকট্রনেরা। ওরা ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার নীতির কাঠামোর মধ্যে খাপ খেতে চাইছিল না। যেখানে কিনা ওদের ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর আঘাত হানবার কথা, সেখানে তা না করে......"নিজেদের অবাধ ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে যা খুশী তাই করে বেড়ালো"। ইলেকট্রনদের অবাধ্যতায় মনে দারুণ আঘাত পেয়ে কিছু বিজ্ঞানী এই বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

যে পদার্থবিদ্‌রা দর্শনশাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন, তাঁরা সহজেই বিপথগামী হলেন। যেহেতু ইলেকট্রনের 'নিজস্ব একটি ইচ্ছা' রয়েছে, কাজেই কোন নিয়মকেই সে মানছিল না, একেবারে একজন আসল নৈরাজ্যবাদী আর কি। ব্যাপারটা যদি তাই হয়, যদি কোন নিয়মই না থাকে, তাহলে বিজ্ঞানে আমাদের প্রয়োজন কি। বিজ্ঞান তো নিয়মকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁরা

৬

যুক্তি দিয়ে বললেন, ঈশ্বর ইলেকট্রনকে (অতএব পৃথিবীর সব বস্তুকেই) মুক্তি দিয়েছিলেন যাতে ও নিজের ইচ্ছামত আচরণ করতে পারে, সব নিয়মের বাঁধন থেকে তিনি ওকে মুক্ত করেছিলেন, শুধু একটি ছাড়া—সেটি হল ওর নিজ অস্তিত্বের স্বর্গীয় নিয়মটি। কিন্তু বিজ্ঞান এই নিয়মটির তত্ত্ব-তালাস করে না, নিছক বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বিজ্ঞান এটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। বুঝতে পারছেন, খুবই সোজা ব্যাপার—ইলেকট্রনের 'অবাধ ইচ্ছা' থেকে একেবারে পুরোপুরি ভাববাদে এসে পৌঁছনো।

বস্তুবাদীরা পাল্টা জবাবে বললেন, ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো যেখানে খাটে না, নতুন নিয়মগুলো সেখানে টিকছে।

এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটা লেনিন করেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তারও কুড়ি বছর আগে তিনি বলেছিলেন যে, ইলেকট্রনের যত অস্বাভাবিক গুণাবলীরই আবিষ্কার ঘটুক না কেন, তাদের অর্থ দাঁড়াবে একটাই—চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে আরো গভীর এবং সঠিক একটি ধারণা আমরা লাভ করছি।

ইলেকট্রনেরা ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো মানতে অস্বীকার করল, কিন্তু ওরা নতুন কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার নিয়মগুলো মেনে নিল।

কি ধরণের নিয়ম ছিল সেগুলো? প্রথমতঃ, সেগুলি ছিল সম্ভাবনা নিয়ম। ইলেকট্রনের অবচ্যুতির পরীক্ষাটিতে ফটোগ্রাফিক প্লেটের (নেগেটিভ) ওপর আলোর বলয়গুলোর তাৎপর্যই বা ছিল কি? সোজা কথায়, ইলেকট্রনেরা প্লেটটির ওপর এই জায়গাগুলোতে আঘাতই করে নি। নিশ্চতভাবেই, ইলেকট্রনেরা তাদের অবাধ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে নি, বরং তাদের আচরণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এছাড়া আমরা পাচ্ছি অন্ধকার বলয়গুলো, যেখানে ইলেকট্রনদের অধিকাংশ আঘাত এসে পড়েছিল। কিন্তু সবগুলো ইলেকট্রনই এখানে আঘাত হানে নি। সবচেয়ে অন্ধকারময় এবং আলোকিত অংশগুলোর মাঝে মাঝে কিছু ধূসরবর্ণের জায়গা রয়েছে। ইলেকট্রনদের একটি 'গড়' সংখ্যা এই অংশগুলোর ওপর আঘাত হেনেছে। আমাদের গুলিছোঁড়ার খেলায় আঘাতচিহ্নগুলোর বিতরণসূচক বক্ররেখার ওপর আমরা তা খুব পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছি।

এবারে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনায় আসব।

একটি ইলেকট্রন তার উৎস থেকে বেরিয়ে, পর্দার মধ্য দিয়ে পথ তৈরী করে, কেলাস থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রনটি প্লেটের কোন্ জায়গায় গিয়ে আঘাত করবে?

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা পরম নিভুর্লভাবে কোণ, দূরত্ব এবং বেগের হিসেবপত্র করে বলল "এখানে"। ইলেকট্রনটি যেখানে আঘাত করছে, এটা আদৌ সে জায়গাই নয়।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার বক্তব্য হল: "আমি সঠিকভাবে জানি না, তবে সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা হল এই যে, ইলেকট্রনটি অন্ধকার বলয়গুলোকেই আঘাত করবে, ধূসর অংশগুলোয় এর আঘাত করার সম্ভাবনাটা কম এবং আলোর বলয়গুলোর ওপর যে এ আঘাত হেনে বসবে, তার আদৌ কোন সম্ভাবনাই নেই।"

একটু বেশী সাবধানী আর কি। যে বিজ্ঞান নিজের জন্যে 'সঠিক' পদবী দাবী করে বসে, তার কাছ থেকে এ কথাগুলো একটু 'অদ্ভুত' শোনায় না কি। এমনকি এ বিজ্ঞানের কথা বলেই মনে হয় না। ক্ল্যাসিকাল পদার্থ-বিদ্যার 'পরম সঠিক' ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কত ভালই না শোনায়! তবুও, কেউ যদি এটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন, তাহলে মনে হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী-গুলোর মধ্যে কি ঔদ্ধত্য, কি আত্মম্ভরিতা আর কি অজ্ঞতাই না প্রকাশ পাচ্ছে!

বাস্তবিকই, যে বিজ্ঞান সবেমাত্র এক অসাধারণ জটিল জগতে অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং সেই জগতে যে সব ঘটনা ঘটছে তাদের সম্বন্ধে যার আদৌ কিছু জানাই নেই, তার কাছ থেকে যদি একইসঙ্গে এই ধরণের সব দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি আসতে শুরু করে, তাহলে আমরা আর কিই বা বলতে পারি।

কিন্তু এরকমও তো হতে পারে যে, আমরা হয়ত ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে একটু বেশী কড়াকড়ির মনোভাব গ্রহণ করছি। প্রতিদিনকার বস্তু-জগতে নিয়মগুলো বেশ ভালভাবেই কাজ করছে। তারপরে আবার, একেবারে এই সেদিন পর্যন্ত, কোয়াণ্টাম কণিকাদের তরঙ্গধর্ম, এবং আরো সব বহু বিচিত্র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এর একেবারে এতটুকু ধারণাও ছিল না।

এ কথা ঠিক যে, প্রতিটি বিজ্ঞানই তার গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে একটি

সঠিক এবং সর্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করতে চায়। এটাই আসলে হল মৌল উদ্দেশ্য এবং মূলনীতি। কিন্তু এমন দিন কখনই আসবে না যখন কিনা সব কিছুই শেখা হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞানের পক্ষে করার মত আর কিছুই নেই।

বিজ্ঞানে এই সব সতর্ক ভবিষ্যদ্বাণী, এই সব 'সম্ভব' এবং সম্ভাব্যের' এই হল অর্থ। সম্ভাবনা সম্বন্ধে কথা বলার অর্থ হল এই যে, একটি পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুরোপুরি সম্পূর্ণ এবং সঠিক নয়।

খুব সহজেই কল্পনা করা যায়, আবহাওয়াবিদ কি বোকাই না বনে বসবেন যদি তিনি বলেন: "আগামীকাল তপ্ত আবহাওয়া প্রত্যাশা করছি, বৃষ্টিপাত ঘটবে না, সকাল ন' টার সময় তাপমাত্র হবে 23.6° সেন্টিগ্রেড, দুপুর বারটার সময় 29.6° সেন্টিগ্রেড; বিকেল চারটের সময় 27.4° সেন্টিগ্রেড। বেলা একটার সময়, এত মিনিট সময়ের মধ্যে, এত বর্গ মিটার আয়তনের অঞ্চলের ওপর মেঘেরা এসে হাজির হবে। বিকেল পাঁচটার সময় মেঘের দল উত্তর-পূর্ব দিকে প্রতি ঘণ্টায় 12.3 কিলোমিটার বেগে উড়ে চলবে"।

আবহাওয়া তৈরীর পেছনে বেশ কয়েক ডজন ঘটনা অংশ গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে আবহবিজ্ঞানের যা পরিস্থিতি, তাতে যে সব ঘটনা একটি সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষকে সম্ভব করে তোলে, সেগুলিকে এই বিজ্ঞান নিখুঁতভাবে হিসাব ও বর্ণনা করে উঠতে পারে না। এমনকি তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে না।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ব্যাপারটি হল আরো শক্ত; এক অপরিমেয়ভাবে জটিল আণুবীক্ষণিক জগতকে নিয়ে হল তার কাজ।

॥ কণিকাদের তরঙ্গ এবং তরঙ্গদের কণিকা ॥

ভ্র ব্রগলি তরঙ্গদের কথায় ফিরে আসা যাক। এরা ইলেকট্রনদের গতি নির্ধারণ করে থাকে। তবে এরা তা নির্ধারণ করে যে উপায়ের মাধ্যমে, তা হল সম্ভাবনামূলক, সম্পূর্ণ সঠিক উপায় তাকে বলা যায় না। ইলেকট্রনদের অবচ্যুতির পরীক্ষাগুলোয়, এই সব তরঙ্গ ফটোগ্রাফিক প্লেটের সেই স্থানগুলোকে নির্দেশ করে, যেখানে ইলেকট্রনরা সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনার সঙ্গে আঘাত করবে।

কিন্তু, ম্যাক্স বর্ন কি ভুল করেন নি, যখন তিনি সম্ভাবনার তরঙ্গকে দ্য ব্রগলি তরঙ্গ বলে ধরে নিয়েছিলেন? হয়ত দ্য ব্রগলি তরঙ্গেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কিছু একটা ব্যাপার, তাই যদি হয়, খুব সহজেই তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

দ্য ব্রগলি সম্পর্কের ব্যাপারটা আমাদের আবার স্মরণ করতে হবে। এই সম্পর্ক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি ইলেকট্রনের বেগ যত বাড়বে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ তত কমবে। পদার্থবিদ্‌রা ইতিপূর্বেই জানতেন যে, রনৃজন-রশ্মির তীব্রতা যত বেশী হবে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ তত ছোট হবে এবং তার অবচ্যুতির ছবিও তত সংনমিত হবে। বিভিন্ন বেগের ইলেকট্রনদের অবচ্যুতির বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছিল। এখানেও, ইলেকট্রনের বেগ বাড়ার ফলে ওর অবচ্যুতির বলয়গুলোর সংনমিত হওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হয়েছিল।

এখন পদার্থবিদ্‌রা তরঙ্গদৈর্ঘ থেকে ছবির বলয়গুলোর মধ্যেকার দূরত্বের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম হলেন এবং ঠিক উল্টো-ভাবেও সেটা তাঁরা করলেন। হিসেবের মাধ্যমে দেখা গেল যে, বলয়গুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে ইলেকট্রন তরঙ্গদের দৈর্ঘ যদি কেউ পরিগণনা করেন, তাহলে গণনার ফলস্বরূপ যে সব মান পাওয়া যাবে, তারা দ্য ব্রগলি সম্পর্ক থেকে পাওয়া মানের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে।

আর কোন সন্দেহই রইল না। 'সম্ভাবনা তরঙ্গেরা' ছিল একই জড় তরঙ্গ, দ্য ব্রগলি যাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। কেলাসের দ্বারা ইলেকট্রনদের অবচ্যুতি ঘটলেই যে ওরা শুধু দেখা দেয় তা নয়, ওরা হচ্ছে সর্বব্যাপী। ইলেকট্রন এবং অন্যান্য বস্তুকণার গতির সঙ্গে ওরা সব সময়েই সংযুক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু ওদের 'সনাক্ত' করা সব সময়ে সম্ভব নয়। দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের তরঙ্গদৈর্ঘ বস্তুকণাদের ভর এবং গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে কমতে থাকে এবং ওদের পরিমাপ করাটা আমাদের যন্ত্রের সূক্ষ্মতার আয়ত্তের বাইরে। এরপর কণিকাদের শুধু কণিকা ধর্মই অবশিষ্ট থাকে।

তরঙ্গদের ধর্মসম্বন্ধীয় আমাদের আলোচনাকে আবার স্মরণ করুন। একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত, তরঙ্গেরা (উদাহরণস্বরূপ বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গেরা)

কোন কণিকাধর্মকে প্রদর্শন করে না এবং তরঙ্গের মতই ব্যবহার করে থাকে : যেমন, তাদের ব্যতিচার, অবচ্যুতি এবং আরো অনেক কিছু ঘটে। কিন্তু তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ যেই যথেষ্ট ছোট হয়ে আসে, তাদের আচরণ কণিকাদের মত হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন তারা ধাতুখণ্ড থেকে ইলেকট্রনকে ছিটকে বার করে দেবার সামর্থ অর্জন করে বসে।

সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হল গামা রশ্মি, পরিচিত অন্য বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গদের মধ্যে যারা হল সবচেয়ে ছোট। কি স্বচ্ছন্দভাবেই না ওরা বস্তুকণাদের স্থানচ্যুত করে বসে, আর প্রদর্শন করে ওদের কণিকাধর্মকে।

দ্য ব্রগংলির আবিষ্কার প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর জগতকে এক সুষম সুসমঞ্জস সমগ্রতার মধ্যে একত্রিত করল এবং দুটি বিপরীত, আপাতদৃষ্টিতে পারস্পরিক বিরুদ্ধ সত্ত্বা—কণিকা এবং তরঙ্গ এদের মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুতে এক সেতুকেও গড়ে তুলল। সে যাই হোক, যদিও একতার আবিষ্কার ঘটল, তাহলেও এরকম ভাববার কোন কারণ নেই যে বিরুদ্ধবাদীরা অন্তর্ধান করেছে।

ওরা সব বস্তুর গভীরেই সুপ্ত হয়ে আছে এবং অণুজগতের অত্যাদ্ভূত কাণ্ডকারখানাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যে জগৎ সম্বন্ধে আমরা এখন থেকে অনেক বেশী আলোচনা করব। আণুবীক্ষণিক জগতে যে সব চমৎকার ঘটনা সম্ভব হচ্ছে এবং সম্ভাবনার তরঙ্গদের দ্বারা খুব সুন্দরভাবে বর্ণিতও হচ্ছে, তাদের খবর এবারে আমরা নেব।

॥ তরঙ্গ-নিয়ম তৈরীর পথ ॥

এই তরঙ্গেরা অণুজগতের ইলেকট্রন এবং অন্যান্য কণিকাদের গতির বর্ণনা দিয়ে থাকে। এখানে 'বর্ণনা' কথাটির অর্থটা কি? একটি বস্তু অথবা ঘটনাকে, গুণগত এবং পরিমাণগত, এই দুভাবেই বর্ণনা করা যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণত প্রথম উপায়টিরই আশ্রয় নিয়ে থাকি। আমরা যখন শুনি যে "আজ বৃষ্টি হবে", আমরা ছাতাটি তুলে নিই এবং সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাই করি না, কতটা উচ্চতায় মেঘেদের আস্তানা তৈরী হবে।

কিন্তু বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার মত একটি সঠিক বিজ্ঞান, এ ধরণের একটি গুণগত বর্ণনায় আদৌ তৃপ্ত হতে পারে না। সংখ্যাদের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং একেবারে সঠিক সংখ্যা।

ইলেকট্রনেরা ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর যে অবচ্যুতির ছবিকে তৈরী করে, তাকে এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ গুণগতভাবে, একান্তভাবে সাজানো কতকগুলো অন্ধকার এবং উজ্জ্বল বলয়রূপে বর্ণনা করেছি। আমরা প্লেটের ওপর বিভিন্ন অংশে অন্ধকারের মাত্রাকে পরিমাপ করে এবং তারপর একটি বক্ররেখা অংকন করে ঐ অবচ্যুতির ছবিকে পরিমাণগতভাবেও বর্ণনা করতে পারি, গুলিছোঁড়ার চত্বরে আমরা যেমন করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে।

এখন মনে হতে পারে যে, আমরা এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব রচনা করে নিয়ে গা হাত পা ছেড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আরো অন্যান্য কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা দাবী করে বসছে। বিজ্ঞানের পক্ষে প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে তত্ত্ব রচনা তো সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ, ঐখানেই আধুনিক বিজ্ঞানের আসল শক্তি নিহিত রয়েছে : এ এমন সব তত্ত্ব রচনা করে, যারা শত শত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ব্যাপারকে জড়িয়ে রয়েছে। সবচেয়ে ভাল এবং শক্তিশালী তত্ত্ব হল তারাই, যারা সবচেয়ে প্রশস্ত এবং ব্যাপক প্রকৃতির।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে, নতুন এবং বৃহৎ সব তত্ত্বের নির্মানকাজ প্রায়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। একে বলা হয় গতির নিয়ম। একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত হল নিউটনের দ্বিতীয় নিয়ম, যা একটি বস্তুর এবং বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল বলের পরিমাণ ও দিকের মধ্যে সংযোগ সাধন করছে। কিন্তু আমরা আদতে বল এবং ত্বরণ কিছুই দেখতে পাই না, আমরা শুধু দেখি, বলের প্রভাবে দেশ এবং কালে বস্তুদের স্থানান্তর। নিউটনের নিয়মের কাছ থেকে এই গতিকেই খোঁজার অনুমতি আমরা পাচ্ছি। ত্বরণ হল গতির বেগের কালিক পরিবর্তন। আর বেগ হল একটি বস্তুর অবস্থানের কালিক পরিবর্তন। কাজেই পরিশেষে দেখা যাচ্ছে, নিউটনের নিয়ম একটি বলকে একটি বস্তুর স্থানান্তরের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত করে তুলছে। কাজেই নিউটনের সমীকরণকে সমাধানের সময় আমরা বস্তুর গতির প্রকৃতিকে খুঁজে বার করি। একে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি বস্তুর দ্বারা

রূপত কোন নির্দিষ্ট রেখারূপে প্রকাশ করা হয়। এই রেখাকে বলা হয় পরিক্রমা পথ।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আর একটি অত্যন্ত সাধারণ এবং প্রশস্ত নিয়ম রয়েছে, যা বস্তুদের গতিকে নয়, তরঙ্গের প্রবাহকে বর্ণনা করছে। আংকিকভাবে, এটি লিখিত হয় তথাকথিত তরঙ্গ সমীকরণ, বা ছ্য অ্যালেমবার্টের সমীকরণের আকারে। এটিকে আবিষ্কার করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐ বিখ্যাত ফরাসী অংকশাস্ত্রবিদ্ এবং তাঁর নামেই এটি পরিচিত।

নিউটন অথবা ছ্য আলেমবার্ট কারুর সমীকরণই কোন সাধারণ নিয়ম থেকে উদ্ভূত নয়। ওরা কিন্তু আবার আকাশ থেকেও পরে নি, নিউটন এবং ছ্য অ্যালেমবার্টের পূর্বসুরীদের বহু পরীক্ষানিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের তাত্ত্বিক সামান্যীকরণের মধ্য দিয়েই বলা যায়, ওরা যেন চোলাই হয়েছিল।

যিনি শুধু তাঁর মাথা থেকে নতুন নতুন ধারণা খুঁজে বার করেন তাকেই আমরা প্রতিভাধর বলব না, বরং প্রতিভাধর বলব তাকেই যিনি ঘটনার জটিল জালের মধ্যে কোন গুপ্ত বল বা নিয়মকে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি সেই নিয়মকে বাধা থেকে, আপতিক এবং তুচ্ছ ঘটনা থেকে সজোরে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারেন এবং তার সব মালিন্য ঘুচিয়ে একটি নিবিড় সূত্রায়ণ বা (সঠিক বিজ্ঞানগুলোতে যেমন হয়) একটি সংকেতসূত্র গড়ে তোলেন। নতুন নিয়মটি এখন সুডৌল রেখা এবং উজ্জ্বল মুখাবয়ব নিয়ে জ্ঞানের এক রত্ন হয়ে উঠবে।

কোন্ নিয়ম কোয়ান্টাম বলবিদ্যারূপী অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তরের কাজ করবে? স্বভাবতই, ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যায় নিউটন এবং ছ্য অ্যালেমবার্টের নিয়মের স্থান গ্রহণের জন্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নতুন নিয়মকেও অন্ততঃ ঐ দুটি নিয়মের মতই সাধারণ এবং প্রশস্ত হতে হবে। এছাড়াও, এই নতুন নিয়মকে, পূর্ববর্তী দুটি নিয়মকে স্থানচ্যুত করে আণুবীক্ষণিকদের দ্বি-মুখী জগৎকে, সম্পূর্ণ নিজের সামর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই একটি নিয়মকে কণিকাদের গতি এবং তরঙ্গদের প্রবাহ এই দুটি ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল।

আপনি যাই বলুন না কেন, নিউটনের কাজটা কিন্তু সহজ ছিল। তাঁর হাতে পরীক্ষমূলক তথ্য ছিল প্রচুর পরিমাণে, অথচ এখানে ছিল এমন

একটি পরিস্থিতি, যাকে নিয়ে একটি পরীক্ষাও তখনো পর্যন্ত হয় নি। বছরটা ছিল ১৯২৫ সাল এবং ইলেকট্রনদের অবচ্যুতির চূড়ান্ত পরীক্ষাটি ঘটতে তখনো তিন বছর বাকি। দ্য ব্রগ্‌লি সম্পর্কের সূত্রটি হাতে ছিল ঠিকই, কিন্তু এর কাছ থেকে শুধু কণিকাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল, কণিকাদের গতি সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যাই তা দিতে পারে নি।

সে যাই হোক, তারা ঠিক পথ ধরেই চলছেন বলে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্‌দের এমন নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, দ্য ব্রগলির প্রকল্পের কোন পরীক্ষামূলক প্রতিপাদনের জন্যে অপেক্ষা না করেই তাঁরা নতুন তত্ত্বটির নির্মানের কাজ শুরু করে দিলেন।

হয়ত নিউটনের সমীকরণকে বদলে নিয়ে কাজ শুরু করা যেতে পারে, যাতে কণিকাদের তরঙ্গধর্মও ওর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে? না, ইতিহাসের গতি ভিন্নমুখী হল। পদার্থবিদ্‌রা, দ্য ব্রগলিকে অনুসরণ করে তরঙ্গ সমীকরণকে পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন, যাতে ওর মধ্যে তরঙ্গের কণিকাধর্ম প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। কাজটা তুলনায় সহজ বলে প্রমাণিত হল।

শ্রোয়েডিংগার এবং হাইসেনবার্গ সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করলেন। এঁদের কাজের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। আরো ব্যাপারটা হল এই, একজন যে কি করছেন তা সম্ভবতঃ অপর জন জানতেই পারেন নি। অল্প কিছুকাল পরে, তাঁদের গবেষণাপত্রগুলো যখন প্রকাশিত হল, তখন শ্রোয়েডিংগার প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, সমস্যাটির দুটি সমাধানই প্রাকৃতিক বিচারে ছিল একই ধরণের, যদিও, বাহ্যতঃ এদের মধ্যে সাধারণ মিল কিছুই ছিল না।

হাইসেনবার্গ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ম্যাট্রিক্স প্রকারটি উদ্ভাবন করেছিলেন, যা যথেষ্টই জটিল এবং এই পুস্তকের আলোচনার পরিধির অনেক বাইরে। অন্যদিকে, শ্রোয়েডিংগার তরঙ্গ সমীকরণটিকে এমনভাবে বদলেছিলেন যাতে দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের কণিকারূপী 'আস্বাদ'টি, ঐ আলোচনার অংশীভূত হয়ে ওঠে। নতুন সমীকরণটির নাম রাখা হল শ্রোয়েডিংগার সমীকরণ এবং এটি হল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সবচেয়ে লোকপ্রিয় সমীকরণ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, 'তরঙ্গ' নিয়মটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌল নিয়ম হয়ে দাঁড়াল।

॥ পরিমাপের যন্ত্রপাতি কাজে নামল ॥

এখন আবার দ্য ব্রগলি তরঙ্গদের কথায় ফিরে আসা যাক। বর্ণের ব্যাখ্যা এবং শ্রোয়েডিংগার সমীকরণের সর্বশেষ আকৃতি অনুসারে, এই তরঙ্গেরা ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ইলেকট্রন সংঘাতের তরঙ্গ-জাতীয় বিস্তৃতির মধ্যে নিজেদের প্রকাশ করে। কিন্তু, আমরা তো দেখেছি, একটি স্পষ্ট ছবি তৈরীর জন্যে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

কিন্তু একটিমাত্র ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে দ্য ব্রগলি তরঙ্গের সার্থকতাটা কোথায়? আমাদের তাও জানা আছে: ঐ তরঙ্গ ইলেকট্রনটিকে তার ক্ল্যাসিকাল পরিক্রমা পথ থেকে বিচ্যুত করে বসে। এই বিচ্যুতিটুকু ছাড়া অবচ্যুতির কোন ছবি আদৌ পাওয়াই যেত না।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল বলেই মনে হচ্ছে। তবুও এর মধ্যে কিছু একটা রয়েছে, যা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। আণুবীক্ষণিকদের বিচিত্র জগৎ সম্বন্ধে এত আলোচনার পর, আমরা কি চাইব না যে, কণিকাদের তরঙ্গধর্ম কোন না কোনরকমভাবে একটা অস্বাভাবিক প্রকৃতির হোক।

বেশ, দেখা যাক, অণুজগতের বক্তব্যটা কি ধরণের। মনে করা যাক, আমরা কোন মাপ নিতে চাইছি। বিশেষ ধরণের পরিমাপক যন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ নেই। এর করণীয় কাজগুলো শুধু হবে ইলেকট্রনদের ওপর নজর রাখা এবং প্রতিটি মুহূর্তে ওদের বেগ এবং অবস্থানের মাপ নেওয়া।

ইলেকট্রন হল একটি অত্যন্ত ছোট্ট কণিকা। এর জন্য এক প্রচণ্ড শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। কল্পনা করুন, প্রয়োজনীয় শক্তির একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র আমরা সৃষ্টি করেছি। এক নম্বর প্রশ্ন হল: আমরা মাপটা নেব কিভাবে? একটি বস্তুকে দেখবার জন্যে, আমাদের কোন রকমভাবে ওকে দীপ্ত করে তুলতে হবে। বক্তব্যটা হল সেটা কিভাবে করা যাবে? বস্তুটির মাত্রার ওপর দীপনের ব্যাপারটা নির্ভর করছে। একটি পরিষ্কার প্রতিবিম্ব লাভের প্রথম সর্তটা হল এই যে, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ বস্তুটির মাত্রার তুলনায় কম হবে। সাধারণ আলোর অণুবীক্ষণ যন্ত্র 0.4 থেকে 0.8 মাইক্রন পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ নিয়ে কাজ করে এবং সেজন্যেই অন্তত প্রায় দুই

থেকে তিন মাইক্রন পর্যন্ত মাত্রাবিশিষ্ট বস্তুদের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরী করে থাকে।

কিন্তু আমরা যদি অর্ধ-মাইক্রন আয়তনের কোন কিছু নিই, তাহলে ওর প্রতিবিম্ব হবে অস্পষ্ট। যখন বস্তুদের মাত্রা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান মাপের হয়ে দাঁড়াবে, তখন আমরা আলোর জোরালো অবচ্যুতি ঘটতে দেখব। একটি পরিষ্কার প্রতিবিম্বের বদলে আমরা তখন পাব একটি ছবি, একান্তভাবে সাজানো অন্ধকার এবং উজ্জ্বল বন্ধনী দিয়ে যা গড়ে উঠেছে, আবার যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে বস্তুটির দেহরেখা।

এবারে আরো ছোট একটি বস্তু নিন। আলো এর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, যেন বস্তুটির আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই।

ইলেকট্রন একটি ধূলিকণা নয়, আবার একটি জীবাণুও নয়; এর আয়তন (পরে আমরা দেখব যে, ঐ ক্ষেত্রে আয়তন শব্দটি ব্যবহারের কোন উপযোগিতাই নেই) আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের তুলনায় স্থূলভাবে একশ' কোটি গুণ ছোট। কাজেই আমরা একে দীপ্ত করব কিভাবে? সৌভাগ্যবশতঃ, অত্যন্ত ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গামা রশ্মিরা রয়েছে।

আমরা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ইলেকট্রনকে নিয়ে একটি গামা রশ্মির সাহায্যে তাকে আলোকিত করে তুলতে পারি, কিন্তু কিছুই আমাদের চোখে পড়বে না। একেবারে কিছুই না—একটি ইলেকট্রন ছিল, এখন আর একটিও নেই। এমনকি অবচ্যুতির বলয়গুলো পর্যন্ত নেই।

একটি ইলেকট্রনের প্রতিবিম্ব তৈরী করার জনে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, কখনই তা করে উঠতে পারব না।

ব্যাপারটা হল এই যে, একটি ইলেকট্রন একটি ধূলিকণা নয় এবং গামা-রশ্মির কোয়ান্টাম আলোর ফোটন নয়। ছোট ধূলিকণাটিরও ওজন রয়েছে এবং একটি ফোটন কিছু পরিমাণ শক্তি বদল করে, তাই তার ভরবেগ রয়েছে।

ফোটনের ভরবেগ মিলছে কোথা থেকে? আমরা জানি যে একটি ফোটন একটি কণিকার মত ব্যবহার করতে পারে। এটা আইনস্টাইন ইতিপূর্বেই তাঁর আলোকবৈদ্যুতিক প্রভাবের তত্ত্বে প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেই বিচার করে দেখুন: শূন্য ক্ষেত্রে একটি ফোটনের সব সময় একই

বেগ থাকবে এবং ;তা আলোর বেগের সমান, তবে এর তরঙ্গদৈর্ঘ অন্য রকম হতে পারে। আমরা ফোটনের ক্ষেত্রে দ্য ব্রগলি সম্পর্ককে প্রয়োগ করে থাকি :

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

যেখানে বেগ v আলোর বেগ c'র সমান ধরা হয়। তাহলে আমরা ফোটনের ভর বার করে ফেলতে পারি (এ হল স্বভাবতই একটি গতিশীল ফোটনের ভর ; একটি ফোটনের স্থিতিকালীন ভর অতি অবশ্যই শূণ্যের সমান হয়ে থাকে) :

$$m = \frac{h}{\lambda c}$$

এখন একটি ফোটনের ভরবেগ হল, এর ভর এবং বেগের গুণফল :

$$p = mc = \frac{h}{\lambda}$$

এবারে আর সামান্য একটু অংকের দরকার হবে। এই সূত্র থেকে এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ যত কমতে থাকে, ওর ভর-বেগও তত দ্রুতহারে বেড়ে চলে।

যখন একটি আলোর ফোটন একটি ধূলিকণাকে আঘাত করে, তখন এ নিজের ভরবেগ ধূলিকণাকে দান করে এবং ঠিকরে গিয়ে প্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আলোকব্যবস্থায় এবং সেখান থেকে আপনার চোখে এসে ধরা দেয়। আমাদের ধূলিকণা কিন্তু এতটুকুও নড়ে না। এ যদি স্থির অবস্থায় থেকে থাকে, সে অবস্থাতেই ও থাকবে ; যদি ও গতিশীল হয়, তাহলে যে দিকে ওর গতি রয়েছে, তার আদৌ কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ইলেকট্রন একেবারে আলাদা একটি ব্যাপার। একটি ধূলিকণার ভরের সঙ্গে এর ভরের একেবারে কোন তুলনাই হয় না ; এমন কি একটি অত্যন্ত দ্রুতগতি ইলেকট্রনের পক্ষেও এর ভরবেগ কম। একটি গামারশ্মির ফোটনকে একটি আলোর ফোটনের তুলনায় একশ' কোটিগুণ বেশী ভরবেগ দিয়ে ইলেকট্রনটির দিকে ছুঁড়ে মারা যাক। একটি গামারশ্মির ফোটন যখন একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন প্রতিবিম্ব অথবা অবচ্যুতির রূপের ব্যাপার আপনাকে ভুলে যেতে হবে। আপনি বলতে পারেন,

ইলেকট্রনটিকে যেন ধাক্কার চোটে একেবারে রঙ্গমঞ্চের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমরা বেশীদূর এগোতে পারছি না এবং ব্যাপারটা যেন আরো খারাপ হবার জন্যেই এবারে আমাদের বোঝাপড়াটা করতে হবে বেগের সঙ্গে। একটি ধাবমান ইলেকট্রনকে নিন; এর গতিটা রয়েছে কোনো একটি দিকে কিন্তু আমরা বলতে পারছি না ওর বেগটা কত। আমরা তখন একটি গামা ফোটনের দ্বারা ওকে দীপ্ত করে তুললাম এবং ফলে ইলেকট্রনটির দ্রুতির পরিবর্তন ঘটল। অথবা ধরুন ইলেকট্রনটির বেগ হচ্ছে শূণ্য এবং এ কোন জায়গায় স্থির হয়ে আছে। আমরা কিন্তু ওর অবস্থানকে নির্দেশ করে উঠতে পারছি না, কেননা আমরা ইলেকট্রনটিকে আলোকিত করবার সঙ্গে সঙ্গেই ওটি ধাক্কা খেয়ে কোনো এক দিকে ছিটকে পড়ে।

পুরনো অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ছিল কত ভাল। হয়ত একটি ধূলিকণা বা একটি জীবাণু আপনি নিয়েছেন, আপনি সব সময়েই জানেন ওটি কোথায় রয়েছে এবং কত জোরে ছুটছে। কিন্তু একটি ইলেকট্রনের অবস্থানকে নির্দেশ করবার চেষ্টা করুন। এর বেগ আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা যদি তা নির্ণয় করার চেষ্টা করি, তাহলে কণিকাটিকে পুরোপুরি হারিয়েই বসব। অণুজগতের ছলচাতুরী হল এই ধরণের।

॥ অনিশ্চয়তা সম্পর্ক ॥

আমরা এইমাত্র যা ব্যাখ্যা করলাম, তা বাস্তব সত্যের খুব কাছাকাছি ঘটনা। আমাদের ধূলিকণা এবং ইলেকট্রনকে নিয়ে সামান্য হিসেব করলেই প্রমাণ মিলবে যে, এটা সত্য।

এক মাইক্রন (10^{-4} সেন্টিমিটার) ব্যাসবিশিষ্ট একটি ছোট্ট ধূলোর টুকরো নিন এবং মনে করুন এমন একটি পদার্থ নিয়ে ও গড়ে উঠেছে যার ঘনত্ব হল প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 10 গ্র্যাম (লোহার ঘনত্বের চেয়ে সামান্য বেশী) এবং ওটি প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইক্রন পরিমাণ সামান্য বেগে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রের মধ্যে চলমান। তখন এর ওজন হবে প্রায় $1\overline{1}^{-11}$ গ্র্যাম এবং ভরবেগ হবে প্রতি সেকেণ্ডে 10^{-15} গ্র্যাম সেন্টিমিটার। আমরা

ওর ওপর আলো ফেললাম, যার তরঙ্গদৈর্ঘ হল, মনে করুন, আধ মাইক্রন (দৃশ্য আলোর বর্ণালীর মধ্যে, এ হল সবুজ), এর ফোটনদের ভরবেগ হল মাত্র 10^{-22}, আমাদের ধূলিকণার ভরবেগের তুলনায় যা হল বহু কোটি গুণ কম। এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, ধূলিকণার ওপর ফোটনের আঘাত কোন রকম প্রভাবই সৃষ্টি করবে না।

এবারে ইলেকট্রনটিকে নিন। যদিও এর বেগ আলোর কাছাকাছি—সেকেণ্ডে 10^{-10} সেন্টিমিটার—এর ভরবেগ হবে মাত্র 10^{-17} গ্রাম সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। দীপনের জন্যে যে গামা রশ্মির ফোটনকে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার তরঙ্গদৈর্ঘ খুবই ছোট (ধরুন 6×10^{-13} সেন্টিমিটার) এবং ভরবেগ হল 10^{-14}, যা ইলেকট্রনের ভরবেগের তুলনায় বহু হাজার গুণ বেশী। কাজেই একটি ফোটন যখন একটি ইলেকট্রনকে আঘাত করে, তখন একটি শিশু-গাড়ীর ওপর একটি রেলগাড়ীর গিয়ে আছড়ে পড়ার মত ঘটনাটা দাঁড়িয়ে যায়।

এতক্ষণে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, আণুবীক্ষণিক জগতে পরিমাপক যন্ত্রদের কার্যকারিতার সম্ভাবনা খুব কম কথায় বলতে গেলে সীমাবদ্ধ। এরা কণিকার গতিকে একটুও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করে উঠতে পারে না।

এই ভুলগুলো, বা, আরো ভালভাবে বলতে গেলে, পরিমাপের অনিশ্চয়তাগুলো আসলে কি? ১৯২৭ সালে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাধারণ নিয়মগুলো থেকে হাইসেনবার্গ কর্তৃক উদ্ভাবিত অনিশ্চয়তা সম্পর্কের মধ্যে এই প্রশ্নের জবাবটা রয়েছে। ওর চেহারাটা হল এইরকম:

$$\Delta x \times \Delta v x > \frac{h}{m}$$

(আসলে, $h/2\pi$ রাশিটি h-এর জায়গায় বসানো হয়েছে, কিন্তু সেটা কোন গুরুত্বের ব্যাপার নয়, যেহেতু এদের মধ্যে তফাতটা হল মাত্র ছ'গুণ।) এখানে Δx হল একটি কণিকা x-এর অবস্থানের (স্থানাংক) অনিশ্চয়তার পরিমাপ; Δvx হল x দিকে কণিকাটির বেগ vx এর অনিশ্চয়তা পরিমাপ; m হল কণিকাটির ভর এবং $>$ চিহ্নটি নির্দেশ করছে যে. এই অনিশ্চয়তা-

গুলোর গুণফল সম্পর্কবোধক সূত্রটির ডানদিকের রাশির তুলনায় ছোট হতে পারে না।

এখানেই ব্যাপারটির অদ্ভুতত্ব এসে পড়ে। আমরা যদি পরম নির্ভুলভাবে একটি কণিকার অবস্থানের মাপ নেবার চেষ্টা করি, তাহলে এর স্থানাংক Δxএর অনিশ্চয়তা, অবশ্যই শূণ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন, অংকশাস্ত্রের জটিল নিয়ম অনুযায়ী, বেগের অনিশ্চয়তা হবে :

$$\Delta vx = \frac{h/m}{\Delta x} = \frac{h/m}{0} = \infty$$

—বা এক অসীম সংখ্যা। এর অর্থটা হল, যে মুহূর্তটিতে কণিকাটির অবস্থানের মাপ নেওয়া হচ্ছে, তখন এর বেগ চরমভাবে অনির্ধারণীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিপরীতভাবে, যদি সময়ের কোন মুহূর্তে আমরা পরম নির্ভুলভাবে কণিকাটির বেগের মাপ গ্রহণ করি, আমাদের এই কথাটি বলবার কোন উপায়ই থাকবে না যে, কণিকাটি সেই মুহূর্তে ঠিক কোথায় অবস্থান করছে।

তাহলে আমরা কি করব? হয়ত কিছুটা খুঁতসমেত ইলেকট্রনটির অবস্থান এবং বেগ, দুয়েরই মাপ গ্রহণ করে নিয়ে একটা আপোষ করা যেতে পারে, মোটের উপর ঐ খুঁতটুকু হয়ত খুব বেশী হবে না?

এখন দেখা যাক, আমাদের ধূলিকণা এবং ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এই খুঁতগুলো কি ধরণের। প্রথমটির ক্ষেত্রে, হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা সম্পর্কসূত্রের ডানদিকের রাশিটির মান মোটামুটি দাঁড়ায় 10^{-15}। এখন অনিশ্চয়তার আপোষমূলক মানগুলো নেওয়া যাক: $\Delta x = 10^{-8}$সেণ্টিমিটার। $\Delta vx = 10^{-7}$ সেণ্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে (এদের দু'টিকে একসঙ্গে গুণ করে, আমাদের ডানদিকে 10^{-15} এই রাশিটি পাচ্ছি।)

Δvx ও vx এর অনুপাত হল $10^{-7} : 10^{-4} = 10^{-3}$, যা হল এক হাজারভাগের এক ভাগ। বেগ পরিমাপের বেলায় অনিশ্চয়তার মান হিসেবে এতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত; খুব কম ত্রুটিগণক যন্ত্রই এর চেয়ে বেশী নির্ভুলতার পরিচয় দিতে পারে।

এবারে ধূলিকণার অবস্থানের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা সেই Δx এর প্রসঙ্গে আসা যাক; কণিকাটির মাত্রার সঙ্গে এর অনুপাত হল $10^{-4} : 10^{-8} =$

10^{-4}, যা হল দশহাজার ভাগের একভাগ। এই খুঁতটুকু ধূলিকণাটির মধ্যে একটি পরমাণুর মাত্রার অনুরূপ। সেজন্যেই, আমরা যখন ধূলিকণা এবং আরো বিরাট সব বস্তুর বেগ এবং অবস্থানের পরিমাপ করি, আমরা একটি অনিশ্চয়তা সম্পর্কসূচক সূত্রের অস্তিত্ব কখনো কল্পনাই করি না।

কিন্তু ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ আলাদা ছবি পাওয়া যাচ্ছে। আণুমাণিকভাবে এর "মাত্রা' গুলো (আমরা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ইলেকট্রনের মাত্রার কথা বলা পুরোপুরি ঠিক নয়, কারণ এখানে ইলেকট্রনকে দেখা হয় একটি আহিত গোলকরূপে) হল, ব্যাস—10^{-13} সেন্টিমিটার, ভর—10^{-27} গ্র্যাম এবং এক ভোল্ট পরিমাণ বিভব-পার্থক্যযুক্ত ক্ষেত্রে মাঝামাঝি দ্রুতগতি একটি ইলেকট্রনের বেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে 10^7 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। অনিশ্চয়তা সম্পর্কের ডানদিকের অংশটির মান তাহলে দাঁড়ায় 10।

Δx এবং Δvx রাশিগুলো থেকে এই মানটি দাঁড় করানোর বিভিন্ন উপায় আছে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক, আমরা ধূলিকণাটির বেগ যেরকম নির্ভুলভাবে পরিমাপ করেছিলাম, ইলেকট্রনটির বেগও সেভাবে করতে চাই, যার পরিমাণ হল 10^{-3}। তাহলে আমাদের অনিশ্চয়তাগুলো হবে : $\Delta vx = 10^4$ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে ($10^4 : 10^7 = 10^{-3}$) এবং $\Delta x = 10^{-3}$ সেন্টিমিটার। ইলেকট্রনটির অবস্থানের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা তা ইলেকট্রনের আয়তনের তুলনায় বহু লক্ষ কোটি গুণ বেশী হবে।

বেগ পরিমাপের বেলায় নির্ভুলতার পরিমাণ শতকরা একশ' ভাগ অর্থাৎ, আসল বেগের সমান ধরা যাক। পদার্থবিদদের কথামত, পরিমেয় রাশিটির মাত্রা এ থেকে পাওয়া যাবে। তাহলে $\Delta vx = 10^7$ এবং $\Delta x = 10^{-6}$ সেন্টিমিটার, যা এখনো ইলেকট্রনের আয়তনের তুলনায় বহু লক্ষগুণ বেশী।

না, আর কোন আপোষ হতে পারে না; আণুবীক্ষণিক জগৎ তা চায় না।

॥ দোষী কে, যন্ত্র না ইলেকট্রন ? ॥

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যাকে কখনো এ ধরণের উভয়সংকট নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় নি। এর বরাবরের ধারণাটা ছিল এই যে, কোন কণিকার অবস্থান

এবং বেগ যে কোন মুহূর্তেই পরম নির্ভুলতার সঙ্গে পরিমাপ করা সম্ভব হবে (অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে)। কোন প্রারম্ভিক ক্ষণে কণিকাদের যে অবস্থান এবং বেগ, তার ভিত্তিতে কণিকাদের গতিবিধি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর মর্মকেন্দ্রে রয়েছে এই ধারণাটি।

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, এমনকি তত্ত্বগতভাবেও পরিমাপের পরম নির্ভুলতার কথা উঠতে পারে না। গলদটা তাহলে কোথায়? হয়ত যন্ত্রের মধ্যেই?

এ কথা ঠিক, একটি রাশিকে পরম নির্ভুলভাবে পরিমাপের সামর্থ কোন যন্ত্রেরই নেই। আমরা হয়ত বলতে পারি যে, পরিমাপের প্রয়োগকৌশলের যে বিকাশ, তার ইতিহাস হল যান্ত্রিক নির্ভুলতার ক্রমাগত উৎকর্ষলাভেরই ইতিহাস। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পরিমাপের ব্যবস্থা বর্তমানে এক চূড়ান্ত উৎকর্ষতা লাভ করেছে এবং নিয়তই তারা উন্নততর হয়ে চলেছে।

কিন্তু এটা মনে হতে পারে যে, অনিশ্চয়তা সম্পর্ক যন্ত্রপাতির নির্ভুলতার বিষয়ে একটি সীমা, এক উচ্চতর সীমা বেঁধে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে, হাইসেনবার্গ (তাঁর পরে অন্যান্য পদার্থবিদ্‌রা) বললেন যে, গলদটা রয়েছে যন্ত্রেরই মধ্যে। অণুজগতের উপযোগী যন্ত্র, আর বিশ্বকে অনুধাবণের জন্যে নিযুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। দুটি যন্ত্রেরই অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। চারপাশের জগৎকে পর্যালোচনার কাজে যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোকে আমরা ব্যবহার করি, তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। বস্তুতঃ, একটি যন্ত্রের আদত প্রয়োজনটা হল তাই: এর পাল্লার মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটছে, সেগুলোকে 'মানবিক' অনুভূতির পদবাচ্য করে তোলা।

তবে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বীক্ষ্যমাণ জ্যোতিষ্ক বস্তুদের গতিকে কোনরকমেই প্রভাবিত করে না, কিন্তু অণুজগতের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে, আমাদের যন্ত্রটি (আমাদের আদর্শ অতিঅণুবীক্ষণ যন্ত্র), পর্যবেক্ষণাধীন ব্যাপারের সঙ্গে সরাসরিভাবে ব্যতিচার ঘটিয়ে বসে এবং এর প্রাকৃতিক ধারাকে পরিবর্তিত করে। আরো একটা ব্যাপার হল, যন্ত্র এমনই বেশী পরিমাণে এর পরিবর্তন ঘটায় যে, আমাদের আর আসল ব্যাপারটিকে

অনিশ্চিত রূপে আলাদা করে নেবার কোন উপায়ই থাকে না। অনিশ্চয়তা সম্পর্ক ঠিক সেই কাজটিই করছে, একটি পর্যবেক্ষণের 'নির্ভেজালতার' এক উচ্চতার সীমা এ বেঁধে দেয়।

অন্যান্য পদার্থবিদ্‌রা বললেন : "গলদের মূলে রয়েছে ইলেকট্রন"। ওদের যুক্তিও ছিল যথেষ্ট জোরালো। আণুবীক্ষণিক জগৎ তার নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী চলে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, টিকে থাকবার জন্যে এর কোন পরিমাপেরও প্রয়োজন হয় না। যখন আমরা বলি যে, ইলেকট্রন তরঙ্গধর্মের অধিকারী, এর অর্থটা কি দাঁড়ায়?

বেশ, একটি দোলকের দোলনের কম্পনসংখ্যার কথাই ধরুন : যদি বলা যায় যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে কম্পনসংখ্যা হল একটি কোন রাশি, তাহলে কথাটির কোন মানেই হয় না। কম্পনসংখ্যা নির্ণয় করতে হলে, কিছু সময়ের জন্যে দোলকের দোলনকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একইরকমভাবে একথাটাও বলা যায় না যে, কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে তরঙ্গদৈর্ঘ হল এজাতীয় কোন একটি রাশি। তরঙ্গদৈর্ঘের আসল অর্থটা হল, এ এক দীর্ঘ (সঠিক-ভাবে বলতে গেলে, এক অসীম দীর্ঘ) তরঙ্গশ্রেণীর বৈশিষ্ট। এই সব তরঙ্গের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, এদের দৈর্ঘ তরঙ্গের মধ্যে যে কোন একটি বিন্দুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করতে পারে না।

দ্য ব্রগলি সম্পর্কটিকে আবার নিয়ে এমনভাবে লেখা যাক, যাতে কণিকাটির বেগসূচক সংখ্যাটি বাঁদিকে থাকে :

$$v = \frac{h}{m\lambda}$$

আমরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি যে, যেহেতু তরঙ্গদৈর্ঘ λ তরঙ্গের মধ্যে যে কোন বিন্দুর অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল নয় (উদাহরণ স্বরূপ, যে বিন্দুতে কণিকাটি রয়েছে বলে আমরা মনে করছি), তাই এর বেগ কণিকাটির অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না।

যন্ত্রের ব্যর্থতার জন্যে তাহলে সম্পূর্ণভাবে দায়ী হল ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম। কাজেই কাকে সঠিক বলা যাবে? যারা অণুজগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না বলে যন্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত করছেন, না যারা

পরিমাপের আয়ত্তের বাইরে থাকার জন্যে অণুজগতের ঘাড়েই দোষটা চাপাচ্ছেন।

মনে হতে পারে যে, দোষটা উভয়েরই, তবে আধাআধি, এই আর কি। ব্যাপারটির আসল কথাটা হল এই যে, যন্ত্র এবং ইলেকট্রন, দুয়েরই 'অপরাধকে' হাইসেনবার্গ সম্পর্ক ফাঁস করে দিচ্ছে। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়।

॥ প্রায় ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটি প্রচেষ্টা ॥

একটি যন্ত্রের কাছে আমাদের দাবীটি ঠিক কি ধরণের? প্রথমতঃ, আমরা যে সব তথ্য জানতে চাইছি, সেগুলো সে আমাদের জোগাবে। একটি যন্ত্রের, অবশ্য, কোন স্বাধীনতা নেই, মানুষের ইচ্ছাকে সে পালন করে মাত্র।

যে যন্ত্রটিকে আমরা অণুজগতের অনুসন্ধানের কাজে লাগাতে চাইছি, সেটির দুটি ব্যাপার, বা দু'টি প্রান্ত রয়েছে: একটি প্রবেশপথ, অপরটি নিষ্ক্রমণপথ। প্রবেশপথে এ যে সব ব্যাপার নিয়ে কাজ করে, সেগুলো কোয়ান্টাম নিয়মাবলী মেনে চলে, আর নিষ্ক্রমণপথে এ যে সব তথ্যকে সরবরাহ করছে—সেগুলো ক্ল্যাসিকাল 'ভাষায়' লিপিবদ্ধ করা, কারণ আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো এছাড়া অন্য কোন ভাষাকে বুঝে উঠতে পারে না।

আমাদের ইলেকট্রনটির অবস্থান এবং বেগ সম্বন্ধে তথ্য প্রতিমুহূর্তে জানানোর জন্যে আমাদের যন্ত্রকে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম। যন্ত্রটি যথেষ্ট খোলাখুলিভাবে জানাল যে, সে কাজটি ও করতে পারবে না। ওর বক্তব্য হল, যখন ইলেকট্রনের বেগের মাপ নেওয়া হচ্ছে, তখন কণিকাটির অবস্থা সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ না করে ও শুধু বেগ সম্বন্ধেই তথ্য জোগাতে পারবে, আবার যে মুহূর্তে অবস্থান সম্বন্ধে জানাচ্ছে, তখন বেগ সম্পর্কে কোন তথ্য ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না।

কেউ যদি ব্যাপারটিকে একটু ভেবে দেখেন, তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, অন্য আর কারুর তুলনায় পদার্থবিদরা নিজেরাই অনেক বেশী দোষী। যন্ত্রের কাছে তাদের দাবীটা ছিল এই যে, ও ইলেকট্রনের বেগ

এবং অবস্থান, দুয়ের সম্বন্ধেই সংবাদ জানাবে, কিন্তু দেখা গেল যে এই দুটি রাশি কোনরকমভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

অণুজগতের এক বিস্ময়, কণিকাদের তরঙ্গপ্রকৃতির এক আত্মপ্রকাশ, এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, শত শত বছর ধরে পদার্থবিদ্‌রা যে সব পুরনো ক্ল্যাসিকাল ধারণা এবং রাশিদের অনায়াসে কাজে লাগিয়েছেন, আণুবীক্ষণিক জগতকে নিয়ে কাজ করার সময় সেগুলো সব অকেজো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

হয়ত, 'একেবারে অকেজো' কথাটা বলা ঠিক নয়। ধারণাগুলো অণুজগতের মধ্যেও থাকছে বটে, তবে ওরা যেভাবে থাকছে, তা যেন অনেকটা গণ্ডীবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ। কতদূর পর্যন্ত ওদের ব্যবহার করা যাবে, সেটা অনিশ্চয়তা সম্পর্কের দ্বারা স্থিরীকৃত হচ্ছে।

ইলেকট্রনকে একটি বিন্দুপরিমাণ কণিকা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে, স্থানে বা দেশে এর একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল, অবশ্য যদি না একটি তরঙ্গের সঙ্গে এ অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। তরঙ্গটি যেন ইলেকট্রনটির অবস্থানকে বিপর্যস্ত করে তোলে: নিজস্ব তরঙ্গটির যে কোন জায়গায় ইলেকট্রনের অবস্থানকে নির্ণয় করা যেতে পারে।

এর ফলটা দাঁড়ায় এই, স্থির অবস্থায় একটি ইলেকট্রনের তরঙ্গ এক অসীম দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়, এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে একে খুঁজে পাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অন্যদিকে, একটি ইলেকট্রনের গতি যত দ্রুত হতে থাকে, তত নিখুঁতভাবে এর তরঙ্গের মধ্যে এর অবস্থানকে নির্ণয় করে ফেলা যাবে। কিন্তু গতির সবচেয়ে দ্রুত বেগের ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনটির 'বিপর্যস্তভাব', এর নিজের 'পরিমাণের' তুলনায় বহুগুণ বেশী থাকে।

আণুবীক্ষণিক জগতে শুধু যে ইলেকট্রনের অবস্থান এবং বেগ সম্বন্ধে ক্ল্যাসিকাল ধারণাগুলো অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে তাই নয়। এমনকি সময়, কণিকাদের শক্তি এবং আরো অনেক ধারণাও এই নতুন জগতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আপনি হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যে পুরনো, ক্ল্যাসিকাল ধারণা এবং রাশিগুলো অণুজগতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না, পদার্থ-

বিদয়া সেগুলোকে বর্জন করে, এই জগতের বিচিত্র বর্ণের সঙ্গে যারা অনেক বেশী খাপ খায়, সেই নতুন ধারণাদের দিয়ে ওদের জায়গাগুলো পূরণ করলেন না কেন?

এই সমস্যাটি যে কতখানি জটিল, তা একেবারে প্রথম নজরেই বুঝে ফেলা শক্ত, কারণ মানবিক জ্ঞানের পদ্ধতির মূল প্রকৃতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ রয়েছে। বইটির শেষের দিকে আমরা আবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব। বর্তমানের জন্যে এটুকু বলতেই হবে যে, পদার্থবিদ্যা বা বিজ্ঞানের অন্য যে কোন বিষয়ে ধ্যান ধারণার যে কোন পরিবর্তনের কাজ হল এক অস্বাভাবিক দীর্ঘ, জটিল এবং ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া। বিশ্ব, প্রাণ এবং অজৈব প্রকৃতির সত্তা ও পরমাণুর গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের প্রথম যুগের ছেলেমানুষী ধারণাগুলোর মাঝে পরিবর্তন ঘটতে বহু হাজার বছর কেটে গিয়েছিল। এখন থেকে কয়েক শ' বছর পরের পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদের ধারণাগুলো যে কত ছেলেমানুষী বলে মনে হবে, তা একজন সহজেই কল্পনা করতে পারেন।

আমাদের যুগে, মানবিক জ্ঞান বিপুল গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবুও নতুন জগৎ, নতুন ঘটনার উদঘাটনের প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়ছে, ক্রমেই আরো জটিল এবং সংঘাতবহুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আইনস্টাইন অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাপারটিকে বলেছেন : এ যেন "চিন্তাজগতের এক নাটক"।

ক্ল্যাসিকাল ধারণাগুলোকে যখন আণুবীক্ষণিক জগতে এনে হাজির করা হল, ব্যাপারটা ঠিক তাই ঘটেছিল।

॥ আর একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ॥

একটি চেরীফলের বাগানে ঢোকবার জন্যে বেড়া ডিঙিয়ে ছেলেরা যাতে আসতে না পারে, সেজন্য বাগানের মালিক বেড়াটাকে আর একটু উঁচু করে তৈরী করেন। এবারে তাহলে ছোটো ছেলেটি করবে কি? সে দৌড়ে এসে লাফাবে, বা একটি মই নিয়ে আসবে, বা একটি গাছে চড়বে এবং তারপরে লাফাবে, বা……তাহলে, বাস্তবিকই, উপায় অনেকগুলোই রয়েছে। ছেলেরা আজকাল আর রূপকথার গল্পে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাদের যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগৎকে নিয়ে কাজ করতে হত, তাহলে নিশ্চিত

আবেই এমন সব কণিকাদের কথা তাদের কল্পনা করতে হত, যারা 'নীরেট' দেয়ালগুলোর ভেতর দিয়ে চলে আসছে।

বেড়ার ওপরে চড়া বা টপকে বেড়া ডিঙোনোর এই ব্যাপারটাকে আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। স্কুল থেকেই আমরা জানি যে, একটি বস্তু যত নীচে থাকবে, এর স্থৈতিক শক্তিও তত কম হবে। বেড়ার ওপরে আপনি যখন বসে আছেন, তার তুলনায় আপনি যখন নীচে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন আপনার স্থৈতিক শক্তির পরিমাণ কম। কতটা কম তাও আমরা জানি ঃ আমাদের শরীরের ওজন এবং আগের দু'টি অবস্থায় শরীরের ভারকেন্দ্রের উচ্চতায় যে তফাৎ, এই দু'য়ের গুণফলের দ্বারা এই রাশিটি পাওয়া যায়। তফাৎটা বেড়াটির উচ্চতা থেকে এক মিটার বাদ দিলে যে রাশিটি পাওয়া যায়, মোটামুটি সেটির সমান।

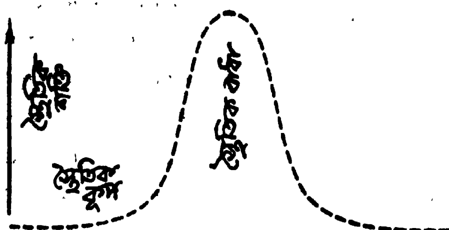
আপনি যদি কোন জায়গা থেকে শক্তি সংগ্রহ করেন, তাহলে বেড়াটি ডিঙোতে পারবেন। আপনার নিজের বা আপনার সঙ্গীদের মাংসপেশীর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনাকে চাঙ্গা করে তুলেও এটা করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই যে কাজটি করা হল, তা আপনার স্থৈতিক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে এবং ফলে আপনি বেড়াটি ডিঙোতে পারবেন।

পরের কাজটা সোজা। লাফিয়ে নীচে নামার জন্যে কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। বরং মাধ্যাকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে পতনের গতিকে কমানোর জন্যে কিছুটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বেড়াটির অন্য দিকে যে স্থৈতিক শক্তি, তা কমে গিয়ে ওপর দিকে লাফানো শুরু করার আগের পরিমাণে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেড়াটি ডিঙিয়ে যাবার সময় আমাদের স্থৈতিক শক্তির একটি রেখাচিত্র যদি অংকণ করা যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাব, রেখাটিতে একটি বৃদ্ধি ঘটছে। পদার্থবিদ্যায় একে বলা হয় স্থৈতিক বাধা।

পারমাণবিক জগতে এ ধরণের সব বাধা রয়েছে। যেমন, যে কোন একটি ধাতুখণ্ডের মধ্যে প্রায় মুক্ত ইলেকট্রনেরা বহুসংখ্যায় রয়েছে এবং এরা এদের পরমাণুদের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে এক শিথিল বাঁধনে জড়িয়ে আছে। কিন্তু, এদের মুক্ত অবস্থা সত্ত্বেও, এরকম কথা কখনো শোনা যায় নি যে, এরা এদের স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে ধাতুখণ্ডটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আসল কথাটা হল, ইলেকট্রনেরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। যদিও বাঁধনটা দুর্বল, তা সত্ত্বেও যে আয়নদের আবির্ভাব ঘটছে (পরের অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে), তারা ইলেকট্রনদের আকর্ষণ করছে। একটি ধাতুখণ্ডের মধ্যে সমস্ত ইলেকট্রনের ওপর সমস্ত আয়নের

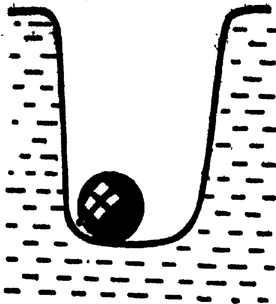


যে সামগ্রিক ক্রিয়া, বাইরের জগৎ থেকে উঁচু দেয়াল ঘিরে এক গজ পরিমাণ জায়গা কেটে নিয়ে তার মধ্যে ইলেকট্রনদের ছোটাছুটি করে বেড়ানোর ছবিটার সঙ্গে ওর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বোরের তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা গর্তের মধ্যে যে গোলকগুলোর ব্যাপার আলোচনা করেছিলাম, তাদের সঙ্গে একটি ধাতুখণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রনদের মিল রয়েছে। ধাতুখণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রনেরা এলোপাথাড়িভাবে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু গোলকগুলো যেন ওদের গর্ত ছেড়ে যেতে পারে না। এই কারণের জন্যে, ইলেকট্রনেরা ধাতুখণ্ডের মধ্যে যে অবস্থানগুলোর মধ্যে এসে পড়ে, সেগুলোকে বলা হয় স্থৈতিক কূপ।

তবুও, এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু ধাতুর টুকরোটার সঙ্গে সব সময়ের জন্যে ঠিক শিকল দিয়ে বাঁধা নেই। কোন কোন অবস্থায় ওরা লাফিয়ে বেড়াটা ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। যেমন, ধাতুর টুকরোটাকে যখন যথেষ্ট ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে দীপ্ত করে তোলা হয়, তখন এটা ঘটে। একটি শক্তিশালী ফোটন একটি ইলেকট্রনকে সজোরে ধাক্কা মেরে ওকে সোজা স্থৈতিক বাধা ডিঙিয়ে বার করে নিয়ে এসে পুরোপুরি মুক্তি দিয়ে বসতে পারে। স্থৈতিক বাধাকে ডিঙোনোর এটাই হল চিরাচরিত ক্ল্যাসিকাল পদ্ধতি এবং ছেলেদের একটি বেড়া টপকে ডিঙোনোর ব্যাপারটির সঙ্গে এর আদত্তে কোন তফাৎ নেই।

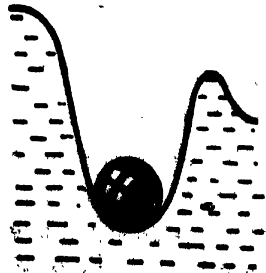
আপনি হয়ত ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন যে, একটি ধাতুখণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রনদের ক্ষেত্রে বাধাটা ঠিক একটি বেড়ার মত নয় : এর একটা সম্মুখের অংশ আছে, কিন্তু পেছনের কোন অংশ নেই। বেড়ার চেয়ে একটি সিঁড়ির সঙ্গে এর অনেক বেশী মিল আছে। গর্তের মধ্যে গোলকটির জন্যে, ওর চারপাশের জমিকে খুঁড়ে একটি বেড়া আমরা তৈরী করে দিতে পারি। একটি ধাতুখণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রনদের ক্ষেত্রে, একটি জোরালো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ধাতুর টুকরোটার ওপর প্রয়োগ করে একাজটা করা যেতে পারে।



এখন গর্তের মধ্যে গোলক এবং ধাতুর টুকরোটার মধ্যে ইলেকট্রন-এই দুটো ক্ষেত্রের বাধাই—অনেকটা একই ধরণের। সে যাই হোক, ওদের সাদৃশ্য এখানেই শেষ হল।

আমরা যদি গর্তের মধ্যে গোলকটির জন্যে নিউটনের সমীকরণকে সমাধান করি, তাহলে দেখা যাবে যে, গোলকটি বরাবর ওখানেই থাকবে যদি না বাধাটাকে পরাভূত করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি ওর ওপর প্রয়োগ করা হয়। কোন সমীকরণের সাহায্য ছাড়াই এটা আমরা জানি। গোলকগুলো খুশীমত লাফিয়ে গর্তের বাইরে চলে আসে না, ছেলেরাও না লাফিয়ে বেড়া টপকাতে পারে না।

ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যার দৃঢ় অভিমত এই যে গোলকটি কখনই গর্তের বাইরে আসবে না, এই বিস্ময়টুকুর সম্ভাবনা হচ্ছে শূন্যের কোঠায়, যার অর্থটা হল—এক সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যতা।



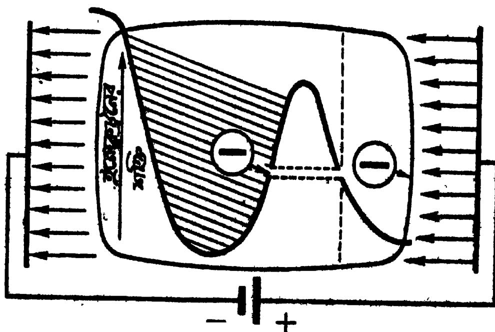
এবারে আমরা যদি একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত একটুকরো ধাতুর মধ্যেকার একটি ইলেকট্রনের জন্যে শ্রোয়েডিংগার

সমীকরণকে সমাধান করি, তার ফলটা হবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এখানে, ধাতু থেকে একটি ইলেকট্রনের বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাটা শূন্যের সমান নয় এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে, কখনোই পুরোপুরি শূন্য হয়ে দাঁড়ায় না। এর মান খুবই ছোট, হয়ত যৎসামান্য ছোট, কিন্তু সেটি কখনোই মিলিয়ে যায় না।

মনে হতে পারে, ইলেকট্রনেরা যেন স্থৈতিক বাধার মধ্য দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারবে এবং ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যদ্‌বাণীদের একেবারে তোয়াক্কা না করে, অন্য ধারে গিয়ে পৌঁছোবে। রহস্যময় সব বল ইলেক-ট্রনটির বেরিয়ে চলে যাবার জন্যে বাধাটির মধ্য দিয়ে একটি সুড়ঙ্গই কেটে বসে আছে বলে মনে হবে। যার জন্যে পদার্থবিদ্‌রা এই আশ্চর্য ব্যাপারটির নামকরণ করেছেন—সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়া।

॥ অনিশ্চয়তা সম্পর্কটি সম্বন্ধে পুনশ্চ ॥

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার কাছ থেকে এই নতুন 'বিস্ময়টির' ব্যাখ্যা পাবার জন্যে আমরা যতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম, আমাদের পরিমাপক যন্ত্রটি ততক্ষণ



কাজ করে চলেছিল; কিন্তু যে ফলগুলো পাওয়া গেল, সেগুলো খুবই নৈরাশ্যজনক। যন্ত্রের কাছে আমাদের নির্দেশ ছিল, ইলেকট্রনটি স্থৈতিক বাধা গলে কিভাবে বেড়িয়ে যায় তার ওপর নজর রাখা; যেহেতু এই

ব্যাপারটা ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে মৌলিক নিয়মগুলোকে লংঘন করছে। আমরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে, তত্ত্বগতভাবে এটি একটি অর্থহীন ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গর্তের মধ্যে গোলকটির মোট শক্তি ওর গতীয় শক্তি ও স্থৈতিক শক্তির যোগফলের সমান এবং ঋনাত্মক। এর কারণ হল এই যে, গোলকটির স্থৈতিক শক্তি (গর্তটির একেবারে ওপর থেকে, অর্থাৎ স্থৈতিক বাধার সর্বোচ্চ অংশ থেকে যার হিসেবটা আমরা নিয়ে থাকি) হচ্ছে ঋনাত্মক এবং ওর গতীয় শক্তির তুলনায় বেশী (পরিমাণে)। এটাও পরিষ্কার যে বাঁধাটির সীমানার মধ্যে গোলকটির মোট শক্তি ঋনাত্মক থাকা উচিত, যেহেতু গলে বেরিয়ে যাবার সময় এর পরিমাণে কোন ঘাটতি ঘটে না। কিন্তু, অন্যদিকে, স্থৈতিক শক্তির পরিমাণ কমে আসে ও বাধার সর্বোচ্চ অংশে মোট শক্তি শূন্য হয়ে দাঁড়ায়।

এ থেকে একমাত্র সিদ্ধান্ত হল এই যে, বাধার সীমানার মধ্যে গোলকটির গতীয় শক্তি ছিল ঋনাত্মক। কিন্তু ওটি কি ধরণের রাশি? একে লিখে ফেলা যাক:

$$Ekin = \frac{mv^2}{2}$$

বেগ v-এর বর্গ সবসময়েই ধনাত্মক হবে, ওর চিহ্ন যাই হোক না কেন, রাশিটির হরে যে 2 রয়েছে, তাও হল ধনাত্মক। এর অর্থটা দাঁড়াল এই যে, কণিকাটির ভর m হল ঋনাত্মক। কিন্তু ঋনাত্মক ভর ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা হোক বা পরম বিপ্লবী কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতেই হোক, কোন ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না। মনে মনে ছবিটা ভাবুন যে, একটি ট্রেন মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ যাচ্ছে, অথচ গাড়ীর কামরাগুলো এন্‌জিনটা থেকে ক্রমেই দূরে, লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কোর দিকে সরে যাচ্ছে।

এ হল নিশ্চিতভাবেই একটি অর্থহীন ব্যাপার! এবং ব্যাপারটা সত্যিই যে তাই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে, আমরা একটি যন্ত্রকে সাজিয়ে তার ওপর ইলেকট্রনের ধরপাকড়ির ভার দিলাম। ব্যাপারটা যা ঘটল, তা হচ্ছে এই: ইলেকট্রনটি স্থৈতিক বাধার সীমানার দিকে এগিয়ে গেল। ইলেকট্রনটা যখন বাধার মধ্য দিয়ে গলে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন ওকে ধরবার জন্যে,

ওর অবস্থানকে বেঁধে ফেলবার কোন দরকারই নেই ; শুধু এটুকু দেখতে হবে যে, বাধাটির চৌহদ্দির মধ্যে কোথাও যেন ওটি অবস্থান করে।

কিন্তু সেটাই সব নয়। যন্ত্রটি সেই মুহূর্তে ইলেকট্রনটির বেগ বার করে ফেলবে, যাতে ওর গতীয় শক্তি বাস্তবিকই ঋণাত্মক হচ্ছে কিনা সেটা নির্ণয় করে ফেলা যায়। কিন্তু এখানেই যন্ত্রটি অসহায় হয়ে পড়ে। একমাত্র হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা সম্পর্কই অবস্থাটা রক্ষা করতে পারে।

এবারে বাধার মধ্যে একটি ইলেকট্রনের অবস্থানকে বেঁধে ফেলবার জন্যে, ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফোটনের দ্বারা ইলেকট্রনটিকে দীপ্ত করে তুলতেই হবে, কারণ ইলেকট্রনটির অবস্থানকে যে নিভুর্লভাবে নির্ণয় করার প্রয়োজন, তা বাধাটির প্রস্থের মাপের তুলনায় কম হলে চলবে না এবং পরমাণুদের জগতে এই প্রস্থের মাপটা ছোট। কিন্তু একটি ইলেকট্রনের ওপর একটি ফোটনের সংঘাত ইলেকট্রনটির বেগের মধ্যে বেশ একটু অনিশ্চয়তাকে ঢুকিয়ে বসবে এবং তা হবে এমনই যে ইলেকট্রনটির গতীয় শক্তির মধ্যে যেটুকু অনিশ্চয়তা ও ঘটাচ্ছে, তা বাধাটির সর্বোচ্চ বিন্দুর বাইরে কণিকাটিকে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে ঠিক যথেষ্ট হবে।

একটু ঘুরিয়ে বলতে গেলে, বাধাটির নীচে কোন অক্ল্যাসিকাল পথে একটি কণিকাকে সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। কণিকাটিকে সনাক্ত করবার প্রক্রিয়ার মধ্যেই এমন একটি শক্তি কণিকাটিকে প্রদত্ত হয়, যা ওর পক্ষে একটি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত এবং ক্ল্যাসিকাল পদ্ধতিতে বাধাটি টপকে বেরিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট। এ যেন অনেকটা, সাক্ষ্যপ্রমাণ চাপা দেবার জন্যে কোন অপরাধীকে একজন পুলিশের সাহায্য করার মত একটি ব্যাপার।

আণুবীক্ষণিক জগতে যে সব নানা ধরণের ঘটনা ঘটছে, আগেরটি তারই একটি দৃষ্টান্তবিশেষ। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিচিত্র সব বিষয়ের দাবী করে বসতে পারে এবং ক্ল্যাসিকাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সব দাবীর অসারতাকে প্রমাণ করা মৌলিকভাবেই অসম্ভব — বাধার নীচে কণিকাটির সন্ধান করবেন না, ওকে আপনি ওখানে পাবেন না। বৈদ্যুতিক বাধার মধ্যে একটি কণিকার অবস্থানের ধারণাটিই যেমন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তেমনি ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে সমান অর্থহীন ব্যাপার।

সূড়ঙ্গ কণিকাটি বাধার মধ্য দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই রহস্যের চাবিকাঠিটা, সর্বশেষ বিশ্লেষণে, অণুজগতের ইলেকট্রন এবং অন্যান্য কণিকাদের তরঙ্গধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

॥ আবার জড় তরঙ্গেরা ॥

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, এইসব তরঙ্গধর্ম শেষ পর্যন্ত কণিকাদের অবস্থানের ওপর কণিকাদের বেগের নির্ভরতার অবসান ঘটায়। আণুবীক্ষণিক জগতে কোন পরিক্রমাপথ নেই। কিন্তু একটি কণিকার অবস্থান ওর স্থৈতিক শক্তিকে প্রভাবিত করে এবং ওর বেগ প্রভাবিত করে ওরই গতীয় শক্তিকে।

কাজেই, সঠিকভাবে বলতে গেলে, একটি কণিকার গতীয় শক্তি ও স্থৈতিক শক্তি, যুগপৎ উভয়কেই নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব ব্যাপার। যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ওরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়। এইসব ক্ল্যাসিকাল ধারণার প্রয়োগের সীমানার মধ্যে, পারমাণবিক জগতের শক্তির ব্যাপারগুলো অনিশ্চয়তা সম্পর্কের কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

এ সবের অর্থ হল এই যে, একটি স্থৈতিক কূপের মধ্যে অবস্থিত একটি কণিকার, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, কূপের বাইরে বেরিয়ে আসার একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর আর একটা পথ হল এই যে, কূপটির মধ্যে কণিকাটির থেকে যাওয়ারও একটি সম্ভাবনা রয়েছে। মনে করুন, আমাদের একহাজারটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং ওদের মধ্যে দশটি বাধাটির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল, তাহলে সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা হল শতকরা 1 ভাগ এবং সুড়ঙ্গ প্রভাবের অনস্তিত্বের সম্ভাবনা হল শতকরা 99 ভাগ।

এই সম্ভাবনাদের যথাক্রমে স্থৈতিক বাধার ভেদ্যতা ও প্রতিফলনের ক্ষমতা বলা হয়ে থাকে।

ভেদ্যতা বা স্বচ্ছতা এবং প্রতিফলনের ক্ষমতা এরা সব পরিচিত শব্দ। এরা আলোক তরঙ্গের পথের সঙ্গে সম্পর্কিত করে পদার্থদের পরিচয় দিচ্ছে। দুটি বিভিন্ন পদার্থের সংযোগস্থলে, আলো সব সময়েই আংশিকভাবে দ্বিতীয় মাধ্যমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়। স্থৈতিক বাধা কি দুটি মাধ্যমের মধ্যে একটি সীমানা নয়? বিদ্যুৎচৌম্বক

(আলোক সমেত) তরঙ্গদের পক্ষে একেবারেই নয় কিন্তু ব্রগলি তরঙ্গদের পক্ষে কথাটা ঠিক।

এ হল একটি গভীর অর্থবোধক উপমা। সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়ার নিয়মগুলো বিভিন্ন পদার্থের সীমানার মধ্যে আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন এবং নিক্রমণের নিয়মগুলোর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে।

আমাদের বাধারূপে আমরা যে একটি বেড়াকে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ প্রস্থবিশিষ্ট কোনকিছুকে বেছে নিয়েছিলাম, সে ঘটনাটা কিন্তু আকস্মিক নয়। এই বাধাটির যদি একটি সিঁড়ির ধাপের মত শুধু সম্মুখভাগে একটি দরজা থাকে, তাহলে সুড়ঙ্গ প্রভাবটি সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়। কণিকারা অসীম দৈর্ঘবিশিষ্ট (যদিও খুব নীচু) বাধার মধ্যে সুড়ঙ্গ রচনা করতে পারে না। এখানে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণতা লাভ করছে।

বাস্তবিকই, আমাদের পরিমাপক যন্ত্র একটি বিজয়লাভ জাতীয় উৎসবের আয়োজন করে উঠতে পারবে: বাধার নীচে (যদি কণিকাটি ওখানে গিয়ে থাকে) একটি কণিকার অবস্থানকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে স্থাপন করা সম্ভব হবে, ওর অবস্থানের পরিমাণের মধ্যে অনিশ্চয়তা যত বেশী পরিমাণেই থাক না কেন। তার মানে হল এই যে, অনিশ্চয়তা সম্পর্ক থেকে কণিকাটির সঠিক গতি এবং সেই হেতু তার গতীয় শক্তি জানা যাবে। এই শক্তি তখন নিশ্চিতভাবেই হবে ঋণাত্মক।

কিন্তু প্রকৃতি নিজের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। ঋণাত্মক গতীয় শক্তি হল এক অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়াটির অন্তর্ধান ঘটে।

হয়তো কিছু কিছু পাঠক পূর্বেকার ব্যাখ্যার দ্বারা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন নি। এটা কি হতে পারে যে, আমরা যা কিছু বলেছি তার সবটাই হল শুধু বিমূর্ত তাত্ত্বিক চিন্তাই বেশ, আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন। ইলেকট্রনেরা একটি তপ্ত ধাতব ফিলামেণ্ট থেকে অজস্র সংখ্যায় নির্গত হয়—তাপীয় শক্তি ধাতুর টুকরোর সীমানার বাধাকে টপকে ওদের বাইরে বার করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, অবশ্য একটি ঠাণ্ডা ধাতুর টুকরোর ক্ষেত্রে এটা কখনোই ঘটবে না।

কিন্তু এই ধাতুর টুকরোটিকে একটি জোরালো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখুন, তখন আবার তা থেকে বন্যার স্রোতের মত ইলেকট্রনেরা বেরোতে

শুরু করবে। একে বলা হয় তাপহীন নিঃসরণ এবং চমৎকারভাবে এই কথাটি প্রতিপাদন করছে যে, সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়াটি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্‌দের মানসিক কল্পনামাত্র নয়।

॥ তরঙ্গ অপেক্ষক ॥

সমীকরণদের শুধু খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে তৈরি করা হয় না, ওদের উদ্দেশ্য হল সমস্যার সমাধান করা। সমীকরণেরা কখনো সরল, কখনো জটিল ধরণের হয়ে থাকে। শ্রোয়েডিংগারের সমীকরণটি নিশ্চিতভাবেই জটিল। এটি একটি দ্বিতীয়মাত্রার আংশিক বিভেদক সমীকরণ নামে পরিচিত। এসবের অর্থ ব্যাখ্যা করা, এই বইয়ের আলোচনার অনেক বাইরের বিষয়। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এধরণের সমীকরণগুলো সেই সব রাশিদের ব্যাখ্যা করার জন্যে কাজে লাগানো হয়, স্থান এবং কালে যাদের পরিবর্তন ঘটছে।

এই সব সমীকরণের মধ্যে অজ্ঞাত রাশিরা সবরকমভাবেই ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে: এ হতে পারে কোন পাত্রের মধ্যে তরল পদার্থের তলের আকৃতি, বাইরের মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের স্থানাংকগুলো, প্রেরক যন্ত্র থেকে গ্রাহক যন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলা কোন বেতারসংকেতের শক্তি, একটি যান্ত্রিক সাধনীর কেটে চলার বেগ এবং আরো অনেক কিছু। বিজ্ঞানীরা যেসব রাশি সম্বন্ধে আগ্রহশীল, সেগুলোর ওপর তাঁদের জ্ঞাতব্য রাশির নির্ভরতাকে এ জাতীয় একটি সমীকরণের সমাধান সরাসরিভাবে প্রকাশ করে। অংকশাস্ত্রবিদ্‌রা এইধরণের সব সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্যে অপেক্ষক শব্দটি ব্যবহার করেন।

শ্রোয়েডিংগারের সমীকরণে অজ্ঞাত রাশিটিকে তরঙ্গ অপেক্ষক বলা হয়। এর সঠিক অর্থটা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়, যদিও এর সাহায্যে হাজার হাজার চমৎকার গণনার কাজ করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, বিজ্ঞানীরা এখনো এ বিষয়টি নিয়ে তর্ক করে চলেছেন।

সে যাই হোক, একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত হতে পেরেছেন বলে

মনে হয়; সেটা হল এই যে, তরঙ্গ অপেক্ষকের বর্গটি সম্ভাবনার অর্থকে প্রকাশ করছে। স্থানাংক এবং সময়ের ওপর এর নির্ভরতা, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিশেষ জায়গায় একটি কণিকাকে খুঁজে পাবার সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে: একটি কণিকা কোন সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে যে ক্রিয়া ঘটাচ্ছে, তার ফলে কণিকাটিকে যে সনাক্ত করা যেতে পারে তার সম্ভাবনা। যেমন, আমাদের পরিমাপক যন্ত্রের সঙ্গে ওর ক্রিয়াপ্রক্রিয়া। এই সম্ভাবনাই হল 'সম্ভাবনার তরঙ্গ', ইলেকট্রনের অবচ্যুতির পরীক্ষার সময় যার কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম।

সাধারণভাবে শ্রোয়েডিংগার সমীকরণকে সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা, এমন কি যখন আমরা আধুনিক অংকশাস্ত্রের অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলো নিয়েও কাজ করছি। কিন্তু প্রতীত ব্যাপারের এক প্রশস্ত শ্রেণী রয়েছে, যা এই সমাধানকে সহজসাধ্য করে তোলে। সেগুলি হল তথাকথিত স্থিতিধর্মী সমস্যাবলী, যে ক্ষেত্রে ঈপ্সিত তরঙ্গ অপেক্ষকটি একটি নির্দিষ্ট 'মধ্য' আকারের চারপাশেই শুধু আন্দোলিত হচ্ছে কিন্তু আকারটির নিজের কোন কালিক পরিবর্তন ঘটছে না।

এটা খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ ধরণের সমস্যা কোন প্রক্রিয়ার (অবশ্যই, অপর্যাবৃত্ত) প্রতি নির্দেশ করে না। প্রক্রিয়ার মধ্যে, কিছু পরিচালিত হচ্ছে এবং কালে পরিবর্তিত হচ্ছে। স্থিতিশীল সমস্যাগুলো সেই সব পদ্ধতির গঠনপ্রকৃতির দিকে নির্দেশ করে যেখানে কোন প্রক্রিয়া ঘটতে পারে। গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু একটি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কারুর পক্ষেই কোনকিছু বলা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না কি পরিস্থিতিতে তা ঘটছে, সে সম্বন্ধে তিনি জানতে পারেন।

আণুবীক্ষণিক জগতে এই সব পরিস্থিতির উপাদানেরা হচ্ছে পরমাণু কেন্দ্রক, পরমাণু, অণু, কেলাস, এবং আরো অনেক জিনিষ। আমরা জানি যে, এদের সবারই আশ্চর্য ধরণের স্থায়ী গঠন রয়েছে। স্থিতিশীল শ্রোয়েডিংগার সমীকরণটিকে সর্বপ্রথম ঠিক এই সব উপাদানের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সব ফল পাওয়া গেল। পরের অধ্যায়ে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

॥ তরঙ্গ এবং কোয়ান্টাম মিলিত হল ॥

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মধ্যে স্থিতিশীল সমস্যাগুলোর আর একটি আশ্চর্য ধর্ম রয়েছে। একে বোঝবার জন্যে আমরা স্মরণ করি যে, অনিশ্চয়তা সম্পর্ক শুধু একটি কণিকার অবস্থান এবং বেগ নয়, এর মোট শক্তি এবং সময়কেও জড়িয়ে রয়েছে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে, হাইসেনবার্গ সম্পর্কের বক্তব্য হল এই যে, যত দীর্ঘ সময় ধরে একটি পরিমাপ গ্রহণ করা হবে, কণিকাটির শক্তির মাপও তত নির্ভুল হবে। পূর্বোক্ত সম্পর্কটির আকারের সঙ্গে এই সম্পর্কের আকারের অত্যন্ত সাদৃশ্য রয়েছে :

$$\Delta E \times \Delta t > h$$

(আবার, h এর জায়গায় $h/2\pi$ লেখাটা অনেক বেশী সঠিক হবে)।

এখানে ΔE হল কণিকাটির শক্তি E এর মধ্যেকার অনিশ্চয়তা এবং t বা সময়ের যে মুহূর্তে কণিকাটির সঠিক শক্তি ছিল E, Δt হল সেই মুহূর্ত সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা। $>$ চিহ্নটির অর্থ হল এই যে, এই অনিশ্চয়তাগুলোর গুণফল প্লাংকের ধ্রুবক h এর তুলনায় ছোট হতে পারে না।

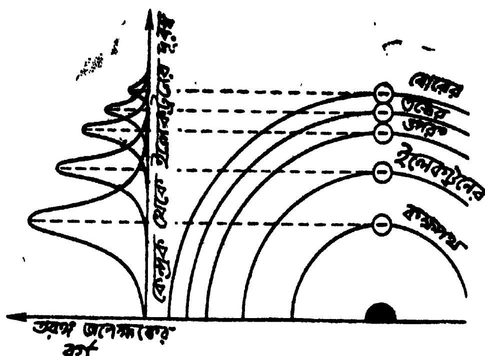
এখন স্থিতিশীল কথাটির অর্থ এই যে, একটি কণিকার শক্তি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে আমরা বরাবর পরিমাপ করে যেতে পারব। এখানে, পরিমাপের সময়ের অনির্ধারণীয়তা কোন অংশগ্রহণ করছে না।

কাজেই আমরা নির্বিবাদে ধরি, $\Delta t = \infty$। কিন্তু তাহলে, অংকশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী,

$$\Delta E = \frac{h}{\Delta t} = \frac{h}{\infty} = 0$$

এর অর্থটা হল এই যে, শক্তিকে পরিমাপ করার সময় অনিশ্চয়তার পরিমাণ হল শূন্য। অর্থাৎ, স্থিতিশীল অবস্থায় একটি কণিকার শক্তি পরম সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। এটিই হল সেই আশ্চর্য পরিস্থিতি যার কথা আমরা খানিক আগেই উল্লেখ করেছি।

এই শক্তির পরিমাণ শ্রোয়েডিংগার সমীকরণের মধ্যে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। E যতক্ষণ ধনাত্মক হবে (এবং এটা, আমাদের স্মরণ থাকতে পারে, একটি কণিকার মুক্ত গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত), ততক্ষণ শ্রোয়েডিংগারের সমীকরণটির E-এর যে কোন মানের জন্যেই একটি বাস্তব সমাধান রয়েছে।



এর অর্থটা দাঁড়ায় এই যে, সমাধানের বর্গ (সম্ভাবনা), E-এর সব মানের জন্যেই একইরকমভাবে শূন্য ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা হয়ে থাকে। সাধারণ ভাষায় দাঁড় করালে এর অর্থ টা হয় এই যে, একটি মুক্ত কণিকার যে কোন শক্তি এবং যে কোন গতিবেগ (যা, স্বভাবতই কখনই আলোর গতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না) আয়ত্ত করার অধিকার আছে এবং ক্ষেত্রের যে কোন জায়গায় থাকবার তার অধিকার রয়েছে।

আবার E যখন ঋণাত্মক (আবার আমরা স্মরণ করি, একটি কণিকার আবদ্ধ অবস্থার সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ; যেমন গর্তের মধ্যে বলটি, পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রন) হয়ে দাঁড়ায়, সমীকরণের সমাধানের মূলগতভাবে পরিবর্তন ঘটে। মনে হতে পারে যে, শক্তি E-এর কয়েকটি নির্দিষ্ট মানের ক্ষেত্রেই এর অন্তর্ধান ঘটছে না।

E-এর এই সব মানকে কণিকাটির অনুমোদিত শক্তির অনুস্থনিক বলা হয়। ছবিটির দিকে একবার তাকান। একটি কণিকার অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রায় সব জায়গাতেই শূন্যের কাছাকাছি, শুধু বাদ পড়বে সেই অবস্থানগুলো

যেখানে এর অনুমোদিত শক্তি রয়েছে। এখানে সম্ভাবনার পরিমাণ হল শূন্য থেকে লক্ষণীয়ভাবে আলাদা। পদার্থবিদ্‌রা এই অবস্থার নামকরণ করেছেন শক্তির অনুভূমিকের বিচ্ছিন্নতা।

এবারে আর একটু খুঁটিয়ে দেখুন। এই ছবিটির সঙ্গে কি পরমাণুর বোর মডেলের অনুমোদিত শক্তির অনুভূমিকের কিছুটা মিল নেই? নিশ্চয়ই তা আছে। এ ছাড়া আরো কথা হল, এ সেই একই বস্তু। বোরের ইলেকট্রন কক্ষপথগুলো হচ্ছে সেই একই শক্তির সব অবস্থা, যেখানে একটি ইলেকট্রনের থাকবার সম্ভাবনা শূন্য থেকে বেশ খানিকটা পরিমাণে আলাদা।

বোর শুধু এই কক্ষপথগুলোকে কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রমাণ করতে পারেন নি যে, কেন ওরা থাকবে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাই এই প্রকল্পের নীচে ভিত্তিপ্রস্তরটি বসিয়ে দিয়েছিল।

পরমাণুদের মধ্যে ইলেকট্রনদের লাফানোর কোয়াণ্টাম প্রকৃতি সম্বন্ধে বোরের দ্বিতীয় ধারণাটিকেও কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা বাস্তবে রূপায়িত করেছে। শ্রোয়েডিংগার সমীকরণ থেকে যেমন দেখা যাচ্ছে, একটি পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রন কেবলমাত্র অনুমোদিত শক্তির অবস্থাগুলোতেই থাকতে পারে। এর অর্থটা হল এই যে, যখন একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর ঘটে, শক্তির মধ্যে কিন্তু এলোপাথাড়িভাবে পরিবর্তন ঘটে না বরং তা ঘটে অত্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণগত ভিত্তিতে।

সোজাসুজিভাবে লাফানো অথবা স্থান পরিবর্তনের অবস্থাগুলোর মধ্যে শক্তির পার্থক্যের সঙ্গে তা সমান।

এই শক্তির পার্থক্য হল ঠিক সেই প্লাংকের কোয়াণ্টাম, যা নতুন পদার্থ-বিদ্যার গোড়াপত্তন করেছিল। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা দু'টি সমুজ্জ্বল প্রকল্পের মাঝে মৈত্রী ঘটাল—শক্তির কোয়াণ্টামের সম্বন্ধে প্লাংকের প্রকল্প এবং জড় তরঙ্গ সম্বন্ধে দ্য ব্রগলির প্রকল্প—এবং ওদের অন্তরঙ্গ পারস্পরিক যোগাযোগকে দেখিয়ে দিল।

দ্য ব্রগলি তরঙ্গকে বাদ দিয়ে প্লাংকের কোয়াণ্টামের সৃষ্টিই ঘটত না।

এভাবে এই দুটি স্রোতস্বিনী একসঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন জ্ঞানের এক বেগবান প্রবাহে রূপ লাভ করল। এই ক্রমপ্রসারমান জলধারাকে অনুসরণ করা যাক: এবং দেখা যাক নতুন কি দিগন্ত উন্মুক্ত হচ্ছে।

। চতুর্থ অধ্যায় ।

পরমাণু, অণু, কেলাস (ক্রিষ্ট্যাল)

॥ ইলেকট্রন-কক্ষের বদলে ইলেকট্রন-মেঘ ॥

পদার্থবিদ্যার অন্য কোন শাখায় বোধহয় কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার মত এত দ্রুত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়নি। মূল ধারণাসমূহের জন্মের প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যেই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রতিটি পদ্ধতি ও গাণিতিক প্রণালী বিশদভাবে নিরূপিত হয়; এমন অনেক ফলাফল লব্ধ হয় যার বৈজ্ঞানিক মূল্য বিরাট এবং এই ফলাফলগুলিকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে দেখা দেয় ব্যাপক ও গভীর প্রয়াস।

১৯২৮ সালের মধ্যেই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা হয়ে পড়েছিল এক সুপ্রতিষ্ঠিত পরিণত বিজ্ঞান, এক অভ্রভেদী অট্টালিকা যার বনিয়াদটা রকমারি এবং উপরতলাটা চমৎকার সর্বাঙ্গসঙ্গত। তার সত্যাসত্য যাচাই করা হয়েছিল ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যার মতই। নিখুঁত স্তরে পৌঁছতে ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার লেগেছিল দুশো বছর, আর কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার লাগল মাত্র পাঁচ বছর। বিংশ শতাব্দীর এমনই গতিবেগ!

পার্বত্য খরস্রোতা যেমন বাঁধ ভেঙে তারপর শান্ত ভাবে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই পাঁচ বছরের বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিকাশের পর কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা শান্ত ভাব ধারণ করল। কার্যক্ষেত্রে নব নব ঘটনা-শ্রেণীকে টেনে এনে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা যেমন সেগুলিকে আয়ত্ত করতে ও নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগল, তার বিকাশ ঘটতে লাগল আরও ধীরে ও সমভাবে।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রথম লাভ পরমাণু। পরমাণু থেকেই প্লাংক ও বোরের নেতৃত্বে নতুন পদার্থবিদ্যার সূচনা। পরমাণুই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রথম আকর্ষণীয় বস্তু।

নতুন আলোকে পরমাণুর গতিপদ্ধতির পুনর্বিবেচনাই হল ঐ বলবিদ্যার

প্রথম কর্তব্য। বোর ইলেকট্রন-কক্ষের চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছিলেন। এটি ছিল, আমরা এখন জানি, ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার আবাদ-বিজড়িত এক সঙ্গতিহীন পদক্ষেপ। কক্ষের অর্থ হল, পরমাণুর অভ্যন্তরে গতিশীল ইলেকট্রনের আবক্র পথরেখা। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কক্ষ নিয়ে মাথা ঘামায় না, সরাসরি তাদের অস্বীকার করে অর্থহীন বলে গণ্য করে।

তাহলে কক্ষের স্থান পূরণ করবে কে? পরমাণুর মধ্যে কোন একটা স্থানে ইলেকট্রন অবস্থানের সম্ভাবনার বিতরণ প্রণালী। আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে, পরমাণুতে অবস্থিত ইলেকট্রনের সামগ্রিক শক্তি কেন্দ্রক থেকে তার দূরত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রক থেকে অনুমোদিত দূরত্বসমূহের অনুযায়ী স্বীকৃত হয় শক্তিস্তবক।

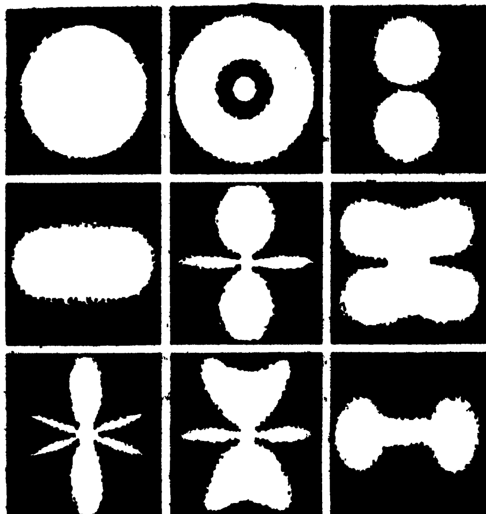
তা সত্ত্বেও কেমন যেন আমরা কক্ষগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক, ওদের সাহায্যে আমরা এত সহজে পরমাণুকে মানসচিত্রে অংকিত করতে পারি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তখন বলে: "ঠিক আছে, যদি কক্ষগুলিকে পছন্দ হয়, রেখে দাও। কোন স্বীকৃত শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের যে সব বিন্দুতে অবস্থানের সম্ভাবনা সর্বাধিক, সেগুলির মধ্য দিয়ে রেখা আঁক। এই রেখাকেই তোমার কক্ষ বলে ধরে নাও। কিন্তু কখনও ভুলো না যে, তোমার ইলেকট্রন কোন বিন্দু নয়; তার নিজস্ব তরঙ্গই তার উপর প্রলেপ দিয়ে যায়, যার দরুণ তোমার কক্ষটি আসলে অলীক বস্তুমাত্র।"

'তথাস্তু' বলে কোয়ান্টামওয়ালাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের কক্ষগুলি আঁকি। বক্ররেখাগুলির সুসংবদ্ধ চিত্রপদ্ধতিতে আমরা আনন্দ বোধ করি। তারপরেই কোয়ান্টামওয়ালা বলে চলেন: "জানো, কক্ষগুলি এত আকর্ষণীয় কেন? ওগুলি এমন যে প্রত্যেকটির মধ্যেই কোন পূর্ণসংখ্যক দ্য ব্রগলি ইলেকট্রন তরঙ্গ উপযুক্তভাবে এঁটে যায়। কেন্দ্রকের নিকটতম প্রথম কক্ষে স্থানলাভ করে একটি তরঙ্গ, দ্বিতীয়টিতে দুইটি তরঙ্গ, তৃতীয়টিতে তিনটি তরঙ্গ, এবং এইভাবেই কক্ষের সঙ্গে তরঙ্গবৃদ্ধি উত্তরোত্তর এগিয়ে চলে।"

বস্তুতঃ এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং দ্য ব্রগলি তরঙ্গের সার্বজনীনতার নতুন প্রমাণ এতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তারপরেই কোয়ান্টামওয়ালা বলে চলেন: "তোমার কক্ষের

রেখাচিত্রগুলো বেশ চমৎকার। কিন্তু অত্যুৎসাহী হয়ো না, কারণ ওগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই। কক্ষস্থিত ইলেকট্রনের বদলে 'ইলেকট্রনের সম্ভাব্যতা-মেঘের' চিন্তাকে মানসপটে তুলে ধর। আর পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের এই হল আসল রূপ। যেখানে ইলেকট্রন অবস্থানের সম্ভাবনা বেশী সেখানে মেঘটিও বেশ ঘন এবং সেইসব স্থানে পাতলা বা স্বচ্ছ, যেখানে ঐ সম্ভাবনা কম। এই সব মেঘের আলোকচিত্রের দিকে একবার চেয়ে দেখ।"



আলোকচিত্র? তাহলে শেষ পর্যন্ত ওঁরা ছলনাময়ী ইলেকট্রনগুলিকে ধরতে পেরেছেন? মানে, ঠিক তা নয়: অনিশ্চয়তা সম্বন্ধটিকে এড়ানোর কোন উপায়ই নেই। এগুলো পরমাণুর আলোকচিত্র নয়, বিশেষ ধোঁয়াটে ধরণের আলোকচিত্র যেগুলো বাস্তবিকভাবে পারমাণবিক ইলেকট্রনের 'সম্ভাব্যতামেঘ'-এর ঘনত্ব বিস্তরণের অনুরূপ।

এই চিত্রগুলিতে আমরা ইলেকট্রন মেঘগুলির বিভিন্ন গড়ন দেখতে পাই। এদের কয়েকটি বর্তুলাকার, অপরগুলি চ্যাপ্টা ও লম্বা সিগারসদৃশ। এই বৈচিত্র্যের কারণ পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন শক্তিগুলি কেবল কেন্দ্রক থেকে দূরত্বের উপরেই নির্ভরশীল নয়।

[illegible], এই নির্ভরশীলতা সবক্ষেত্রে সকল পরমাণু, হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে সত্য। হাইড্রোজেন পরমাণুতে কেন্দ্রকের আকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে আছে কেবলমাত্র একটি ইলেকট্রন। বিপরীত চিহ্নের কিন্তু সমান বৈদ্যুতিক-শক্তিসম্পন্ন দুটি আহিত কণার মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া, এদের মধ্যেও তাই।

এই পারস্পরিক কুলম্ব-সূত্রদ্বারা বর্ণিত। এই ক্রিয়ার শক্তি ইলেকট্রন ও কেন্দ্রকের মধ্যের দূরত্বের উপরেই একমাত্র নির্ভরশীল। তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন মেঘ কেন বর্তুলাকার, তা স্পষ্টভাবে জানা গেল: বর্তুল পৃষ্ঠের সকল বিন্দু কেন্দ্র থেকে সমদূরত্বসম্পন্ন আর আমাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র হল পরমাণু-কেন্দ্রক। সুতরাং, ইলেকট্রন মেঘের সকল বিন্দুতেই সমান ইলেকট্রন শক্তি বিদ্যমান।

কিন্তু যখন পরমাণুতে একাধিক ইলেকট্রন অবস্থান করে, তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে কেন্দ্রকের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার চিত্রটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মত আর সরল থাকে না। এখানে ইলেকট্রনগুলি শুধু কেন্দ্রকের দ্বারা আকর্ষিত নয়, নিজেদের মধ্যে বিকর্ষিত বটে।

স্বভাবতই, যেকোন এক জটিল পরমাণুর বহু ইলেকট্রনযুক্ত পরিবারে সকল ইলেকট্রনই পরিবারের কেন্দ্রমুখে—অর্থাৎ কেন্দ্রকের দিকে—বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়, নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও। প্রকৃতি খুব বুদ্ধিমতীর মত এই পীড়িত বন্ধনের উপর ক্রিয়া করে এবং পারমাণবিক পরিবারে শৃংখলা এনে দেয়।

এই শৃংখলা যে ঠিক কিরূপ, তা আমরা আলোকচিত্রের মধ্যেই দেখতে পাই। ইলেকট্রন মেঘগুলির আকৃতি খুব জটিল এবং এগুলো পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে জট পাকিয়ে। এই চিত্রকে যদি ত্রি-আয়তন দান করে বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রঙ করতে পারতাম, তাহলে এই আশ্চর্য রঙীন বর্ণমণ্ডলীর সামনে আমরা অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। হ্যাঁ, ইলেকট্রন কক্ষের ছিমছাম চিত্র থেকে এগুলো একেবারে অন্য ধাঁচের।

চিত্রগুলি দেখতে হয়ত সুখকর, কিন্তু ইলেকট্রনের এই গোলকধাঁধায় কোথায় যে একটা মেঘের সুরু আর কোথায় যে তার শেষ, তা খুঁজে বের করা নগণ্য কাজ নয়।

পারমাণবিক স্থপতি অর্থাৎ প্রকৃতির কর্মশালায় দৃষ্টিপাত করে দেখা যাক, কিভাবে সে এমন অতিক্ষুদ্র পরমাশ্চর্য সৃষ্টি করে, এই সব সজীব ও কঠিন কাঠামো, যেগুলিকে বলা হয় পরমাণু।

প্রকৃতির হাতে নির্মাণকার্যের উপাদান হল ইলেকট্রন ও কেন্দ্রকসমূহ। তাদের জুড়ে রাখার জন্য কোন্ সিমেন্টের প্রয়োজন তাও আমাদের জানা আছে: বিপরীত আধানসম্পন্ন কেন্দ্রকের প্রতি ইলেকট্রনদের আকর্ষণী বল।

আমাদের স্থপতির কর্মশালায় প্রথমেই মনোযোগ আকৃষ্ট করে এক বিরাট তালিকা—মেণ্ডেলিয়েভের মৌল পদার্থের পর্যাবৃত্ত তালিকা। এ পর্যন্ত তালিকায় ১০৪টি চৌকো বাক্সের স্থান পূরণ হয়েছে অর্থাৎ ১০৪টি মৌল পদার্থ আমাদের গোচরীভূত।

এই প্রতিচিত্রগুলির (ব্লুপ্রিন্ট) সাহায্যেই প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য পারমাণবিক বস্তুসমুদায় গঠন করে। শতাধিক প্রতিচিত্র!

প্রথম দর্শনেই কেবল ওগুলোকে আলাদা আলাদা বলে মনে হয়। আসলে সব চেয়ে হিসাবী স্থপতির চেয়েও প্রকৃতি অনেক বেশী ব্যয়-সংক্ষেপশীল।

সর্বাগ্রে দেখা যাক, কি সেই মৌলিক নিয়ম বা প্রয়োগ করে পারমাণবিক স্থপতি পরমাণুর প্রাসাদের ইটগুলি যথাযথভাবে বসাতে পারে। এই নিয়মটি অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী উল্‌ফ্‌গ্যাং পাউলী আবিষ্কার করেন কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার গোড়াপত্তনের বছরগুলিতে এবং তাঁরই নামে নিয়মটির নামকরণ হয়।

এটি পরমাণু এবং আণুবীক্ষণিক জগতের অন্যান্য বহু কণার সমষ্টির ক্ষেত্রে সমানই প্রযোজ্য। পাউলী নিয়ম বলে: আণুবীক্ষণিক কণাগুলির যে কোন সমষ্টিতে স্বীকৃত শক্তির প্রতিটি স্তর একটির বেশী কণা অধিকার করতে পারে না।

একথা সত্যই ; পরবর্তীকালের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, এই নিয়মটি সামগ্রিকভাবে সার্বজনীন নয় এবং কতিপয় বিশেষ ধরণের আণুবীক্ষণিক কণার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। এই ব্যতিক্রমসমূহের উপর আমরা কোন বক্তব্য রাখব না, শুধু বলব যে, ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে, তা সে যে কোন সমষ্টিই তৈরী করুক না কেন, এই সূত্র কোন সময়েই ভেঙে পড়ে না।

এখানে ইলেকট্রনের সমষ্টি হল পরমাণু। আর একটি পরমাণু ভিন্নতর সমষ্টি তৈরী করে। কিন্তু কোন একটি রাসায়নিক যৌগ পদার্থের প্রতিটি পরমাণুতে ইলেকট্রন পরিবারগুলি সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন।

। ব্যাখ্যাসাপেক্ষ আরেক বিস্ময় ।

মুহূর্তের জন্য ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রবেশ করে আমরা ইলেকট্রনের ঘূর্ণন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। ঘূর্ণনের অর্থ পরে আলোচিত হবে, কিন্তু একটা কথা বলা উচিত যে, এবং তা হল—ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার পটভূমিতে ঘূর্ণনের চিন্তা কল্পনাতীত। ইলেকট্রন ঘূর্ণের আবিষ্কর্তারা খুবই সরলভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এর অর্থ নিজ অক্ষে ইলেকট্রনের পূর্ণাঙ্গ আবর্তন।

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ এবং নিজের অক্ষে আবর্তনও করে। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণ করে এবং নিজের অক্ষে আবর্তনও করতে পারে।

এ পর্যন্ত পরিষ্কার হয়েছে নিশ্চয়, তাই না ? এখন এটা ভুলে যান।

ইলেকট্রন কি কেন্দ্রকের চারপাশে পরিক্রমণ করে ? অবশ্যই না। পরমাণুতে ইলেকটনের গতি অনেক বেশী জটিল। পরিক্রমণের 'ক্ল্যাসিকাল' ধারণায় একে চিত্রস্ফুট করার অর্থ প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিকৃতিসাধন।

ইলেকট্রন কি নিজের অক্ষে আবর্তন করে ? সত্য থেকে এত বেশী দূরে আর কিছুই থাকতে পারে না। একবার ভাববার চেষ্টা করুন, ইলেকট্রনের 'অক্ষ' কি হতে পারে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ইলেকট্রনকে বর্তুলাকার রূপে নয়, বিন্দুরূপে গ্রহণ করে *। বিন্দুর 'অক্ষে'র কোন অর্থই হয় না। তাছাড়া

---

* এও ঠিক বাস্তব চিত্র নয় ; পাঠককে আরও ভাল ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তী অধ্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এর সঙ্গে যোগ করুন বিন্দুটির নিজের চারপাশে বা নিজের উপর 'আবর্তনে'র চিন্তা। ওটা আমরা কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারি না।

আমরা যে অসুবিধায় এখন পড়েছি, তার মূলে আছে এই ঘূর্ণনকে মনশ্চক্ষুর সামনে দৃষ্টিগোচর করার অসম্ভাব্যতা। সত্যি কথা বলতে কি আমরা কখনও কণাতরঙ্গ (ইলেকট্রন) বা তরঙ্গকণা (ফোটন), এদের কোন বিশেষ সন্তোষজনক চিত্র পাইনি।

পারমাণবিক ইলেকট্রনে ঘূর্ণনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় এই তথ্য থেকে যে, ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ (বা ভরবেগের ভ্রামক), যা পারমাণবিক চারপাশে ইলেকট্রনের গতির সঙ্গে সহজাত, তার সঙ্গে আমরা ইলেকট্রনের পূর্ণাঙ্গ গতির উপর নির্ভরশীল কোন একটি সংখ্যা যোগ দিই। অন্য কথায়, ইলেকট্রনটি কেন্দ্রকের সান্নিধ্যে আছে অথবা ধাতুর অভ্যন্তরে আধামুক্ত অবস্থায় কিংবা আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যে শতকরা প্রায় একশোভাগ মুক্ত অবস্থায় আছে। ইলেকট্রনের ঘূর্ণন সর্বদাই সমান এবং সকল সময়েই ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত।

যে কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন হয় ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের (যা কেন্দ্রক পার্শ্বস্থ ইলেকট্রনের গতির উপর নির্ভরশীল) সঙ্গে যোগ দিতে হবে বা তা থেকে বিয়োগ করতে হবে। এই ধারণাকে আরও স্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ করা যায় এইভাবে : ইলেকট্রনের সামগ্রিক কৌণিক ভরবেগের উভয় মানই ইলেকট্রনের বিপরীতধর্মী পূর্ণাঙ্গ গতিগুলির (যে গতিগুলি প্রকৃত-পক্ষে উভয়ের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই ভিন্নতর নয়) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'প্রকৃত-পক্ষে' শব্দটির অর্থ এক্ষেত্রে খুবই বাঁধা ধরা : কোন বাহ্যিক বল দ্বারা অপ্রভাবিত পরমাণুতে উভয় গতিরই শক্তি সম-পরিমাণ।

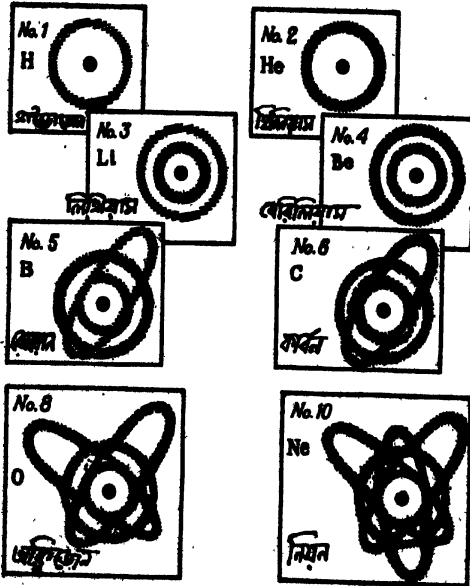
সুতরাং, পরমাণুর মধ্যে স্বীকৃত শক্তির প্রতিটি স্তরে বিপরীত ধর্ম নির্দেশক ঘূর্ণন সহ অবস্থান করতে পারে দুইটি ইলেকট্রন (একটির বদলে)।

॥ কার্যরত পারমাণবিক স্থপতি ॥

এখন আমাদের পারমাণবিক স্থপতির কারখানায় এবং তার প্রতিচ্ছবি-গুলির প্রদর্শনীর দিকে নিকটতর দৃষ্টিপাত করা যাক।

১নং প্রতিচিত্র : হাইড্রোজেন পরমাণু অতি সরল বলে আমরা একে ছেড়ে এগিয়ে যাই। মজার কথা এই যে, ঐ সারল্য উপলব্ধি করতে বিজ্ঞানের দুই শতাব্দী লেগেছিল।

২নং প্রতিচিত্র : হিলিয়াম পরমাণু। এটিও তেমন আকর্ষণীয় বোধ হয় না। আমরা এইমাত্র জেনেছি যে, প্রত্যেকটি ইলেকট্রন মেঘ গঠিত হতে



পারে দুটিমাত্র ইলেকট্রন নিয়েই। এ থেকে বুঝতে হবে যে, হাইড্রোজেনের তুলনায় হিলিয়াম পরমাণু তেমন কিছু ভিন্নতর নয়। বক্তব্যটি প্রমাণ করে দেয় একটি মডেল। ব্যতিক্রমের মধ্যে কেবল ইলেকট্রন মেঘটি দ্বিগুণ ঘন এবং কেন্দ্রকের আরও কাছে। একটির বদলে এক্ষেত্রে রয়েছে দুটি ইলেকট্রন।

লিথিয়াম পরমাণুতে (৩নং প্রতিচিত্র) আমরা হিলিয়ামের প্রথম ইলেকট্রন মেঘসহ একটি গোলাকার দ্বিতীয় ইলেকট্রন মেঘের গঠন লক্ষ্য করি। এটাই স্বাভাবিক, কারণ পাউলী নিয়ম কোন একটি পারস্পরিক শক্তির 'স্তর'-এ দুটির বেশী ইলেকট্রনকে অবস্থানের অনুমতি দেয় না।

দোতলার ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় ভাড়াটে আবির্ভূত হল লিথিয়ামের পরবর্তী পরমাণু 'বেরীলিয়াম'-এ। এখন পর্যন্ত পারমাণবিক গৃহটি সুনিয়ন্ত্রিতভাবেই ভর্তি হচ্ছে।

এবার আমরা ৫নং প্রতিচিত্র 'বোরোন'-এ প্রবেশ করি। পারমাণবিক স্থপতির পক্ষে একে বাগ মানানো ছিল দুরূহ ব্যাপার এমনভাবে পারমাণবিক গৃহে, যাতে সে অন্য ভাড়াটেদের সংস্পর্শে খুব বেশী না আসে। আমরা স্মরণ করতে পারি, পারমাণবিক ভাড়াটেরা একে অপরকে পছন্দ করে না, পারস্পরিক বিকর্ষণ অনুভব করে। তারা সবাই চেষ্টা করে বিপরীত দিকে চলতে।

এক্ষেত্রে আমাদের পারমাণবিক স্থপতির সমাধান ছিল বস্তুতই হাল ফ্যাশানের : পারমাণবিক গৃহের সকল তলার মধ্য দিয়ে একটি ফ্ল্যাট বসিয়ে সে পঞ্চম ভাড়াটেকে তার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এতে স্পষ্টই সে সন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ পরবর্তী প্রতিচিত্রেই (কার্বন পরমাণুতে) আরেকটি ভাড়াটে এই উল্লম্বপ্রায় ফ্ল্যাটে যুক্ত হল।

এর পরের চারটি প্রতিচিত্র-এ নতুন কিছু নেই। ১২০ ডিগ্রী একান্তে দুটি নতুন তলমধ্যবর্তী ফ্ল্যাট প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত করা হল।

ঐভাবেই প্রকৃতি তার ছোট পারমাণবিক গৃহটি বিবদমান ভাড়াটেদের দিয়ে ভর্তি করে তুলল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভাড়াটেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে না ; গৃহটির অটল থাকার পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক। আর তাকে অটল থাকতেই হবে।

পূর্বোক্ত বক্তব্যের অর্থ এই যে, পরমাণুর নির্মাণে প্রকৃতি একটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে। এটি হল শক্তির শ্রেষ্ঠ বিতরণের নিয়ম।

ইলেকট্রনগুলির পারস্পরিক বিকর্ষণে পরমাণুর স্থৈতিক শক্তি বহুলাংশে বর্ধিত হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে কোনো কাঠামো বেশী স্থায়িত্বলাভ করে স্থৈতিক শক্তি কম হলেই। চেয়ার থেকে ভূপতিত হওয়া কোন কৌতুকপ্রদ ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রান্তিতেই আপনার স্থায়িত্ব বেশী, কারণ এখানে কোন স্থৈতিক শক্তি নেই।

পরমাণু জগতেও এই প্রকার স্থায়িত্বলাভের প্রচেষ্টা বর্তমান। সবচেয়ে স্থায়ী পরমাণু সেইটাই, যার স্থৈতিক শক্তি যতদূর সম্ভব কম। পারমাণবিক

কক্ষপথগুলি তৈরীর সময় ইলেকট্রনগুলিকে সুকৌশলে কেন্দ্রকের প্রতি আকৃষ্ট করিয়ে তাদের পারস্পরিক বিরোধ-বিদ্বেষ অতিক্রম করা প্রকৃতির পক্ষে বেশ আয়াসসাধ্য ছিল।

এ পর্যন্ত পরমাণুসমূহে শক্তিসংক্রান্ত নিয়মটি কেবল পারমাণবিক কাঠামোর সূক্ষ্ম আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু এটাই সব নয়। পারমাণবিক ভবনে বাসকক্ষগুলির আরও অনেক খেয়ালীভাগ আছে।

॥ খামখেয়ালী পরমাণু ॥

এ পর্যন্ত আমরা পারমাণবিক ভবনগুলির কাঠামো এবং ভবনগুলি ভরিয়ে পাউলী নিয়ম এবং শক্তির শ্রেষ্ঠ বিতরণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করলুম।

ইলেকট্রনের তরঙ্গ সত্তা কিভাবে নিজেকে প্রতীয়মান করে তোলে? প্রথমতঃ, ইলেকট্রন কক্ষের পরিবর্তে আমরা বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন সম্ভাবনার মেঘগুলিকে গ্রহণ করি। কিন্তু এটাই সব নয়। পরমাণুতে দ্ব্রগলি তরঙ্গগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তারা পারমাণবিক কাঠামোর 'ধারণক্ষমতা'-র নির্ধারণ করে।

স্মরণ করুন ইলেকট্রন মেঘগুলির একটি বৈশিষ্ট্য: তারা কোন পূর্ণ সংখ্যক দি ব্রগলী তরঙ্গকে আশ্রয় দান করে। এই সংখ্যাটি শুধু পূর্বতন কক্ষের 'ক্রমাণুপাতিক নম্বর'ই নির্ণয় করে না, এক এবং সমসংখ্যক দ্য ব্রগলী তরঙ্গকে আশ্রয়দানকারী ভিন্ন ভিন্ন ইলেকট্রন মেঘদ্বারা গঠিত সেই 'সংযুক্ত' ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্বও নির্ধারণ করে।

এই 'সংযুক্ত' ইলেকট্রন মেঘটিকে (আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পারছি যে, কিছু সংখ্যক দ্বৈত মেঘের সম্মিলন) পদার্থবিজ্ঞানীগণ একটি বেমানান নামে ভূষিত করলেন: 'খোলক'। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা খোলকের ধারণ ক্ষমতা (অর্থাৎ খোলকটি সর্বাধিক সংখ্যক যে ইলেকট্রনগুলিকে আশ্রয় দিতে পারে, তাদের সংখ্যা N) এবং খোলকের ক্রমাণুপাতিক নম্বর (অর্থাৎ আশ্রিত ইলেকট্রন তরঙ্গগুলির সংখ্যা n, এই দুইটির মধ্যে সম্পর্কটি খুব সরল আকারে প্রকাশ করা যায়:

$$N = 2n^2$$

অতএব প্রথম খোলক K নামে অভিহিত; $2\times1^2=2$-টি ইলেকট্রন, দ্বিতীয় খোলক L নামে অভিহিত, $2\times2^2=8$-টি ইলেকট্রন। তৃতীয় খোলক M, $2\times3^2=18$-টি ইলেকট্রন। চতুর্থ খোলক N, $2\times4^2=32$-টি ইলেকট্রন। পঞ্চমটি খোলক O, $2\times5^2=50$-টি ইলেকট্রন—এইভাবে চলেছে। এভাবেই খোলকের সঙ্গে ইলেকট্রন সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে।

এই সংখ্যাগুলি মনে রাখবেন। এখন চলুন পারমাণবিক স্থাপত্যের মধ্যে আবার ফিরে যাই। আমরা দেখি, যে খোলকটির-ধারণক্ষমতা সব চেয়ে কম, সেই সবচেয়ে 'ক্ষুদ্র' K খোলকটিই সর্বপ্রথম ভর্তি হয়ে যায়। হিলিয়াম পরমাণুতে ইতিমধ্যেই খোলকটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেছে। প্রকৃত-পক্ষে এই খোলকে একটি মাত্র তলার একটিমাত্র ফ্ল্যাটে অবস্থান করছে দুটি ভাড়াটে।

পরবর্তী খোলকটি বেশী জটিল। এখানে শুধু দোতালাই দখল করা হয়নি, প্রতিটি ফ্ল্যাটে দুটি ইলেকট্রনসহ তিনটি তলমধ্যবর্তী ফ্ল্যাটও আছে। নিওন পরমাণুতে (১০ নং প্রতিচিত্র) এখানকার বাসকক্ষগুলি ভর্তি হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ, নিওন পরমাণু পর্যাবৃত্ত তালিকার দশম স্থান অধিকার করে।

তৃতীয় খোলকটি ১৮টি বাসিন্দাকে আশ্রয় দেয়। পূর্বতন খোলকের মত এই খোলকটিও অনুরূপভাবেই আরগন (১৮ নং) পর্যন্ত ভর্তি হতে থাকে। সর্বপ্রথম তেতলা এবং তারপর তিনটি তলমধ্যবর্তী ফ্ল্যাট ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু আরগনের পরবর্তী মৌল পদার্থ 'পটাশিয়াম'-এ এই কঠোর প্রথাটি ভেঙে পড়ে।

এক্ষেত্রে পাঁচটি তলমধ্যবর্তী ফ্ল্যাট ভর্তি করতে হবে, কিন্তু বিন্যাসপ্রথাটি ভিন্নতর। প্রথম তিনটি তলমধ্যবর্তী ফ্ল্যাটের চেয়ে এগুলি সংকীর্ণতর এবং আরও দীর্ঘায়ত। নতুন ভাড়াটে এই প্রকার অসুবিধাজনক ফ্ল্যাটে অবস্থান করতে অপারগ এবং উন্নততর বাসস্থল দাবি করে।

অবশেষে স্থপতি তাকে চারতলার নতুন ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয়। আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরবর্তী ক্যালসিয়াম পরমাণুতে তার সঙ্গে আরেকটি ইলেকট্রন যোগ করা হয়।

এটা অবশ্যই শক্তির শ্রেষ্ঠ বিতরণের একটি নিয়ম। আসল কথা হল, যদি কোন ইলেকট্রন নিম্নতর তলাটি সম্পূর্ণভাবে ভর্তি না করেই পরবর্তী

[illegible] অবস্থান সুরু করে তবে প্রসূত হয় একক আরো হাল্কা পরমাণু। এ ধরণের পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলির বিকর্ষণের বৈদ্যুতিক শক্তি অনেক কম।

কিন্তু তারপরেই প্রকৃতি পুরাতনপ্রথায় ফিরে যায়। স্ক্যাণ্ডিয়াম (২১ নং) থেকে তামা বা 'কপার' (২৯ নং) পর্যন্ত নয়টি পরমাণুতে নতুন ভাড়াটেরা ঐ দীর্ঘ, সংকীর্ণ এবং অস্বস্তিকর ফ্ল্যাটে আবদ্ধ থাকে।

উচ্চতলায় ইলেকট্রনসমন্বিত এবং নিম্নতলায় শূন্য ফ্ল্যাটে বিশিষ্ট এই পরমাণুগুলি বেশ কিছু অস্বাভাবিক গুণলাভ করে। এগুলিকে 'ব্যতিক্রমী' বলা হয়, এরা মধ্যে মধ্যে দেখা দেবে।

যথাযথ নিয়মানুগভাবে দেখলে তৃতীয় খোলকটি 'নিকেল'-এর (২৮ নং) ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে ভর্তি হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু পূর্বতন খোলোকটি ভর্তি না করেই প্রকৃতি পরবর্তী খোলকে ইলেকট্রন অবস্থান সুরু করে দেয়, সেই কারণেই তৃতীয় খোলকটি সম্পূর্ণভাবে ভর্তি হতে পারে একমাত্র দস্তা 'জিংক' (৩০ নং)।

এর পরও কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়না। পরবর্তী খোলকটি শুরু করার আগেই পূর্বতন খোলকটি সম্পূর্ণভাবে ভর্তি হতে পারে না। স্ক্যাণ্ডিয়াম থেকে তামা শ্রেণী পর্যন্ত যা ঘটেছিল ঠিক সেইটিই পুনরাবৃত্ত হয় ইট্রিয়াম (৩৯ নং) থেকে প্যালাডিয়াম (৪৬ নং) এবং ল্যান্থানাম (৫৭ নং) থেকে ইটারবিয়াম (৭০ নং পরমাণুর গ্রুপে)। তারপর থেকেই শেষ পরমাণু (১০৪) পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরমাণুরই থাকে ত্রুটিপূর্ণ (যাকে বলে) ভাড়াটিয়া স্বভাব-সুলভ নিয়মাবলী; এমনও হয় যে, দুই বা তিনটি খোলককেও বাসিন্দার জন্য থাকতে হয় প্রতীক্ষারত। কেন তারা পরিপূরক ইলেকট্রনগুলি কখনও পায়না, তার কারণ বিবৃত করা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

এখানে কিছুটা প্রতিসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে কিন্তু শক্তির দিক থেকে এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

সুতরাং ইলেকট্রন সংখ্যা এবং পারমাণবিক কাঠামোর বিন্যাস নির্ণয়কারী [illegible] সূত্রটি যে সর্বশক্তিমান হয় না, এ সত্যটি প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে। এই সূত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী পারমাণবিক সূত্র দ্বারা প্রায়ই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়, সেটি হল পারমাণবিক কাঠামোর স্থায়িত্বের সূত্র।

আসুন আমরা মৌলপদার্থের পর্যাবৃত্ত তালিকায় গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে পারমাণবিক স্থপতির কারখানায় আমাদের পর্যটন শেষ করি।

বাঁদিকে রয়েছে সাতটি পর্যায়—প্রথমটিতে ২-টি, দ্বিতীয়টিতে ৮-টি, তৃতীয়টিতেও ৮-টি, চতুর্থ এবং পঞ্চমটিতে ১৮-টি, ষষ্ঠটিতে ৩২-টি [এর মধ্যে আছে তালিকার নিম্নভাগে অবস্থানকারী বিরল মৃত্তিকা বা ল্যান্থানাইড্‌ এবং সপ্তমটিতে ১৭-টি [পূর্বেই বলেছি এর কারণগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হবে]।

এখন চলুন, আমরা ইলেকট্রন খোলকের ধারণ-ক্ষমতার বর্ণনাপ্রদানকারী সংখ্যাগুলিতে অর্থাৎ ২, ৮, ১৮, ৩২, ইত্যাদিতে ফিরে যাই। এই সংখ্যাগুলি তালিকার পদার্থসংখ্যার সমান। কিন্তু তাহলে কোন কোন সংখ্যা পুনরাবৃত্ত হচ্ছে কেন: ২, ৮, ৮, ১৮, ১৮, ৩২ [আপাততঃ আমরা সর্বশেষ পর্যায়কে উপেক্ষা করছি]। পরমাণুতে ইলেকট্রন ভর্তির বিন্যাসপ্রথায় যে সকল বিযুক্তি ঘটে, সেই একই বিযুক্তির ফল হল এই পুনরাবৃত্ত সংখ্যাগুলি এবং সেজন্যই তৃতীয় পর্যায়কাল নিকেলের [২৮ নং] পরিবর্তে আরগনে [১৮ নং] সমাপ্ত হয়। তারপর থেকেই এই পালাবদল [এবং ইলেকট্রন ভর্তির অনুক্রম লংঘনের দরুণ অন্যান্য পরিবর্তন] পর্যায়ক্রমিক তালিকার শেষ পর্যন্ত সম্প্রসারণলাভ করে।

ফলতঃ, আমরা খোলক ও পর্যায়গুলির মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ ও সহজ সাদৃশ্য পাই না। কিন্তু কোন পর্যায়ের ধারণক্ষমতা কখনও উক্ত পর্যায়ে অবস্থিত পরমাণুর খোলকের ধারণক্ষমতাকে অতিক্রম করে না। সুতরাং কোয়ান্টাম চিত্রটি মৌল পদার্থের পর্যায়-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণ দেয়।

এখন তালিকার উপরভাগে তাকিয়ে দেখুন। এখানে রয়েছে I থেকে VIII গ্রুপ এবং তারপর শূন্য। স্কুলজীবনের রসায়নজ্ঞান থেকে আমরা বলতে পারি, এগুলি পদার্থের 'যোজ্যতা'-র নির্দেশক।

খুব সঠিকভাবে দেখলে এই বক্তব্য নির্ভুল নয়। প্রথমতঃ, এগুলি নিছক

যোজ্যতা নয়, ক্লোরিন-সম্পর্কিয় যোজ্যতা [অথবা হাইড্রোজেন সম্পর্কিয় যোজ্যতা]। দ্বিতীয়তঃ যোজ্যতার অর্থ কি?

স্কুলে যোজ্যতা বলতে আমাদের শেখান হয়েছিল, কোন মৌল পদার্থের পরমাণুর সেই সংখ্যা ইত্যাদি। আজ এই আদিম চিন্তাধারা টেস্ট টিউবে তরল পদার্থ ঢেলে বুনসেন বার্ণারে উত্তপ্ত করার পেছনে যে বর্ণনামূলক রসায়ন কেবল তারই অন্তর্গত। তত্ত্বপ্রধান রসায়ন পদার্থবিদ্যাগত ভিত্তি লাভ করেছে বহুকাল।

যোজ্যতা, অথবা আরও সঠিকভাবে ক্লোরিন-সম্পর্কিয় যোজ্যতা, পরমাণুর বহির্মুখী খোলকে [অর্থাৎ যেটি কেন্দ্রক থেকে সবচেয়ে দূরে] অবস্থানরত ইলেকট্রন সংখ্যাকেই প্রকাশ করে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পর্যায় তালিকায় কেবল শেষ দুটি স্তম্ভকে বাদ দিলে, যোজ্যতা এবং গ্রুপ সংখ্যা একাত্ম। সর্বশেষ স্তম্ভের উপর VIII লিখলে এবং তার দ্বিতীয় থেকে শেষ স্তম্ভের উপর ০, ১, ২, সংখ্যাগুলিকে লিখলে সঠিকতর হত। এর পেছনে বেশ সবল যুক্তি আছে।

আরেকটি প্রশ্ন: পরমাণুর বহির্মুখী খোলকে কেন আটটার বেশী ইলেকট্রন কখনও পাওয়া যায় না? পরমাণুর অভ্যন্তরে 'বাসস্থলে'র বিতরণ প্রথা স্মরণ করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথম খোলকটি ২-টি ইলেকট্রনের আশ্রয়দাতা, দ্বিতীয়টি ৮-টির; তৃতীয়টির ক্ষেত্রে ১৮ হওয়া উচিত কিন্তু এই গঠনপ্রথা সাময়িকভাবে থেমে যায় আরগনের পরেই, যখন সর্বাধিক দূরবর্তী খোলকে অবস্থান করছে ৮-টি ইলেকট্রন। এর পরেই বহির্মুখী খোলকটির সংখ্যা চতুর্থ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্তরস্থিত তৃতীয় খোলকটি ভর্তি হতে থাকে। একই ঘটনা ঘটে চতুর্থ খোলকের ক্ষেত্রে এবং এভাবেই ঘটনাপরম্পরা এগিয়ে চলে।

বহির্মুখী খোলকটি আটটি ইলেকট্রনকে আশ্রয় দেবার পর সেই খোলকে অধিকতর ইলেকট্রনের যোগদান ক্ষতিকারক। কিন্তু তারপরেই একটি নতুন খোলকের আবির্ভাব ঘটে এবং অপূর্ণ খোলকটি চলে আসে পরমাণুর গভীরে। এখন এই অন্তরস্থিত খোলকে পরিপূরক সংখ্যক ইলেকট্রন আশ্রিত হল কিনা তা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আমাদের নেই, কারণ পরমাণুর বহির্মুখী খোলকটিই তার রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ণয় করে।

সুতরাং বহির্মুখী খোলকে ইলেকট্রন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু-গুলি আট প্রকার সম্ভাব্য রাসায়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে। অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে এখানে বলা প্রয়োজন, খালি বা অর্ধখালি 'ফ্ল্যাট' যুক্ত খোলকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভর্তি আট-ইলেকট্রন খোলকের স্থৈতিক শক্তি অনেক কম। তার অর্থ এই, যে পরমাণুতে সেইপ্রকার খোলক বর্তমান তাদের পরমাণু অতিস্থায়ী, রাসায়নিকভাবে স্থায়ী তো বটেই।

বহির্মুখী খোলকে পরিপূরক ইলেকট্রনযুক্ত পরমাণুগুলি এতবেশী 'উচ্চ-বংশীয়' যে, তারা সাধারণ স্তরের পরমাণুসমূহের সঙ্গে সকল প্রকার যোগাযোগ বর্জন করে। যে কারণে তাদের নাম: 'উচ্চবংশীয়' বা 'নিষ্ক্রিয়'। তারা পর্যাবৃত্ত তালিকার সর্বশেষ স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত।

পারমাণবিক জগতের 'অভিজাতবর্গ' ঘুরে বেড়ান 'সাধারণ মানুষে'র চারপাশে, যারা তাঁদের সর্বপ্রকারে অনুকরণের চেষ্টা করে। 'সাধারণ' পরমাণুগুলি আট-ইলেকট্রন সমষ্টিতে তাদের বহির্মুখী খোলকটি ভর্তি করার জন্য যে কোন উপায়ে প্রয়াস চালায়।

কিন্তু এই কাজটা যেহেতু একা নিজেদের পক্ষে সম্ভব নয়, সে কারণে তারা প্রতিনিয়তই থাকে সঙ্গীর খোঁজে। এর ফলেই উদ্ভূত হয় এমন কিছু যাকে রসায়নবিদেরা বলেন বিক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে এটি এক ধরণের আত্ম-ত্যাগ: একজন তার পরণের পোশাক অন্যকে দান করে নিজে থাকে পুরোদস্তুর উলঙ্গ। যদিও ঠিক তা নয় এবং তাছাড়াও এই অবস্থা কেবল নিওন পরবর্তী পরমাণুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন সোডিয়াম ও ক্লোরিনের মধ্যে একটি বিক্রিয়া যার পরিণতিতে গঠিত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড, অর্থাৎ লবণের এক অণু। সোডিয়াম পরমাণুর তৃতীয় বহির্মুখী খোলকে একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন বর্তমান। পক্ষান্তরে ক্লোরিন পরমাণুর বহির্মুখী খোলকে রয়েছে সাতটি ইলেকট্রনের প্রাচুর্যপূর্ণ সমষ্টি। সোডিয়াম প্রসন্নচিত্তে তার একমাত্র ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং তার ফলেই ক্লোরিন আট-ইলেকট্রনের বহির্মুখী খোলকের 'উচ্চপদস্থ' কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করে।

কিন্তু সোডিয়ামের ক্ষেত্রেও লাভ হয়েছে। পরিপূরক আট ইলেকট্রনের উপস্থিতিতে সে ধারণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের রূপ। এক নিমেষেই

[illegible]

[illegible] যে [illegible] ঐক্যবদ্ধভাবে বাহুতে অবস্থান করবে।

এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরমাণুসমূহকে প্রদানকারী ও গ্রহণকারী এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। বহির্মুখী খোলকে চারটির কম ইলেকট্রন যাদের আছে, তারা প্রদানকারী। যাদের রয়েছে চারটির বেশী ইলেকট্রন, তারা গ্রহণকারী। স্বভাবতই ছ'টি ইলেকট্রন প্রদান করার চেয়ে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করা অনেক সহজ (এবং এই পরিস্থিতিই ঘটে অক্সিজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে)।

IV গ্রুপে আমরা কিছু সংখ্যক 'কুঁড়ের সর্দার' দেখতে পাই। বহির্মুখী খোলকে চারটি ইলেকট্রন নিয়ে তারা কি করবে বুঝতে পারে না, অর্থাৎ ইতস্ততঃ বোধ করে……। আর তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'এ্যাম্ফোটেরিক,' যার অর্থ কিছুটা একদিকে ঝোঁক এবং কিছুটা অন্যদিকে ঝোঁক। এই মৌল পদার্থগুলি প্রায় যে কোন ধরনের রাসায়নিক আচরণ প্রদর্শনে সক্ষম।

এখন VIII গ্রুপে আমরা আমাদের 'খামখেয়ালী' পরমাণুগুলির সন্ধান পাই। আসলে তাদের সেখানে থাকাই উচিত নয়, যেহেতু তাদের বহির্মুখী খোলকে একটা বা খুব বেশী হলে দুটি ইলেকট্রন অবস্থান করছে। ব্যাপারটা হল: অন্তরস্থিত খোলকটি বহির্মুখী খোলকের ইলেকট্রনগুলির আচরণের উপর এক ধরণের সূক্ষ্ম এবং অত্যধিক জটিল প্রভাব বিস্তার করে: এই পরমাণুগুলি একান্ত অভাবনীয় কাজ করে ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের যে কোন একটি পরমাণুতে থাকে বিভিন্ন যোজ্যতা, একটি বিশেষ বিক্রিয়ায় এক যোজ্যতা, অপর এক বিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর যোজ্যতা। অন্যদিকে VIII গ্রুপে রাখার একমাত্র কারণ এই যে, অক্সিজেনের সম্পর্কে তাদের সর্বোচ্চ যোজ্যতা হতে পারে ৮, যার অর্থ, এ ধরণের যে কোন একটি পরমাণু নিজের সঙ্গে চারটি অক্সিজেন পরমাণু জুড়তে পারে।

কিন্তু এ কথা ভাববেন না যে, পর্যাবৃত্ত তালিকার অক্লান্ত চৌকো খাপে ঢুকিয়ে রাখা অজস্র 'খামখেয়ালী' পরমাণুগুলির আচরণ কিছু উন্নততর। [illegible] না, চাতুর্য ঠিক তাদের VIII গ্রুপের পড়শীদের চাতুর্যের মতই।

[illegible] নিজেদের যৌগ পদার্থের তালিকা একে প্রতিফলিত করে না [illegible]

[illegible]
হয়েছিল যখন পরমাণুর বিকিরণ পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না। আজকে বিজ্ঞানীরা তাদিকাটি অতিশীঘ্র পরিবর্তিত করতে অনিচ্ছুক যেহেতু বৈপরীত্যপ্রদর্শনকারী মৌল পদার্থের আচরণ সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই আমরা বুঝি না। যখন সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, তখনই……।

॥ বর্ণালীর জন্ম ॥

এখন যখন কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার নতুন আলোকে আমরা পরমাণুকে দেখেছি তখন তার বিকিরণ ক্ষমতা কিভাবে কার্যকরী হয় তা শিখতে পারি। স্মরণযোগ্য যে, বোর তত্ত্ব পারমাণবিক বর্ণালীসমূহের উৎসটিকে ব্যাখ্যা করলেও বর্ণালী সম্বন্ধীয় সূত্রগুলির কোন নির্ভুল ধারণা দিতে পারেনি। বিশদভাবে পূর্ণাঙ্গ চিত্রাংকণের দায়িত্ব পড়ল কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার উপর।

বর্ণালীসমূহের উৎপত্তির হেতুপ্রদর্শনে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা মূলতঃ বোর তত্ত্বের সঙ্গে একমত। এক শক্তি স্তর থেকে অপর স্তরে পারমাণবিক ইলেক্ট্রনের লম্ফ-ঝম্ফের সময় এই শক্তিগুলির বিয়োগফল বিদ্যুৎচুম্বক শক্তির কোয়াণ্টাম, ফোটনরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। এটাই অবশ্য সব নয়।

কোথা থেকে কোথায় ইলেকট্রনগুলি লাফাতে পারে? যতদিন ইলেকট্রন-কক্ষের ধারণা পরিত্যক্ত হয়নি ততদিন ব্যাপারটা কল্পনা করা ছিল সহজ: উল্লম্ফন ঘটে এক কক্ষ থেকে অপর একটি কক্ষে। যদি শক্তিহ্রাস হয়, একটি ফোটন জন্মলাভ করে। যদি শক্তিবৃদ্ধি ঘটে, অন্য কোন ক্ষেত্রের শক্তির কোয়াণ্টাম বা ফোটন লাফ সুরুর পূর্বমুহূর্তে বিশোষিত হয়েছে।

কিন্তু কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা কক্ষগুলির স্থলে বসাল ইলেকট্রন মেঘকে। এখন ইলেকট্রনগুলির সংক্রমণ মানসপটে চিত্রাংকণ করা সহজসাধ্য নয়। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন মেঘের আকার ও ভঙ্গীর ক্ষণিক পরিবর্তন হিসাবেই এটাকে কল্পনা করিতে হবে। ফোটনের বিশ্লেষণ বা নির্গমন পারমাণবিক 'মেঘটিকে' কাঁপিয়ে তুলে একটি সামগ্রিক নতুন আকৃতি সৃষ্টি করে।

ইলেকট্রন লম্ফের বর্ণনায় কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা চিত্রগত দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করল, কিন্তু অর্জন করল একটি নতুন [illegible] সম্ভাবনা। [illegible]

[illegible] থেকে অন্যে ইলেকট্রন লাফ সর্বদাই অভুত [illegible] [illegible] সম্ভাবনা কোনক্রমেই অঙ্কের বিশেষত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। স্বভাবেই তত্ত্বটি ব্যর্থ হয়।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এটিকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিপন্ন করে। ইলেকট্রন লম্ফের সম্ভাবনা যে লম্ফের পূর্বের ও পরের ইলেকট্রনের দ্বারা গঠিত ইলেকট্রন মেঘের আকৃতির উপর নির্ভরশীল, তা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই পরিস্থিতিতে, মোটামুটি বলতে গেলে, লম্ফের সম্ভাবনাটি আরও বেশী যেখানে মেঘগুলির অধিক্রমণ আরও জোরালো এবং পরিব্যাপ্ত বা অন্তর্মিশ্রণ গভীরতর।

আলংকারিকভাবে বলতে গেলে ইলেকট্রন এক স্তর থেকে অপর স্তরে লাফাতে পারে, ঠিক যেমন একটি চলন্ত ট্রেন থেকে একজন যাত্রী অপর ট্রেনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, যখন উভয় ট্রেন উভয়ের পাশে এসে পৌঁছয়। সাদৃশ্যটিকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হলে যাত্রীটির ঝাঁপাবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি থাকা দরকার, ট্রেন দুটিকে পাশাপাশি থাকতে হবে, ট্রেনগুলি যত লম্বা হবে (অর্থাৎ তাদের পাশাপাশি অবস্থানের দীর্ঘতা যত বাড়বে) এবং যত কাছাকাছি থাকবে, যাত্রীটির পক্ষে সংক্রমণও হবে ততই সহজতর।

পরমাণুতে প্রায় এমনই প্রক্রিয়া ঘটে। এখানে 'ট্রেনগুলি' ধারণ করেছে ইলেকট্রন মেঘের রূপ; আমরা জানি, এই সকল মেঘের আকৃতি প্রভূত বৈচিত্র্যপূর্ণ, বর্তুলাকার, সিগারসদৃশ, ইত্যাদি।

ইলেকট্রন মেঘগুলির আকৃতি বিচার করলে বেশ কিছু সরল (সাধারণ অর্থে সরল) সম্বন্ধ পাওয়া যায়। একটি সাধারণ কেন্দ্র (পারমাণবিক কেন্দ্রক)-সহ দুটি গোলাকার মেঘ খুব সামান্যই পরিব্যাপ্ত হয়; আমাদের এ কথা বলারও বেশ অধিকার আছে যে, তারা এমন কি সংস্পর্শেও আসে না। আর অর্থ, ক্রমানুসারী স্তরের মধ্যে কোন ইলেকট্রন লম্ফ হতে পারে না। এখন একটি বৃত্তের মধ্যে একটি সিগারসদৃশ মেঘ ঢুকিয়ে দিন; সিগারটি যত বেশী সরু এবং ছোট হবে, ততই তারা বেশী পরিব্যাপ্তিলাভ করবে। দুটি সিগারও অধিক্রমণ করতে পারে, কিন্তু সেখানে জ্যামিতিক প্রণালী অনেক বেশী জটিল। একটি নিয়ম অবশ্য পরিষ্কার এবং তা হল এই যে, ছোট

[illegible] এবং [illegible] নিয়মগুলি [illegible] ও [illegible] নিয়মের চেয়ে [illegible]-
ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়।

ঠিক তেমনিভাবেই একটি বৃত্তাকার মেঘ থেকে দীর্ঘায়ত মেঘে অথবা দুটি দীর্ঘায়ত মেঘের মধ্যে ইলেকট্রন লম্ফের সম্ভাবনা আমরা পেতে পারি। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন সংক্রমণকে যে সব সূত্র অধিক সম্ভাব্য ও কম সম্ভাব্যরূপে বিভক্ত করে, সেগুলি কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় নির্বাচনের নিয়ম হিসাবেই পরিচিত।

কোয়ান্টামওয়ালারা খুব কঠোরভাবে এই নিয়মগুলি তৈরী করেছেন: কোন কোন লাফ অনুমোদিত, আবার কোন কোনটা কম-সম্ভাব্য বলে নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতি এই নিষেধ মানে না।

হাল্কা পরমাণুর ক্ষেত্রে কম ইলেকট্রন বর্তমান থাকায় দরুণ তাদের মেঘগুলির প্রতিচ্ছেদ বেশ বিরল হয়ে দাঁড়ায়; মোটামুটি সতর্কভাবে তাই নির্বাচন নিয়ম পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভারী, বহুসংখ্যক ইলেকট্রনযুক্ত পরমাণুতে মেঘগুলির প্রচণ্ড বিশৃংখলার মধ্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সীমাবদ্ধতা ও নিষিদ্ধকরণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভেঙে পড়ে।

ইলেকট্রন মেঘের খেয়ালী ও দ্রুত পরিবর্তিত শিহরণে ইলেকট্রনগুলির এই লম্ফঝম্ফের জন্য ফোটনের জন্ম হয়। এই ফোটনগুলি বর্ণালী-বিশ্লেষকে (স্পেক্‌ট্রোস্কোপ) প্রবেশ করে, বিভিন্নভাগে বিভক্ত হয় এবং রামধনুর সকল রঙের বর্ণালী রেখা সৃষ্টি করে। এক সেকেণ্ডে পরমাণু যত বেশী ফোটন নির্গত করবে, রেখাগুলি ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পরমাণুর সংখ্যা যদি অপরিবর্তিত থাকে, বর্ণালী রেখাগুলির উজ্জ্বলতা কেবল একটি বস্তুর উপর নির্ভর করে—পরমাণুতে ইলেকট্রন লম্ফনের কম্পাংক। আর এই কম্পাংক, আমরা ইতিমধ্যেই জানি, লম্ফনের সম্ভাবনার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন মেঘের ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা আছে, কয়েকটির বেশী এবং কয়েকটির প্রায় শূন্য।

প্রত্যেক ফোটন শক্তি ও বর্ণালী রেখা কোনো সম্ভাবনা ও উজ্জ্বলতার প্রতিনিধিত্ব করে। ঐভাবে বিভিন্ন উজ্জ্বলতার বেশ কিছু সংখ্যক রেখাযুক্ত একটি পারমাণবিক বর্ণালী রূপলাভ করে।

[illegible] আর বর্ণনা করা সহজ. কিন্তু ইলেকট্রন মেঘগুলির প্রতিচ্ছেদ

পরনা করা এবং তার ভিত্তিতে ইলেকট্রন লম্ফনের সম্ভাবনা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ কাজ। তথাপি এই সমস্যাকে চমৎকারভাবে সমাধান করে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা দৃশ্যমান বর্ণালীর সঙ্গে পরমোৎকৃষ্ট মিল খুঁজে পেল। বর্ণালী-বিশ্লেষণের অট্টালিকা এখন নিশ্চিতভাবেই একটি গ্র্যানাইট বুনিয়াদের উপর দণ্ডায়মান।

॥ স্থূল রেখা ও যুগ্ম রেখা ॥

মনে হতে পারে যে, বর্ণালী-ওয়ালারা অবশেষে এখন সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আসলে তা ঘটেনি। বর্ণালী বিশ্লেষণের প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুত উন্নত এবং ব্যবহারিক যন্ত্রগুলি আরও শক্তিশালী ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠল। তারপর বর্ণালী বিদ্যাবিশারদবৃন্দ তাত্ত্বিকদের কাছে দুটি নতুন প্রশ্ন নিয়ে এলেন।

ফোটন কি একটি মাত্র কম্পাংকের রেখা, অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে বর্ণালী বিশ্লেষকের আলোকচিত্রের প্লেটে রেখাগুলি সরু না হয়ে প্রশস্ত হয় কেন?

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার আবির্ভাবের আগে হলে এই অতিসরল প্রশ্নটি নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানীগণ বহু বছর ধরে মাথা ঘামাতে পারতেন। এখন একটুখানি সামান্য চিন্তার প্রয়োজন হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ, ইলেকট্রনের তরঙ্গ-গুণাবলী ও তার স্থায়ী প্রত্যঙ্গ অনিশ্চিত সম্পদের মধ্যেই নিহিত।

আমরা আগেই বলেছি, কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের অতিবিশেষ শক্তি আছে। তাহলে অনিশ্চয়তা কোথায় আসে? প্রারম্ভিক শক্তিটি যদি একটি বিশেষ শক্তি হয়, চূড়ান্ত শক্তিটিও তাই; তাদের বিয়োগফলও যা ফোটন শক্তিকে প্রতিফলিত করে, নিশ্চিতভাবেই সম্পূর্ণ নির্ভুল সংখ্যা হবে! এখানে কোন কারণে একটু গোলমাল আছে। সঠিক শক্তিস্তরগুলি ইলেকট্রনসমূহের স্থিরকৃত অবস্থা (অন্যথায় স্থায়ী অবস্থা), যে অবস্থানগুলি পরিবর্তিত হয়না—সেই অবস্থাকেই বোঝায়। এখন ইলেকট্রন লম্ফন স্বভাবতই কোন স্থায়ী অবস্থার লঙ্ঘন। যেই এই অবস্থা ঘটে হাইজেনবার্গ ভ্রাতার্কের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

লম্ফনগুলির মধ্যে মধ্যে ইলেকট্রনের জীবনকাল কি? যেহেতু এটা

পরিবর্তনসাপেক্ষ, আমরা এটিকে Δt গ্রহণ করতে পারি। ১১৩ পৃষ্ঠার সূত্র থেকে আমরা তৎক্ষণাৎ ফোটন শক্তির অনিশ্চয়তা পেতে পারি :

$$\Delta E \backsim \frac{h}{\Delta t}$$

যার সাহায্যে শক্তি কোয়ান্টাম প্ল্যাংকসূত্র ব্যবহার করে ফোটনের কম্পাংকের অনিশ্চয়তায় সহজেই চলে যাওয়া যায়। এই অনিশ্চয়তা পরমাণুতে 'স্থায়িত্বশীল জীবনকালের সময়ের' সঙ্গে খুব সরলভাবে সম্বন্ধযুক্ত :

$$\Delta \omega \backsim \frac{1}{\Delta t}$$

অন্য কথায়, পরমাণুতে ইলেকট্রনের জীবন যত 'স্থায়ীত্বশীল' ও প্রশান্ত থাকবে, বর্ণালী রেখাগুলি হবে ততই সংকীর্ণতর (যেহেতু এই রেখাগুলি অন্যান্য অবস্থায় সংক্রমণ বোঝায়) ; এর বিপরীত ব্যাপারটিকেও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। সেই কারণেই উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক পারমাণবিক ইলেকট্রন যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, বর্ণালী রেখাগুলি প্রশস্ততর হয় এবং প্রলেপযুক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি সংযুক্ত ছিল এই সত্যের সঙ্গে যে, বহুসংখ্যক বর্ণালী রেখা, যেগুলি একটিমাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর বিন্যস্ত বলে মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে অতি নিকটবর্তী বহুসংখ্যক রেখার অবস্থায় বাস্তবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। বর্ণালী রেখার এই সূক্ষ্ম কারুকার্য কেবল সাম্প্রতিককালের বর্ণালী কৌশলের উন্নয়নের দরুনই প্রকাশ লাভ করল।

সুতরাং একই অবস্থা থেকে ইলেকট্রন লম্ফন বিভিন্ন (যদিও পার্থক্য হতে পারে সামান্যই) শক্তিসম্পন্ন ফোটন সৃষ্টি করতে পারে। তাই পদার্থবিজ্ঞানীরা যে পরমাণুতে ইলেকট্রন শক্তির সঠিক নির্ণয় করতে পারেন—এ তথ্যটি নিছক বড়াই করা ছাড়া যে আর কিছু নয় তা বেরিয়ে পড়ল।

পদার্থবিজ্ঞানীগণ বিক্ষুব্ধভাবে এই সন্দেহ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন, কিন্তু এর জন্য তাঁদের ঘূর্ণনের চিন্তাকে আনয়ন করতে হল। বর্ণালীসমূহের এই 'সূক্ষ্ম গুচ্ছে'র জন্যই ঘূর্ণন আবিষ্কৃত হয়।

যখন বর্ণালীসমূহ উৎপন্ন হয়, বিপরীত ঘূর্ণন সমন্বিত দুটি ইলেকট্রনের সম-অবস্থা আসলে ঠিক 'সমান' নয়। এখানে কৌণিক ভরবেগ ও ঘূর্ণনের মধ্যে সূক্ষ্ম পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে হলে অনেক দূরে চলে যেতে

হবে ; এই কাহিনীর কিছু অংশ পরে জানানো হবে। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে, এই কারণেই ভিন্ন ঘূর্ণনসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলির সামান্য ভিন্ন শক্তি থাকে। এ জন্য বর্ণালী রেখার যুগ্মতা দেখা দেয় : একটি রেখার ক্ষেত্রে দুটি সম-উজ্জ্বল যুগ্ম রেখার সন্ধান পাওয়া যায়।

একথা সত্য, এই যুগ্ম রেখাগুলি ইলেকট্রন খোলকে কেবল একটি ইলেকট্রন থাকলেই সাধারণতঃ জন্মলাভ করে। যদি এই খোলকে ইলেকট্রনের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তাহলে পূর্বতন বর্ণালী রেখার তৃতীয়, চতুষ্টয় বা আরও বড় পরিবার গঠিত হয়। মানব পরিবার থেকে ভিন্নতর এই রীতি পারমাণবিক জগতে প্রায়শই দেখা যায়।

ঐভাবেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বর্ণালী-তাত্ত্বিকদের দুটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল।

এখানেই পরমাণুর কাহিনী সম্পূর্ণ হল। এরপর থেকে আমরা পারমাণবিক পরিবারের জীবন নিয়ে আলোচনা করব—অণু ও কেলাস-আকারে পারমাণবিক সমরবাহিনীর ইতিবৃত্ত।

॥ পরমাণুদের বিবাহ ॥

স্মরণ করুন, কিভাবে সাধারণ পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় মৌল পদার্থগুলির অভিজাত পরমাণুসমূহের অনুকরণের চেষ্টা করে। দামী বস্ত্রগুলি জোড়ে জোড়ে ভাগ করা হয়। কখনও কখনও তিন, চার, বা আরও বেশী অংশীদার যোগ দেয়।

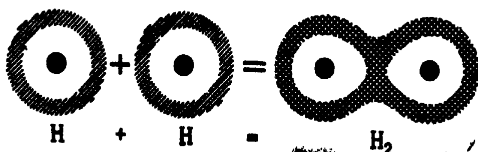
দূর থেকে এই চাতুর্য ভালভাবেই সফল হয়। একটা পুরো অণু এক এক সময় পরমাণুর ভীড়ের মধ্যে নিষ্ক্রিয় মৌল পদার্থের পরমাণুর মত অবিচলিত ভাবে চলে যেতে পারে। কিন্তু কাছের থেকে দেখলে প্রতারণাটা সহজেই ধরা পড়ে।

পরমাণুর বদলে অণুতে অত্যধিক বস্ত্র পরিহিত এবং বস্ত্রহীন পদার্থ অবস্থান করে, যাদের যথাক্রমে ঋণাত্মক আয়ন ও ধনাত্মক আয়ন বলা হয়। ইলেকট্রন বস্ত্রের নতুন বন্টনে, সঙ্গিনীর কাছ থেকে পোষাক গ্রহণ করে কোন পরমাণু সঙ্গিনীকে ছাড়তে চায় না। আর বস্ত্রহীন সঙ্গিনীও একা থাকতে সংকোচ বোধ করে। এই একত্র বসবাসের ফলে উদ্ভূত হয় আয়নীয় অণু। এ

ধরণের অণুতে জোড় বাঁধবার শক্তিগুলি প্রধানতঃ বিপরীত বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন আয়নের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের শক্তি। এ পর্যন্ত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কোন কর্তব্যই নেই।

আয়নীয় অণুগুলির প্রভূত বৈচিত্র্য আছে। পর্যাবৃত্ত তালিকার বাঁদিকের পরমাণুগুলি দক্ষিণদিকের পরমাণুদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। তালিকার মধ্যে নিজেদের অবস্থান পরস্পর থেকে যত দূরে হবে, পরিবারটিও হবে ততোধিক দৃঢ়সংবদ্ধ। আর যখন পরমাণুগুলি নিকটবর্তী গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয়, পরিণয় তেমন শক্তিশালী হয় না।

কিন্তু এত বড়ই আর একটি অণুগোষ্ঠি আছে, যার অণু তৈরী হয় পরমাণুদের ভিন্নপ্রথায় বিবাহের মাধ্যমে। এ ধরণের সবচেয়ে সরল পরিবার হচ্ছে হাইড্রোজেন অণু। একটিমাত্র মৌল পদার্থযুক্ত অণুগুলি (উদাহরণস্বরূপ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন অণু) এবং মেণ্ডেলিয়েভের তালিকার বাঁ বা ডান দিকের পরমাণুযুক্ত অণুগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই অণুগুলি পরবর্তীকালে সমযোজ্যকরূপে পরিচিতি লাভ করল।



চিত্র নং ১১

এদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ডাক পড়ল। কল্পনা করুন, একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপর আর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর দিকে এগিয়ে আসছে। অবিবাহিত দু'জন, কাজেই তারা দু'জনে বিবাহিত ও পরিবারসৃষ্টিকারীদের হিংসা করে; তাই প্রথমজন বল্লো: "তোমার বস্ত্রগুলি দাও আর আমরা অণু তৈরী করব।"

দ্বিতীয়জন গর্বোদ্ধত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়: "তোমাকেও এই অনুরোধ করার আমার সমান অধিকার আছে।"

"তাহলে আমরা কি বস্ত্র বিনিময় করব?"

"কিন্তু তাতে লাভ কি? আমাদের বস্ত্রগুলি যে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন।"

ইতিমধ্যে আমাদের পারমাণবিক স্থপতি (সে এখন পরমাণুর বদলে অণু তৈরী করছে) কথোপকথন শুনতে শুনতে একটি প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে: "তোমরা কিন্তু তোমাদের পুঁজি একত্রিত করতে পার, যেহেতু কখনই তোমরা আভিজাত্যপূর্ণ আট-ইলেকট্রন পোষাক তৈরী করতে পারবে না। তোমাদের যথেষ্ট গঠন পদার্থ নেই। এক কাজ কর: একটি ইলেকট্রনকে ক্ষণিকের জন্য কোন একটি পরমাণুতে থাকতে দাও, আর তার সঙ্গী ইলেকট্রনও একই পদ্ধতিতে চলতে পারে।"

"কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হবে না" তারা যুগ্মকণ্ঠে বলে ওঠে, "আমরা তো ইতিমধ্যেই ইলেকট্রন বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম।"

"সেখানেই তোমরা ভুল করেছ। তোমরা ভুলে গেছ যে, এমন সময় আসবে যখন একটি পরমাণুর দুটো ইলেকট্রন থাকবে অথচ যখন অপরটির একটিও নেই। তখন তোমরা দুটো বিপরীতধর্মী আয়ন হিসাবে প্রতিপন্ন হবে। আয়নীয় অণুতে একটা পরমাণুর ইলেকট্রন প্রদান এবং অপরটির ইলেকট্রন-গ্রহণের দরুন যেখানে পরমাণুগুলো প্রায় সর্বদাই আয়নিত, তোমাদের ক্ষেত্রে সেখানে কেবল ইলেকট্রন বিনিময় ঘটবে। প্রথম একটি পরমাণু ইলেকট্রন পরিবৃত হলে অপরটি নগ্ন থাকবে, এবং তারপর ঘটবে আবার তারই বিপরীত ঘটনা।"

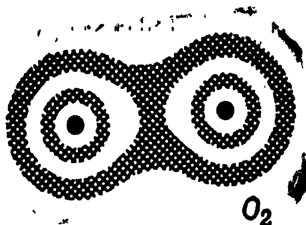
"আর কতবার আমাদের ইলেকট্রন বিনিময় করতে হবে?" পরমাণুদের প্রশ্নেই তাদের সদিচ্ছা ধরা পড়ে।

"কিছুটা ঘনঘন" বলে চলেন স্থপতি। "যদি বোরের 'আধাক্ল্যাসিক্যাল' ভাষা ব্যবহার করি তবে বলব, প্রত্যেক পরিক্রমণের পর একটি পরমাণুর ইলেকট্রনকে অন্য পরমাণুতে চলে যেতে হবে। তখন উভয়ের বহির্মুখী খোলকে থাকবে আটটি ইলেকট্রন।"

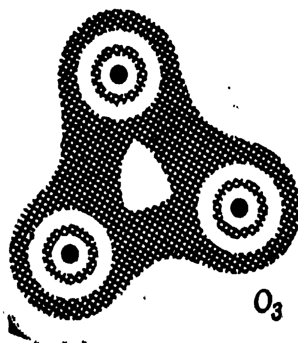
"বেশ, চেষ্টা করে দেখি", সায় দিল পরমাণুগুলি।

ফলে পেলাম একটি বেশ ভালো সবল পরিবার। কেবল কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাই প্রকৃতির এই ভোজবাজি ধরতে পারল। কোয়াণ্টামওয়ালা সঠিকভাবেই অভিন্ন পরমাণুগুলির এই পারস্পরিক ক্রিয়া, যার দরুন অণু তৈরী হয়, তাকে বললেন 'বিনিময়ী মিথস্ক্রিয়া'। ক্ল্যাসিক্যাল পদার্থবিদ্যা কোন সময়েই এ ধরণের কিছু চিন্তাও করতে পারত না।

এবার দেখুন কিভাবে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এই ইলেকট্রন বিনিময় চিত্রাংকিত করে। যতক্ষণ পরমাণুগুলি পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত, তাদের ইলেকট্রন মেঘ প্রায় কখনই অধিক্রমণ করে না। কিন্তু যখন পরমাণুগুলি যথেষ্ট নিকটবর্তী হয়ে আসে, ইলেকট্রন মেঘগুলির যথেষ্ট পারস্পরিক পরি-ব্যাপ্তির ফলে প্রত্যেকটি পরমাণুর ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তার সঙ্গিনী পরমাণুর কেন্দ্রকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা গণনাযোগ্য হয়ে ওঠে, যার দরুন বিনিময়ের সম্ভাবনা বাড়ে।



চিত্র নং ১২



চিত্র নং ১৩

এই সম্ভাবনাটি কি? হাইড্রোজেন অণুর ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ। অন্য-ভাবে দেখলে, প্রতি ঘণ্টায় ১০ মিনিটের জন্য উভয় ইলেকট্রন কোন একটি হাই-ড্রোজেন পরমাণুতে যুগ্মভাবে অবস্থান করে যখন অন্য পরমাণুটি ইলেকট্রনশূন্য।

পরমাণুগুলিকে একটি অণুতে বাঁধার পক্ষে এটুকুই কি যথেষ্ট? কোয়াণ্টাম পরমাণুতে বলবিদ্যা দ্বারা পরিচালিত ইংরেজ বিজ্ঞানীদ্বয় হাইটলার ও লণ্ডনের

গাণিতিক হিসাব জানায়: হ্যাঁ। বস্তুতই এখানে ব্যবহারিক পরীক্ষার সঙ্গে তত্ত্বের গভীর মিল দেখা গিয়েছে।

অণুর জগতে ইলেকট্রনের বিনিময়ের মাধ্যমে 'ধনী' ও 'গরিব' পরমাণুদের এই ধরণের একপন্থী হওয়া প্রায়শই ঘটে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রোজেন পরমাণুতে (পৃঃ ১০৫ দেখুন) আছে কেবল সাতটি ইলেকট্রন। অন্তরস্থিত খোলকে অবস্থিত দুটি ইলেকট্রন বিনিময় ক্রিয়ায় যোগদান করে না। কিন্তু বহির্মুখী খোলগুলিতে পাঁচটি ইলেকট্রন অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়।

নাইট্রোজেন পরবর্তী অক্সিজেন পরমাণুর প্রত্যেকটিতে বিনিময়ের জন্য ছয়টি ইলেকট্রন আছে। এগুলি সাধারণ পরমাণুযুক্ত দুইটি অক্সিজেনের অণু তৈরী করে (১২নং চিত্র)। তিনটি পরমাণুযুক্ত অক্সিজেন (ওজোনে) ১৮টি ইলেকট্রনের একটি সংগঠন তৈরী হয়। এবং বিনিময়টিকে সহজতর করার জন্য ইলেকট্রনদের পরিক্রমার দূরত্ব হ্রাসের উদ্দেশ্যে তিনটি পরমাণু একটি ত্রিভুজ সৃষ্টি করে। এই তিনটি পরমাণু ভলিবল অনুশীলনকারী খেলোয়াড়দের মত নিজেদের ইলেকট্রনগুলিকে শূন্যে নিক্ষেপ করে (১৩নং চিত্র)।

এই আণবিক কাঠামোটি এখন আর সংগঠক পরমাণুগুলির স্থাপত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং ভাড়াটের বিভাজন ফ্ল্যাটগুলিও ভিন্নতর। এসবই অণুদের গুণাগুণগুলিকে তাদের সংগঠক পরমাণুদের গুনাগুণ থেকে পৃথক প্রতিপন্ন করে।

॥ কঠিন পদার্থগুলো কি সত্যিই কঠিন ॥

পথের বাঁক ঘুরলেই আমরা নতুন দৃশ্যভূমিতে প্রবেশ করি, যার সঙ্গে আমরা সর্বাধিক পরিচিত: আমাদের চারপাশের কঠিন বস্তুসমূহ। সবকটাই সুপরিচিত, কিন্তু এদের সংগুপ্ত রহস্য এখনও বিজ্ঞানকে তাচ্ছিল্য করে।

শতাব্দীর মোড় ঘোরার দিনগুলিতেও কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর প্রচুর বিবরণ পদার্থবিদ্যা সংগ্রহ করেছিল। আমরা জানি, কঠিন পদার্থগুলি কেলাসীয় এবং অনিবদ্ধী আকারে বর্তমান, তার তাপ ও বিদ্যুৎশক্তিও ভিন্নতর, এবং আলোর ও শব্দের সঞ্চালনও অন্যরকমের। কিন্তু

তা সত্ত্বেও কঠিন অবস্থাগত পদার্থবিদ্যা উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটিকে ব্যাখ্যা করতে বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করেছিল।

অথচ এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, যেহেতু দ্রুত পরিবর্ধনশীল কারিগরী শিল্পগুলি নতুন প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহারে সদা সচেষ্ট। প্রয়োজনের দাবি এতই বেশী যে, কৃত্রিম পদার্থগুলিও কার্যক্ষেত্রে নিয়ে আসা হচ্ছে।

আমাদের যে সব পদার্থ দরকার সেগুলিকে প্রভূত শক্ত হতে হবে, আর সেগুলির বিদ্যুৎ পরিবহনক্ষমতা, তাপ রোধ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এগুলি কোথা থেকে পাব? একটি উপায় হল, সবকটা পরিচিত পদার্থের একীকরণ এবং কোন অভ্যস্ত পদ্ধতিতে তাদের কাজে লাগান—অর্থাৎ একপ্রকার কিমিয়াবিদ্যা (alchemistry)। আরও একটি উপায় আছে কিন্তু তার জন্য কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার ব্যবহার অপরিহার্য।

এক্ষেত্রেও কয়েক বছরের মধ্যেই একটি প্রয়াসলব্ধ পথ তৈরী হল। প্রথম-দিকে কেলাসের, মূলতঃ ধাতুদের কেলাসের কাঠামো-উপলব্ধির জন্যই প্রয়াস করা হয়েছিল।

বস্তুতঃ সুরু করার পক্ষে সেরা জিনিষ কেলাস। একটি কেলাস হল কোন স্থানে পরমাণুসমূহের জাফরী-কাটা বিন্যাসে সুসংবদ্ধ পর্যায়ক্রমিক বিতরণ। সাধারণ দু'মাত্রার জাফরী নয়, এখানে মাত্রা তিনটি। জাফরীতে কেলাসের পরমাণুগুলির দূরত্ব সমান: এটাকে জাফরী ব্যবধান বলা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে জাফরীর ত্রিমাত্রার সঙ্গে তাল রেখে তিনটি ব্যবধান থাকে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা।

বিশুদ্ধ মৌল পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, তার বদলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তাদের যৌগিক রূপের সন্ধান পাই। এইসব কেলাসের জাফরীগুলো বিভিন্ন ধরণের পরমাণু দ্বারা তৈরী। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত হল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু সমন্বিত বরফের কেলাস। জলের যে সূত্র, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা অক্সিজেন পরমাণুর দ্বিগুণ।

আর একটি উদাহরণ হল, সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) কেলাসের জাফরী। জাফরীর মৌল পদার্থগুলির প্রতিচ্ছেদে (যেগুলোকে বলা হয় পাত) আমরা সোডিয়ামের আয়ন পাই, যেগুলি ক্লোরিনের আয়নের সঙ্গে

একক্ষায়িত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই আয়নগুলি পরমাণু নয়। যখন লবণের অণুগুলি কঠিন পদার্থে ঘনত্বলাভ করে, তাদের পারমাণবিক বন্ধনীর আয়নিত প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে।

কিন্তু অণুটির কোন 'নিজস্ব অস্তিত্ব থাকে না। তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। বস্তুতঃ প্রত্যেক সোডিয়াম আয়ন ক্লোরিন আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রত্যেক ক্লোরিন আয়নের চারপাশে আছে সোডিয়াম আয়ন। পুরনো অণুটিকে গিয়ে খুঁজে বার করুন!

এরকম কেলাসে আয়নের মধ্যেকার বল হল সাধারণ বৈদ্যুতিক বল। সোডিয়াম আয়ন তার প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক অবস্থানরত ক্লোরিন আয়ন-গুলোকে আকর্ষণ করে, পক্ষান্তরে এই ক্লোরিন আয়নগুলো অন্যান্য সোডিয়াম আয়নগুলোকে আকর্ষণ এবং ক্লোরিন আয়নগুলোকে বিকর্ষণ করে। আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বলবিদ্যার এই খেলার ফলে আয়ন বিন্যাসে আসে এক প্রকার ভারসাম্য। এই হল কেলাস জাফরী।

এই বিন্যাসের ভারসাম্য থাকায় এটি স্থায়ী। যদি কোন একটি আয়ন তার অবস্থানস্থল থেকে সরে যায়, বিপরীতধর্মী আয়নের প্রতি তার আকর্ষণ বল হ্রাস পায়, কিন্তু সহধর্মী আয়নগুলো তাকে আরও বেশী বিকর্ষণ করে। এই বলসমূহের সামগ্রিক ক্রিয়ায় আয়নটি তার প্রাক্তন অবস্থানে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য।

প্রকৃতপক্ষে তাপশক্তির গতিবেগের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আঘাতে আয়নটি সর্বদাই স্প্রিং-য়ে সংযুক্ত গোলকের মত তার স্থায়ী অবস্থানের মধ্যে আন্দোলনরত। জাফরীতে আয়নের তাপঘটিত স্পন্দন কঠিন পদার্থের বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

আর আয়োজিত অণুর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই আয়োজিত কেলাসের ক্ষেত্রেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিশেষ কিছু করার নেই। কিন্তু তারপরেই পদার্থবিদ্যার চোখ পড়ে আধুনিক কারীগরী শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাতব কেলাসের উপর।

এখানে পরিস্থিতি বেশ ভিন্নতর। ধরুন, সমগ্র জাফরীটি একটিমাত্র ধাতুযায়া অর্থাৎ এক ধরণের পরমাণু দিয়ে তৈরী হয়েছে। স্বভাবতঃই, আয়নের বিদ্যুৎশক্তিতে কোন পার্থক্য দেখা দেবে না। যদি একটা পরমাণু

স্বেচ্ছাকৃতভাবে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে, অবশিষ্ট সবকটি পরমাণুও তা করবে না কেন ?

বোধহয় এটাই বাস্তব ? কোয়ান্টাম বলবিদ্যা হাইড্রোজেন অণুর উপর সাম্প্রতিক জয়লাভ স্মরণ করে। ধাতব কেলাসটি তো লক্ষকোটি পরমাণুযুক্ত বিশাল সমযোজ্য অণুও হতে পারে ?

এই সুদক্ষভাবে উদ্ভাবিত ধারণাটিই নির্ভুল প্রমাণিত হল। প্রকৃতির তত উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল না এবং সে কিছুই করে রাখে নি। দুটো পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন বিনিময়ের কৌশল সফল হলেই প্রকৃতি পরীক্ষাটিকে আরও অধিক ইলেকট্রন সম্মিলনীতে প্রসারিত করল।

এ সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে জিনিষটা খুব সহজ ও সরল নয়। সুযোগ পেলেই কঠিন পদার্থগুলো দেখাতে পারে যে, তারা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পক্ষেও কঠোর সমস্যা সৃষ্টি করতে পটু।

॥ কেলাসের-কাঠামো ও বহুতলবিশিষ্ট গঠন ॥

ধাতব পরমাণুগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কেলাস গঠনের সময় তাদের বহিঃপ্রান্তস্থ (যোজ্য) ইলেকট্রনগুলোকে সার্বজনীন করে দেয়। এর ফলে কেলাস লাভ করে কাঠামোগত এক স্থাপত্য। হাল্কা ও গতিশীল সার্বজনীন ইলেকট্রন মেঘদ্বারা বেষ্টিত ধীরগতি আয়নগুলো জাফরী পাত-এ অবস্থান করে থাকে। এই মেঘটি পরস্পরবিরোধী, সমধর্মী-বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন আয়নগুলোকে ধরে রাখার জন্য সিমেন্টের কাজ করে। পক্ষান্তরে আয়নগুলো ইলেকট্রনদের আসঞ্জক রূপে কাজ করে, ইলেকট্রনগুলোকে দিকে দিকে উড়ে যেতে দেয় না।

ধাতুতে ইলেকট্রনগুলো যে 'প্রায় সম্পূর্ণ' মুক্ত এ কথা ইতিপূর্বেই বলার সুযোগ আমাদের হয়েছে। সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যেহেতু প্রতিটি পরমাণুই তার প্রদেয় দিয়ে সহায়তা করে, তাই প্রত্যেক ইলেকট্রন আর কোন একটি বিশেষ পরমাণুর সম্পত্তি হয়ে থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত পরমাণুর সাধারণ ভৃত্যস্বরূপ কোটি কোটি ইলেকট্রনগুলিরই অন্যতম মাত্র। এ ধরনের ইলেকট্রন কেলাসটির যে কোন স্থানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা পায়, আণুবীক্ষণিক 'জিগারো'-র রূপ সে ধারণ করে।

একথা অবশ্য সত্য যে, সব ইলেকট্রনই এতটা স্বাধীন নয়। প্রতিটি পরমাণু তার বহিঃপ্রান্তস্থ ইলেকট্রনের কেবল একটি বা দুটিকেই মুক্ত করে, তাছাড়া বাকী সব কয়টি পরমাণুর অভ্যন্তরে দৃঢ়সংবদ্ধ থাকে। কিন্তু তা সত্বেও স্বাধীন ইলেকট্রনের সৈন্যসংখ্যা সুবিশাল, ধাতুর প্রত্যেক ঘন সেন্টি-মিটারে 10^{22} থেকে 10^{23}।

ইচ্ছা করলে বলতে পারেন, ধাতবীয় কেলাসের 'সাম্যজক' সংগঠন আয়নীয় কেলাসের চেয়ে অধিকতর উন্নত, কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে সকল ইলেকট্রনেরই পরমাণুর মধ্যে শৃংখলিত থাকার ব্যবস্থাটা কিছুটা দাসত্বের মত। ধাতু অনেকটা সামন্তপ্রথার কাছাকাছি। জমির মালিক খাজনা উপার্জনের জন্য ভূমিদাসদের কিছুটা ভাড়া খাটায়। এই উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে ধাতুকে দিল নকল গুণাবলী এবং বিদ্যুৎস্রোত পরিবহনের সুযোগ।

আয়নীয় কেলাসের মধ্যে যদি একটি সাধারণ বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তাহলে পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন মেঘগুলি কিছুটা দীর্ঘায়ত হয়ে কেবল সামান্য পুনর্বিন্যাসের সৃষ্টি করে। এর ফলে এমন কিছু ঘটে যাকে বলা হয় কেলাসের বৈদ্যুতিক সমবর্তন। কোন একটি ইলেকট্রনও তার আয়ন ত্যাগ করতে পারবে না এবং আয়নগুলোর আগের মত তাদের পাতগুলিতে দৃঢ়ভাবে নোঙর ফেলে থাকবে। এবং যেহেতু বিদ্যুৎশক্তির কোন স্বাধীন বাহক নেই সেকারণে কোন বিদ্যুৎস্রোতও পরিবাহিত হবে না। আয়নীয় কেলাসগুলো সেজন্যই ইনসুলেটার বা অন্তরক।

অথচ ধাতুতে বিদ্যুৎশক্তির বহন এবং বলিষ্ঠ বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদনে সদা-প্রস্তুত ইলেকট্রনগুলি প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

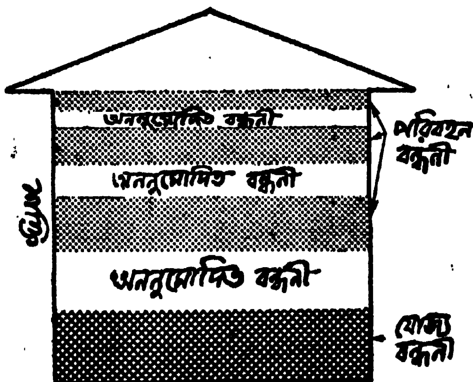
কিন্তু এর সঙ্গে আধা-পরিবাহীর সম্পর্ক কি? একটু পরেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

আপাততঃ আমরা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব, যা ধাতুর জন্য কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে: ধাতুর 'সমষ্টিবদ্ধচক' ইলেকট্রনগুলিতে কি ধরণের শক্তি থাকে? উত্তর সহজবোধ্য: পরমাণুতে শৃংখলিত নয়, এমন ইলেকট্রনদের আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্নপ্রকার শক্তি থাকতে পারে। স্মরণযোগ্য যে, মুক্ত ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তাদের শক্তিস্তরের কোয়ান্টাম প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়।

কিন্তু এই উপসংহারে পৌঁছবার জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। একথা ঠিক, ইলেকট্রনগুলো তাদের পরমাণু ত্যাগ করেছে, কিন্তু তারা তো ধাতুখণ্ডটি পরিত্যাগ করেনি। নিয়ম আছে যা কোন একটি ইলেকট্রনের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, সম্পূর্ণ ইলেকট্রনীয় সমাবেশটির আচরণ নির্ধারণ করে।

এখন এই নিয়মে প্রবেশ করা যাক। আমরা জানি, শ্রোয়েডিংগারের সমীকরণ সমাধা করেই পরমাণুর ঠিক নিয়মগুলো আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং ধাতুতে ধাতব ইলেকট্রনের (ধাতব কেলাসের) আচরণ-নির্ণয়ক নিয়মের সন্ধানে পদার্থবিজ্ঞানীরা একই পথ ধরলেন। একটি ধাতুর কেলাস জাফরির পাতগুলিতে নিয়মিত অন্তরে অবস্থানকারী পজিটিভ আয়নের পর্যায়ক্রমিক বিদ্যুৎক্ষেত্রে তাঁরা ইলেকট্রনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে শ্রোয়েডিংগার সমীকরণের সমাধা করলেন।

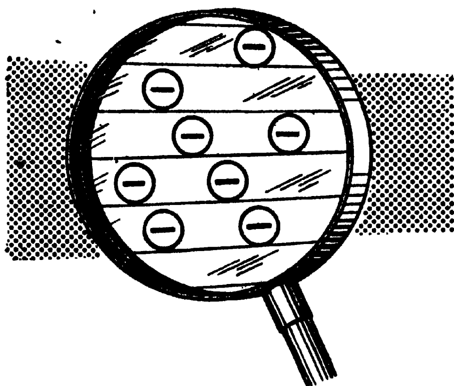
একটু সামান্য অপ্রাসঙ্গিকতা এখানে এসে পড়ছে। এ পর্যন্ত একটি পরমাণুর উপর তার নিকটবর্তী কোন পরমাণুর দ্বারা আরোপিত প্রভাবের



চিত্র নং ১৪

ফল সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা কেবল তার বাহ্যিক প্রকাশধারাই দৃষ্টি-গোচর করেছি। একে অপরকে আকর্ষিত করে পরমাণুগুলো অণু তৈরী করে। কিন্তু ইতিমধ্যে পরমাণুদের নিজেদের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে? দেখা যায়, ইলেকট্রন মেঘগুলি তাদের বাহ্যিক গঠন পরিবর্তিত করেছে। এটি

জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী স্টার্ক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পূর্ণাঙ্গতা লাভের পূর্বেই আবিষ্কার করেন। স্টার্ক লক্ষ্য করেছিলেন যে, যদি কোন বস্তুতে একটি শক্তিশালী বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে নির্গমন বর্ণালীর রেখাগুলি বিভক্ত হয়ে পড়ে।



চিত্র নং ১৫

পূর্বে আলোচিত যমজ রেখাগুলির সঙ্গে এই বিভাজনের কোন সম্পর্ক নেই। তবু উভয়ের মধ্যে কিছু সমধর্মীতা আছে, যা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রমাণ করেছিল। বর্ণালী রেখার বিভাজন পারমাণবিক ইলেকট্রনের শক্তি-স্তরের বিভাজনের সঙ্গে একাত্ম।

তাহলে মূল কথা হল এই যে, কোন পরমাণুর বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রয়োগ করলে তার ইলেকট্রনের শক্তিস্তরগুলো ভেঙে যায়। একটি পরমাণুর যথেষ্ট নিকটবর্তী অপর একটি পরমাণুর বিদ্যুৎক্ষেত্রের কার্যপ্রভাবটি (এখানে ক্ষেত্রটির অস্তিত্ব বেশ একটু বাস্তব) আমরা এখানে যা আলোচনা করলাম, তা কোন মৌলিক দিক থেকে ভিন্নতর নয়।

এটা অবশ্যই সত্য যে, যখন একটি অণু গঠিত হয়, তখন তার অন্তর্ভুক্ত পরমাণুদের শক্তিস্তরগুলো অন্তর্হিত হয়ে যায়। তারা বিভক্ত, পরস্পরমিশ্রিত এবং শক্তিমাপনীর উপর-নীচে দোদুল্যমান হয়ে তথাকথিত আণবিক শক্তিস্তর তৈরী করে, যা এখন সমগ্র অণুটির সঙ্গেই জড়িত।

কিন্তু অণুতে যা ঘটে তা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশলাভ করে কেলাসের ক্ষেত্রে, যেখানে বহু পরমাণু ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে কেলাসে এই সন্নিবেশ পুনরাবৃত্ত করে। আসলে কেলাস হল একটি অতিকায় 'হিমায়িত' অণু মাত্র। এই 'অণু'টির সকল পরমাণুর যুক্ত বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রত্যেকটির শক্তিস্তরকে বহুসংখ্যক পাশাপাশি অবস্থানকারী উপস্তরে বিভাজিত করে। বহির্দেশস্থ ইলেকট্রনের অনুমোদিত শক্তিস্তরের পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মুছে যায়। তাই মনে হতে পারে যে, কেলাসের ইলেকট্রনের নিজের ইচ্ছামত যে কোন শক্তি থাকতে পারে।

কিন্তু এরপরেই একটা লক্ষণীয় ঘটনা ঘটে যায়। ১৪ নং চিত্রে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। ইলেকট্রনের ইচ্ছামত যে কোন শক্তি থাকার যে উপসংহারে আমরা এইমাত্র পৌঁছেছি, সেটি পূরণ করা হলেও এখানে থেকে গেছে একটি অপরিহার্য ব্যতিক্রম। ফাঁকা বন্ধনীগুলো এমন শক্তির নির্দেশ দেয় যা ধাতুর ইলেকট্রনদের পক্ষে কখনই থাকতে পারে না। এই শক্তিগুলোর সঙ্গে জড়িত আছে একটি শূন্য তরঙ্গ অপেক্ষক (function) এবং তদনুসারে উক্ত অবস্থায় ইলেকট্রন অস্তিত্বের একটি শূন্য সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শক্তির এই ফাঁকা সাদা বন্ধনীগুলোর নামকরণ করা হোলো 'নিষিদ্ধ এলাকা' বা বন্ধনী।

এমনকি দো-আঁশলা তথাকথিত অনুমোদিত বন্ধনীতেও কোন ইলেকট্রন যে কোন শক্তির অধিকারী হওয়ার অনুমতি পায় না। যদি কাগজে আসল চিত্র পুনঃপ্রকাশিত করা যেত তাহলে দেখতাম যে, এই বন্ধনীগুলোতেও বিভিন্ন শক্তিস্তর আছে। কিন্তু একটি বন্ধনীতে এত বেশী শক্তিস্তর আছে (প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে বিপুল সংখ্যক ইলেকট্রনের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করুন) যে, সেগুলি একটি অবিচ্ছন্ন ক্রমে রূপায়িত হয়।

এখন দেখা যাক, ধাতুর এই স্তরগুলিতে ইলেকট্রনের অবস্থান কি ধরণের। যে কোন উপায়ে নয়, যেমন তারের উপর পাখীর অবস্থান, তেমন হয়। পাউলীর নিয়মই তাতে বাদ সাধে। এই কড়া পরিদর্শকটির দৃষ্টি যেমন পরমাণুতে, তেমনই ধাতুতে প্রখর ও সতর্ক। ধাতুর অনুমোদিত এলাকার প্রতিটি শক্তিস্তরে কেবল দুটি ইলেকট্রনের অবস্থানেরই অনুমতি আছে—এই হল পাউলী নিয়ম। প্রচুর স্থান এবং প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী শক্তিস্তর

এখানে বর্তমান। ধাতুর সর্বদাই 'বাসস্থানে'-র প্রভূত আধিক্য। স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতুর সমস্ত ইলেকট্রনগুলো সর্বনিম্ন অনুমোদিত এলাকাতে, সবচেয়ে নীচের তলায় অবস্থান করতে পারে।

এরই নীচে আছে যেন একধরণের 'ভূগর্ভস্থ অংশ' যেটি একক পরমাণুর অন্তর্গত, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধাতুর পরমাণুগুলির অন্তর্ভূ‌র্ত নয়। ভূগর্ভস্থ অংশটি সর্বনিম্নতল থেকে বিযুক্ত তবে বায়ুরুদ্ধ নয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটি সিঁড়ি পাতা রয়েছে। এই সিঁড়িতে মাত্র একটি ধাপ, যার উচ্চতা প্রথম অননুমোদিত বন্ধনীর সমান। ভালভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে একটি ইলেকট্রন ভূগর্ভস্থ অংশ থেকে সর্বনিম্নতলায় উন্নত হতে পারে। কিন্তু শক্তির অভাবে সেটি অননুমোদিত বন্ধনীতেই থেকে যেতে পারে না।

শক্তির ভূগর্ভস্থ অংশকে পদার্থবিজ্ঞানীগণ বললেন যোজ্য এলাকা বা যোজ্য বন্ধনী। এবং শক্তির সবকটি অনুমোদিত বন্ধনীকে 'পরিবহন বন্ধনী' এই বর্গীয় নামে অভিহিত করা হল। এই পরিভাষার উৎস খুবই স্বচ্ছ: যে সকল বহির্দেশস্থ ইলেকট্রন যোজ্যতা নির্ণয় করে (যদিও তারা তখনও মুক্ত নয়) তারা ভূগর্ভস্থ অংশটিতে বাস করে; পক্ষান্তরে সর্বনিম্ন ও তার উপরের তলার অধিবাসী হল সেই সকল ইলেকট্রন যেগুলি বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্রিয়ায় যোগ দেয়।

॥ অন্তরকও বিদ্যুৎস্রোত পরিবহন করতে পারে! ॥

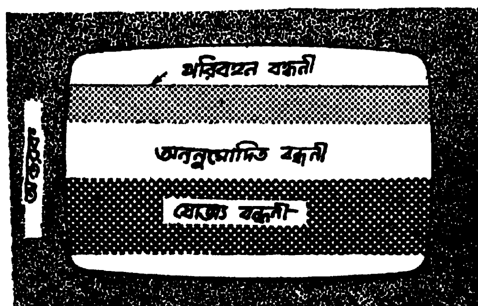
অন্তরকগুলি অবশ্য তাদের সকল ইলেকট্রন ভূগর্ভস্থ অংশে রেখে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবহন বন্ধনী থাকে ফাঁকা; প্রথম অননুমোদিত বন্ধনী এত বৃহৎ যে, কোন ইলেকট্রনই তাকে অতিক্রম করার শক্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যথাযথভাবে উত্তপ্ত করা হলে জাফরী পাতে অবস্থানকারী অন্তরকের আয়নগুলোর দোদুল্যমান শক্তি বিপুল আকার ধারণ করে। এই শক্তি ইলেকট্রনগুলিকে পৌঁছে দিতে পারা যায় এবং সময়বিশেষে এগুলি পরিবহন বন্ধনীতে লাফিয়ে ওঠার যথোপযুক্ত শক্তি অর্জন করে। তখনই অন্তরক বিদ্যুৎস্রোত পরিবহন করতে থাকে। একে বলা হয় তাপজনিত অন্তরকের ক্রমভঙ্গ।

প্রকৃতপক্ষে এই ক্রমভঙ্গতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এর অর্থ হল কেবল এই যে, ইলেকট্রন তার সংকীর্ণ পারমাণবিক জগতের গণ্ডী অতিক্রম করে পরিবহন বন্ধনীতে উত্তীর্ণ হয়ে বস্তুতঃ স্বাধীন সত্তায় সুপরিণত। ভূগর্ভস্থ অংশ থেকে সর্বনিম্নতলাটিকে যে অননুমোদিত বন্ধনী ভাগ করছে, তার প্রস্থের সমান এই মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি।

মানসপটে এই সব কিছু এভাবে চিত্রায়িত করা যায়: তাপের আঘাতে পরমাণু থেকে নির্গত ইলেকট্রন উক্ত পরমাণুকে আয়নিত করে মুক্তভাবে চলতে ফিরতে পারে ঠিকই, তবে অন্তরকের মোটা খণ্ড থেকে এখনো বেরিয়ে যেতে পারে না।

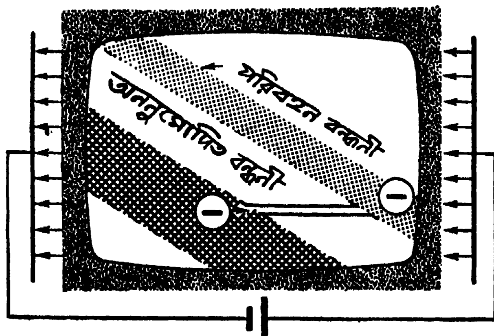
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ধরা পড়ে যে, একটি শক্তিশালী বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রয়োগ করলে অন্তরকও বিদ্যুৎপরিবাহী হয়ে ওঠে। এক মিনিট অপেক্ষা করে ভেবে দেখুন, ঠাণ্ডা অবস্থায় ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গমনের যে আলোচনা আগের অধ্যায়ে আমরা করেছি এটা কি ঠিক তার মত নয়? কিন্তু এটা তো ধাতু নয়, আয়নিত কেলাস! ওখানে ইলেকট্রনগুলো সম্পূর্ণভাবে পালাতে পারত, কিন্তু এখানে তারা শুধু যোজ্য বন্ধনী থেকে পরিবহন বন্ধনীতে লাফ দিতে পারে।

কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও এটা এক এবং পূর্বেরই মতো একই প্রতিক্রিয়া। উভয় উদাহরণেই সব চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হল 'সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়া'। বস্তুতঃ



চিত্র নং ১৬

সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক ছাড়া অননুমোদিত বলয়ের কোন অর্থ হয় কি? হ্যাঁ, এটি শুধু স্বভাবতঃই প্রায় অসীম প্রস্থের (ইলেকট্রনগুলির পক্ষে) একটি সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক। এটি কেবল একটি 'সম্মুখ' ভাগ সমেত এক পদক্ষেপমাত্র। একটি বিদ্যুৎক্ষেত্র, আগের মতই, তাকে বেঁকিয়ে একটি 'পশ্চাৎ' ভাগ তৈরী করে নেয়। ফলতঃ এখন প্রতিবন্ধকটি লাভ করে একটি সীমাবদ্ধ প্রস্থ।



চিত্র নং ১৭

বাকীটা একই। যোজ্য বন্ধনী থেকে প্রতিবন্ধকের ভেতর দিয়ে পরিবহন বন্ধনীতে ইলেকট্রনগুলো ঢুকে পড়ে। প্রথমে আমরা একটু সামান্য বিদ্যুৎ-স্রোত পাই: অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা কম এবং মাত্র কয়েকটি ইলেকট্রনই পরিবহন বন্ধনীতে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কেলাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার সময় এই বিদ্যুৎপ্রবাহকে উষ্ণ চাকতিতে অবস্থিত তারের মত কেলাসকে উত্তপ্ত করে তোলে। পক্ষান্তরে এই উত্তাপ পরিবহনবন্ধনীতে নিত্যনূতন ইলেকট্রন-সৈন্য যোগায় এবং অন্তরকের বিদ্যুৎস্রোত আপনা থেকেই বেড়ে ওঠে। মুহূর্তমধ্যে অন্তরকের বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ ঘটে। যুগপৎ-ভাবেই তাপের দ্বারা অন্তরক গলে যায়। এটি আর ব্যবহার্য নয়, সুতরাং একে ফেলে দিতে হয়।

কিন্তু অন্তরকে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারের অধিকতর শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি জানা আছে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ খুবই দুর্বল এবং একেবারে কোনো ক্ষতি করতে অপারগ। এগুলি আয়োজিত কেলাসকে আলোকিত করেই উৎপাদিত। ফোটোনসমূহ কেলাসকে আঘাত করে যোজ্যবন্ধনী থেকে পরিবহন বন্ধনীতে

ইলেকট্রনগুলিকে ধাক্কা দিয়ে পৌঁছে দেয়। এটাই বাস্তবিক আলোকবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া, কিন্তু এখানে কোন নির্গমন নেই, সব কিছুই বলতে গেলে ভেতরে চলছে। কোন বিনাশের প্রশ্ন এখানে নেই, একই সময়ে ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

॥ ধাতুতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে কিভাবে ? ॥

এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এ ধরণের প্রশ্ন করাও লজ্জাজনক। পাইপে পাম্প করা জলের মত ইলেকট্রনগুলো কি বিদ্যুতের উৎস ত্যাগ করে বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটি তারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার বিদ্যুৎ-উৎসে প্রবেশ করে না ?

তবু আমরা লজ্জাবোধ করি না। বিদ্যুৎ-রোধ কোথা থেকে আসে ? পরিবাহী কোন পাইপ নয় তার দেওয়ালগুলো এবড়ো-খেবড়ো নয়। এত অধিক বিদ্যুৎবাহক দ্বারা পূর্ণ ধাতু কেন বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ?

এ হল সেই কৌতুকপ্রদ সরল প্রশ্নগুলির একটি, যার উত্তর মোটেও সহজ নয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিচয় আমাদের সঙ্গে একশো পঞ্চাশ বছর যাবৎ, কিন্তু আমাদের উপরিউক্ত অন্বেষণের উত্তর আমরা পেয়েছি মাত্র তিরিশ বছর।

ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা নিম্নলিখিত উপায়ে বিদ্যুৎ-রোধ ব্যাখ্যা করেছিল।

ধাতুর কাঠামোয় অবস্থানরত আয়নের তাপসংক্রান্ত দোলনের দরুন ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট গতি, যাকে আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহ বলি—সর্বদাই ব্যাহত হয়। এই দোলনগুলি ইলেকট্রনের অগ্রাভিযানকে বাধা দেয়। ইলেকট্রনগুলি এই অবস্থায় ভূমিকম্পের সময় কোন ভবনের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের মত চলতে থাকে—যখন দেওয়াল ও মেঝে চারপাশে উঠছে নামছে, দুলছে কাঁপছে।

স্বভাবতঃই, দেওয়াল ও মেঝের দোলন যত কম হবে, ভবনের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো ততই সহজ। তাপমাত্রার পরম শূন্যে যখন আয়নগুলির তাপসংক্রান্ত দোলন সম্পূর্ণভাবে থেমে যায়, বিদ্যুৎ-রোধ তখন শূন্যে নেমে

আশা উচিত। প্রায় সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত, বিশেষভাবে বিশুদ্ধ ধাতুর ক্ষেত্রে এটি সত্যের খুব কাছাকাছি। এই ভেজাল নিয়েই যত অসুবিধা। তাপমাত্রা যেই নেমে আসে, এই 'নোংরা' ধাতুগুলোর রোধ শূন্যের দিকে ঝোঁকে না, ঝোঁকে কোন উচ্চতর সংখ্যার দিকে যে সংখ্যাটি ধাতুতে ভেজালের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যত বেশী ভেজাল থাকবে তত বেশী উঁচু হবে অবশিষ্ট বিদ্যুৎরোধ।

এর সম্বন্ধে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার বক্তব্য কি? কিছুই নয়। ধাতুর পরমাণুকে ভেজালের পরমাণু থেকে পৃথক দৃষ্টিতে সে দেখতে পারে না : একই তাপমাত্রায় তারা একইভাবে দুলতে থাকে এবং সম্পূর্ণ একই প্রথায় ইলেকট্রন গতি ব্যাহত করে।

এখন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অধিকতর পর্যবেক্ষণশীলরূপে নিজেকে প্রমাণ করল। পাতের এই বিভিন্ন পরমাণুগুলি খুবই স্বচ্ছভাবে পৃথক দৃষ্টিতে দেখা যায়, যেন তারা ভিন্ন ভিন্ন রং আর কি। তাহলে বিদ্যুৎ-রোধের কারণ আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব?

প্রথমে কেলাস ইলেকট্রন বিচ্ছুরণের একটি চমৎকার পরীক্ষা; যা দিয়ে আমরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আলোচনা শুরু করেছিলাম, তাকে স্মরণ করতে হবে। সেখানে যেসব ইলেকট্রন কেলাসের বহিঃস্তরে ধাক্কা খেত, সেগুলি আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেট বৃত্ত তৈরী করত।

আমরা কি ধাতুতে ইলেকট্রনের প্রবাহকে বিকিরণশীল ইলেকট্রন ছটারূপে বিবেচনা করতে পারি না? হ্যাঁ, তা পারি। এখানে ইলেকট্রনগুলো মোটামুটি একই দিকে প্রবাহিত হয়, কেবল বিকীর্ণ ইলেকট্রন ছটা প্রস্থ ধাতুখণ্ডের সমগ্র প্রস্থচ্ছেদের চেয়ে অধিকতর। কিন্তু তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই যে, ধাতুতে ইলেকট্রন চলাচলের সঙ্গে চলবে পাতের আয়নের উপর ইলেকট্রনের, যাকে বলা হয়, আভ্যন্তরীণ বিচ্ছুরণ। যদি আমরা ধাতুর মধ্যে একটি আলোকচিত্রের প্লেট রাখতে পারি তাহলে একটি বিচ্ছুরণের নক্সা পাওয়া যাবে।

বিচ্ছুরণের আছে এক চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য : যেসব বস্তু তরঙ্গগুলিকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করে সেগুলির নিয়মিতির যদি সামান্যতম ভ্রষ্টতা ঘটে তাহলে পরিষ্কার নক্সাটি অন্তর্হিত হয় ও আলোকচিত্রের প্লেটটি সমানভাবে

ধোঁয়াটে হয়ে যায়। পদার্থবিদদের ভাষায় তরঙ্গবিক্ষেপ সমরূপ লাভ করেছে।

অশুদ্ধ পরমাণুর উপস্থিতি এবং আয়নের দোলন থেকেই ধাতব কেলাসের নিয়মানুগ কাঠামোয় ঠিক এই ধরণের গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহে যোগদানকারী ইলেকট্রন তরঙ্গ সকল দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অশুদ্ধ পরমাণুর আকৃতি ও ধাতুর ইলেকট্রন খোলস ধাতুর পরমাণু থেকে ভিন্নতর। অশুদ্ধ পরমাণুরা যেন জাফরিকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। সাদৃশ্যটিকে আরো কিছু দূর টেনে বলা যায় যে, অশুদ্ধ পরমাণুরা আমাদের বাড়িটার দালানগুলোকে মোচড় দেয়, দেওয়াল-গুলোকে বেঁকিয়ে ফেলে এবং মেঝেকে এবড়ো-খেবড়ো করে তোলে। এটা খুবই পরিষ্কার যে, দেওয়াল ও মেঝের কাঁপুনি থেমে গেলেও এই সব বিকৃতি থেকেই যায়। অবশ্যই অশুদ্ধ পরমাণু দ্বারা ধাতব পাতে প্রবর্তিত এই বিকৃতিগুলি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয় এবং পরম শূন্য তাপমাত্রাতে তাদের অস্তিত্ব থাকে। এই পাতসম্বন্ধীয় অসম্পূর্ণতায় ইলেকট্রন তরঙ্গের বিক্ষেপই ধাতুর সেই অবশিষ্ট বিদ্যুৎ-রোধের মূল কারণ, যা ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার একেবারে ধারণাতীত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধাতুগুলি মোটেও বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট নয়। অবশ্য সকল ধাতুর ক্ষেত্রে সকল সময় এটি প্রযোজ্য নয়। উন্নত ধরণের কোন কিছু তৈরীর প্রবৃত্তি নিয়েই প্রকৃতি তাই অতিপরিবাহীর সৃষ্টি করে।

কিছু সংখ্যক ধাতু ও সংকর ধাতু (আপাততঃ মাত্র কয়েকটি) অত্যধিক কম তাপমাত্রায় অত্যন্ত অদ্ভুত আচরণ প্রদর্শন করে। পরম শূন্য তাপমাত্রা থেকে দশ ডিগ্রীর মত বেশী তাপমাত্রায় এই বস্তুগুলি অকস্মাৎ তাদের সম্পূর্ণ বিদ্যুৎরোধক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অর্ধশতাব্দী আগে আবিষ্কৃত এই প্রক্রিয়াটি অতিপরিবহন রূপে অভিহিত হল।

এই প্রক্রিয়ার কারণ বিশ্লেষণে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যা ব্যর্থ হল। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, শক্তিশালী কোয়ান্টাম বলবিদ্যাও প্রায় ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পরই যুক্তিসম্পন্ন কোন কিছু খাড়া করতে সমর্থ হয়।

অতিপরিবহনের প্রহেলিকা মাত্র কয়েক বছর আগে অপসারিত হয়েছে। এই রহস্যের কারণটুকু মুক্ত করার পেছনে একটি বিশেষ অবদান সোভিয়েত পদার্থবিদ্ এন, এন, বোগোলাইয়ুবোভ ও তাঁর ছাত্রদের। অতিপরিবহন নিয়ে আর কিছু বেশী বললে আমরা আলোচ্য বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে যাবো। আমরা এটাকে একটি সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা সাদামাঠা অথচ সচিত্র উপমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

অতিপরিবহনের কৌশলের মূলে রয়েছে এই তথ্য যে, পরম শূন্য তাপমাত্রার অতিনিম্ন তাপমাত্রায় কিছুসংখ্যক ধাতুতে ইলেকট্রন মেঘের সঙ্গে আয়নীয় কাঠামো গঠনমূলক বিশেষত্বের দরুণ প্রচণ্ডভাবে বদলে যায়। আগে যেখানে ইলেকট্রন বাহিনী সৈন্যরা নিজেরাই লড়তো, সেখানে অতিনিম্ন তাপমাত্রার অতিপরিবাহিত অবস্থায় ইলেকট্রনরা জোড়া জোড়া বেঁধে চলে।

পদার্থবিদ্যার ভাষায় নতুন ধরণের সংগ্রামের পেছনের কারণ হল এই যে, এখন ধাতুর ইলেকট্রন গতির দ্বারা উদ্ভূত তরঙ্গদৈর্ঘের পরিমাণ আয়নের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্বের সহস্র বা দশ সহস্র গুণ বেশী। এই অধ্যায়টি যত্নসহকারে পাঠ করে থাকলে এই নতুন কৌশলের গোপন কারণ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে: একটি ইলেকট্রন জোড়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তার গতিপথে অবস্থিত আয়ন প্রতিবন্ধকের আকৃতি থেকে এত বেশী যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতির সঙ্গে যুক্ত একক ইলেকট্রনগুলোর ইতস্ততঃ বিক্ষেপ অন্তর্হিত হয় এবং তার সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ-রোধও।

ইলেকট্রন বাহিনীর এই আদর্শ সংগঠন কেবল উপযুক্ত নীচু তাপমাত্রাতেই স্থায়ী। একটি সীমারেখার উর্ধ্বে তাপমাত্রা উঠলে আয়নের সঙ্গে সংঘাত জোড়গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যে রূপান্তরিত করে। বলের ভারসাম্য তখন পরিবর্তিত এবং ধাতুর বিদ্যুৎরোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং ধাতুতে কিভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হয়, তা জানতে চাওয়ার জন্য প্রশ্নটি মূল্যবান সন্দেহ নেই।

॥ ঐ আশ্চর্যজনক 'আংশিক বস্তুসমূহ' ॥

এই আংশিকগুলি যে কি তা বোধহয় ইতিমধ্যেই অনুমান করতে পেরেছেন। প্রকৃতিতে এমন বহু বস্তু আছে, যেগুলি বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবাহীও নয়, অন্তরকও নয় কিন্তু আধাপরিবাহির অন্তর্ভুক্ত।

তাদের আংশিক বা মধ্যবর্তী গুণগত বৈশিষ্ট্য এতই মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে যে, মাত্র কয়েক দশক আগে প্রথম আবির্ভূত আধাপরিবাহীরা একটি প্রযুক্তিবিদ্যা-প্রসূত বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। তারা যেসব গুণগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেগুলি ভালভাবেই জানা: অন্তরকের মত আচরণ না করে আধা-পরিবাহীগুলি ঘরের তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ-রোধ শক্তি তাপমাত্রার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় না, কমে আসে।

অন্তরক, আধা-পরিবাহী ও পরিবাহীর মধ্যে প্রকৃতি একটি সুগভীর বিভক্তি-রেখা টেনে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আমরা ইতিমধ্যেই তাদের পরস্পরের ব্যবধানটা জানতে পেরেছি। ইলেকট্রনপূর্ণ যোজ্য বন্ধনীও বাসিন্দাহীন, অসংখ্য ইলেকট্রন অবস্থাযুক্ত পরিবহন বন্ধনীর মধ্যবর্তী অঞ্চল—এটাই প্রথম অননুমোদিত বন্ধনী।

অন্তরকের ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ অংশ থেকে সর্বনিম্নতলায় লাফিয়ে ওঠার ধাপটি উঁচু হওয়ার দরুণ উক্ত সর্বনিম্নতলায় উত্তোলিত হওয়ার জন্য ইলেকট্রনের প্রচুর শক্তি লাগে। এই শক্তি কেবল উচ্চ তাপমাত্রায়ই লাভ করা সম্ভব (তাপজনিত বিচ্ছেদ স্মরণ করুন)।

আধা-পরিবাহীর ক্ষেত্রে ধাপটি অনেক নীচু। সর্বনিম্নতলায় উঠবার জন্য ইলেকট্রনের যে শক্তি প্রয়োজন, তা কক্ষতাপমাত্রাতেই পাওয়া যাবে। সে-কারণেই স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেও আধা-পরিবাহী বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিবহন করতে থাকে।

অর্থাৎ যখন কোন আধা-পরিবাহীতে খুব দুর্বল বিদ্যুৎক্ষেত্রও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তখন পরিবহন বন্ধনীতে একটি নির্দিষ্ট পথে ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হয়। এখন দেখা যাক ভূগর্ভস্থ অংশে কি ঘটছে।

ওখানেও প্রক্রিয়াগুলি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাপারটা হল এই যে,

ইলেকট্রন যখন ভূগর্ভস্থ অংশ ত্যাগ করে সর্বনিম্নতলায় প্রবেশ করে, তখন সে পেছনে একটি ফাঁকা কক্ষ ফেলে যায়। জনবহুল ঘনবসতিপূর্ণ ভূগর্ভস্থ অংশে তৎক্ষণাৎ বাসস্থলের পুর্নবণ্টন সুরু হয়ে যায়। এখন একটি ইলেকট্রনকে কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়; এটা করা হয় সরাসরি নিকটবর্তী কোন ইলেকট্রনের সাহায্যে। কিন্তু পক্ষান্তরে তার পেছনে আবার ফেলে যায় শূন্য একটি কক্ষ; সেই কক্ষ পুরণের জন্য পুনরায় ডাক পড়ে আর একটি নূতন ইলেকট্রনের।

এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে এইভাবে লাফালাফির সময় এই ভূগর্ভস্থ অংশভুক্ত ইলেকট্রনগুলি সর্বনিম্নতলার মুক্তভাবে চলমান ইলেকট্রনেদের অনুকরণ করে। যেন কোন একটি ক্যাঙ্গারু এক দৌড়বীরকে নকল করছে। দৌড়বীরটি ছোট এবং দ্রুত লাফ দিতে পারে, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় যেন সুষমভাবে গতিবৃদ্ধি করছে; ক্যাঙ্গারু অবশ্য কয়েকটিমাত্র দীর্ঘ লাফ দেয়।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, প্রথম ইলেকট্রন কক্ষটি মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে ফাঁকা হয়েছিল, তাহলে ইলেকট্রনের পুনর্বাসনের কক্ষটি মহানগরীর কাছাকাছি চলে যাবে।

এই চলমান ইলেকট্রন কক্ষটিকে কিছুটা গুরুত্ব হ্রাস করে নাম দেওয়া হল 'গর্ত'। এই গর্তের আচরণটি গর্তত্যাগী ইলেকট্রনের আচরণের ঠিক বিপরীত —কোন বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে গর্তটি ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন কণার মত ভিন্ন দিকে চলতে থাকবে। আরেকটি পার্থক্য এই যে, গর্তটি মন্থরতর অথচ দীর্ঘতর লাফ দিতে দিতে অগ্রসর হয়।

নিম্ন তাপমাত্রায় সকল ইলেকট্রনই নিরাপদে ভূগর্ভস্থ অংশে আটক থাকে। তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি পায়, তত বেশী ইলেকট্রন মুক্তিলাভ করে, বিদ্যুৎপ্রবাহ বেড়ে উঠে এবং আধাপরিবাহীর বিদ্যুৎ-রোধ হ্রাস হয়—ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে অবস্থা ঠিক উল্টো।

এ পর্যন্ত আমরা বিশুদ্ধ আধা-পরিবাহীর কথা বলেছি। বিদ্যুৎপ্রবাহের যান্ত্রিকতাকে এখানে অন্তর্মুখীন পরিবহন বলা হয়। বিশুদ্ধ আধা-পরিবাহীগুলি অবশ্য প্রযুক্তিবিদদের কাছে তেমন আকর্ষণীয়বস্তু নয়। আধা-পরিবাহীর সকলপ্রকার বিস্ময়ই অশুদ্ধতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

॥ কার্যোপযোগী 'ধূলা' ॥

ধূলা, অশুদ্ধতা—দুর্ঘটনার সময় এগুলির খারাপ দিকটা বোঝা গেলেও এগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকলে খুবই কার্যকরী। আধা-পরিবাহীগুলি বস্তুজগতের স্বাভাবিক অবস্থার কোন ব্যতিক্রম নয়, সেগুলিও 'নোংরা' হয়ে যায়। সকল প্রকার অশুদ্ধ বস্তু তাদের কেলাসে অনুপ্রবেশ করে, কিন্তু এগুলো দুর্ঘটনাপ্রসূত এবং অবাঞ্ছিত। এখন কিছু কিছু ভেজাল অত্যন্ত উপযোগী—যখন যথাযথ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। এগুলিই আসল বিস্ময়সৃষ্টিকারী।

হংসীর খাদ্য ও রাজহংসের খাদ্য এক নাও হতে পারে। যদি কেহ উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবহনশীল ধাতু চান, সকল অশুদ্ধতাই ক্ষতিকর। আর আমরা ইতিমধ্যেই তার কারণ জানি: অশুদ্ধ পরমাণুগুলি কেলাস পাতে প্রবেশ করে তাকে বিকৃত করে ফেলে। এই বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা, বিদ্যুৎস্রোত-বাহী ইলেকট্রনদের তরঙ্গগুলো বিক্ষিপ্ত করে দেয়। ফলে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবহনক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিদ্যুৎ-রোধ বৃদ্ধি পায়।

তথাপি এই পাতসংক্রান্ত অশুদ্ধতাই আধা-পরিবাহীর সাফল্যের চাবি-কাঠি। ব্যাপারটি আসলে এই যে, কেলাসের শক্তি-বন্ধনীর কাঠামো কেলাস পাতের ধরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুভূতিশীল। প্রত্যেক কেলাসের তার নিজস্ব রীতির শক্তি-বন্ধনী আছে।

অবশ্য অশুদ্ধ পরমাণুগুলো সামগ্রিক পাতের নয়, কেবলমাত্র তাদের একেবারে নিকটবর্তী অংশের আকৃতি পাল্টাতে পারে। এই অঞ্চলগুলিতে সমগ্র কেলাসের সার্বজনীন বন্ধনী নক্সাটি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। যা ঘটে তা হল এই: অননুমোদিত বন্ধনীতে অতিরিক্ত অনুমোদিত ইলেকট্রন-শক্তির দেখা দেয়, যার দরুন যোজ্য বন্ধনীটি পরিবহন বন্ধনী থেকে বিভক্ত হয়। এই স্তরগুলির উদ্ভব কেবল অশুদ্ধ পরমাণুতেই। আধা-পরিবাহীর সমগ্র কেলাসে অবস্থিত স্তরগুলি থেকে এদের পার্থক্য বুঝবার জন্য এদের বলা হয় স্থানীয় স্তর।

ধাতুতে অশুদ্ধতার পরিমান পরিবহনশীলতাকেও প্রভাবিত করে, কেবল

একটি দিকে—যত বেশী অশুদ্ধতা, পরিবহনশীলতাও তত কম; পরিবর্তন এখানে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। আধা-পরিবাহীর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিবহনশীলতা কেবল অশুদ্ধ পরমাণুর সংখ্যার দ্বারা নয়, তার প্রকৃতিগত কারণেও পরিবর্তিত হতে পারে এবং সেখানে পরিবর্তন দাঁড়াতে পারে সহস্র গুণ বা লক্ষ গুণ।

॥ উদার ও লোভী পরমাণুবৃন্দ ॥

সবচেয়ে পরিচিত অশুদ্ধ আধা-পরিবাহী বর্তমানে দুটি রাসায়নিক মৌল পদার্থ, জারমেনিয়াম ও সিলিকনের বুনিয়াদের উপরেই স্থাপিত। একবার মৌল পদার্থের পর্যায়বৃত্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন: সিলিকন হল ১৪ নং এবং জারমেনিয়াম ৩২ নং। তারা উভয়েই চতুর্থ গ্রুপের বাসিন্দা। মনে আছে এই গ্রুপকে আমরা কি বলেছিলাম? বলেছিলাম মধ্যবর্তী গ্রুপ। আর এটাই যথাযথ চিত্র। জারমেনিয়াম ও সিলিকন পরিবাহী বা অন্তরক কোনটাই নয়, তারা প্রকৃত আধা-পরিবাহীই বটে।

উভয় পরমাণুর বহিঃস্থ খোলকে রয়েছে চারটি ইলেকট্রন। যখন পরমাণুগুলো কেলাস পরিণতিলাভ করে, এই সকল ইলেকট্রনগুলি অপর পরমাণুর সঙ্গে বন্ধন স্থাপনে উদ্যোগী হয়। তারা ভূগর্ভস্থ অঞ্চলে ক্রীতদাস মাত্র। তাই নিম্ন তাপমাত্রায় সিলিকন ও জারমেনিয়াম বিদ্যুৎস্রোত পরিবহন করে না।

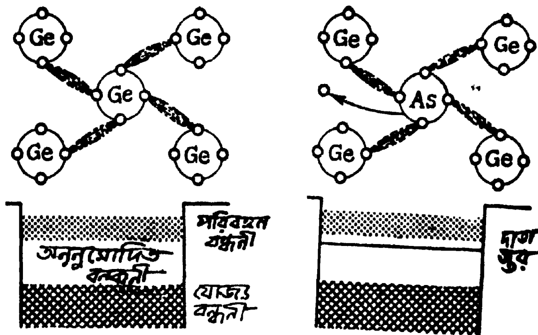
কিন্তু জারমেনিয়ামের সঙ্গে তার একটি প্রতিবেশী পরমাণু যোগ করা হোক; ধরুন পঞ্চম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত আর্সেনিক (৩৩ নং)। স্থানে স্থানে আর্সেনিক পরমাণুগুলো জারমেনিয়াম পরমাণুদের অপসারিত করে পাতের মধ্যে তাদের স্থান দখল করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক আর্সেনিক পরমাণুকে অপসারিত জারমেনিয়াম পরমাণুর কাজ করতে হবে।

আর্সেনিক পরমাণুর বহিঃস্থিত খোলকে আছে পাঁচটি ইলেকট্রন। জারমেনিয়াম পরমাণুর স্থান পূরণ করছে। এই যে পাঁচটি ইলেকট্রন তাদের মধ্যে চারটি নিয়োজিত হয় সেই পরমাণুর রাসায়নিক বন্ধনটি অটুট রাখার জন্য। কিন্তু পঞ্চম ইলেকট্রনটি বেকার থাকে।

গাণিতিক হিসাব থেকে দেখা যায় যে, এই ইলেকট্রনের শক্তি সম্পূর্ণভাবে

অননুমোদিত বন্ধনীর স্থানীয় স্তরের অনুরূপ, যদিও সীমারেখার নিকটবর্তী। এই ইলেকট্রনটিকে পরিবহন বন্ধনীতে ঠেলে দেবার পেছনে খুব কম শক্তি লাগে—অননুমোদিত বন্ধনীর উচ্চতা থেকেও ১০-১৫ গুণ কম।

আর্সেনিক পরমাণু নিজের বাড়তি ইলেকট্রনটি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার এবং সেটিকে তার নিমন্ত্রণকর্তা কেলাসকে প্রদান করে ; তাই তাকে দাতা বলা হয়। যথাক্রমিক ইলেকট্রনস্তরগুলিকে বলা হয় দাতা স্তর (১৯ নং চিত্র)।



চিত্র নং ১৮ চিত্র নং ১৯

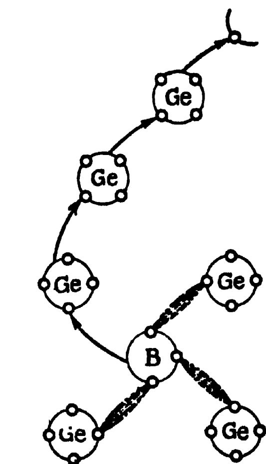
এখন ধরুন, আর্সেনিকের বদলে জারমেনিয়ামের বামপার্শ্বের গ্রুপের কোন মৌল পদার্থ নেওয়া যাক, যেমন বোরন (৫ নং)। বোরনের অবস্থান III গ্রুপে, অর্থাৎ তার বাহিরেকার খোলকে রয়েছে তিনটিমাত্র ইলেকট্রন। যখন কেলাস পাতে বোরন জারমেনিয়াম পরমাণুর স্থান দখল করে, সে চারটির মধ্যে তিনটি মাত্র রাসায়নিক বন্ধনকে পরিচালনা করতে পারে।

আসলে যা ঘটে, তা এই : বোরন পরমাণু তার প্রতিবেশী জারমেনিয়াম পরমাণুর কাছ থেকে একটি ইলেকট্রন চুরি করে। এটা সংক্রামক। এর পরেই নিকট প্রতিবেশীর কাছ থেকে জারমেনিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন কেড়ে নেয় এবং এই প্রক্রিয়া প্রতিবেশীও অণুকরণ করে। যে জারমেনিয়াম পরমাণু সর্বপ্রথম তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে চুরি করেছিল, ফাঁকা ইলেকট্রন কক্ষটি সেই পরমাণু থেকে ক্রমশই দূরে চলে যায় (২০ নং চিত্র)

এটি খুব পরিচিত চিত্র, ঠিক স্থানত্যাগী গর্তের মত। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে যোজ্য বন্ধনী থেকে ইলেকট্রন তাপনাত্রার দরুন উৎক্ষিপ্ত হয় না, হয় বোরনের একটি পরমাণুর উপস্থিতির জন্য।

এই প্রক্রিয়ায় আমরা তলদেশের নিকটবর্তী অননুমোদিত বন্ধনীতে স্থানীয় শক্তিস্তর গঠন আবার লক্ষ্য করি। আর পার্থক্য কেবল এই যে, ইলেকট্রন নয়, গর্তগুলিই সেগুলোতে বাস করবে।

তস্কর বোরন মত পরমাণুগুলোকে বলা হল গ্রহীতা। ক্রমানুসারী গর্ত স্তরকে বলা হল গ্রহীতা স্তর (২০নং চিত্র দেখুন)।





চিত্র নং ২০

সুতরাং বিদ্যুৎ পরিবহন ঘটছে দ্বিবিধ-ইলেকট্রন দ্বারা বা গর্ত দ্বারা —জারমেনিয়াম বা সিলিকনের পাতে অবস্থানকারী পরমাণুর প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে।

আমরা পাঠককে পুনরায় স্মরণ রাখতে বলি যে, ইলেকট্রন গতিকে অভিহিত করার জন্যই গর্তের রূপে সহজ চলতি ধারণা করা হয়। ইচ্ছা করলে গর্তটিকে পরিপূর্ণ যোজ্য বন্ধনীর এক পরমাণু থেকে অপর পরমাণুতে লম্ফমান ক্যাঙ্গারুসদৃশ ইলেকট্রনরূপেও গ্রহণ করতে প্যারেন। তাহলে পরিবহন বন্ধনীর ইলেকট্রনটি অনেকটা সুসমঞ্জসভাবে অগ্রসরমান দৌড়বীররূপে প্রতিফলিত হবে, যে দৌড়বীরের পদক্ষেপ খাটো অথচ দ্রুত। আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, পরিবহন বন্ধনীতে ইলেকট্রন স্তরগুলি পরস্পরের থেকেও বিচ্ছিন্ন, কিন্তু স্তরগুলির মধ্যে এই দূরত্বগুলি এত তুচ্ছ যে, স্তরগুলি প্রকৃতপক্ষে মিশে যায়।

এখন আমাদের কাহিনীতে ফিরে দেখা যাক, জারমেনিয়ামের সঙ্গে বোরোন ও আর্সেনিক পরমাণু একত্রীভূত করলে কি হয়। জারমেনিয়ামের কি পরিবহনশীলতা হবে? এটা উভয় অশুদ্ধতার পরমাণু সংখ্যার ক্রমানুপাতের উপরেই স্বভাবতঃ নির্ভর করবে। যদি বেশী আর্সেনিক থাকে, পরিবহন হবে ইলেকট্রনীয়, কিন্তু উল্টো হলে গর্ত পরিবহন পাওয়া যাবে।

এই একত্রীভূত মিশ্রণ থেকেই আধা-পরিবাহীর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগপদ্ধতি। এই ধরণের দ্বিবিধ অশুদ্ধযুক্ত আধা-পরিবাহী বিদ্যুৎপ্রবাহের একটি দিক বন্ধ করে অপর দিকে চালিত করতে সক্ষম। যার অর্থ, আধা-পরিবাহীগুলি প্রতিকারপন্থী।

আধা-পরিবাহীগুলি আর যা করতে পারে তা হল এই যে, কম বিভবকে উচ্চ বিভবে পরিণত করা (এখানেও তাদের বিদ্যুৎরোধের সামর্থ্যের জন্য)। যার অর্থ, তারা পরিবর্ধকরূপে কাজ করতে পারে।

এই ছোট, ঘনবিন্যস্ত, শক্তসামর্থ এবং স্বল্পমূল্যের আধা-পরিবাহী যন্ত্রগুলি অনেক পূর্বেই বিরাট, কিম্ভূতকিমাকার ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের স্থলে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

আধা-পরিবাহীতে আঘাতকারী ফোটনগুলি ইলেকট্রনটিকে ধাক্কা দিয়ে যোজ্য বন্ধনী থেকে পরিবহন বন্ধনীতে পৌঁছিয়ে দেয়। সার্কিটে অবস্থিত আধা-পরিবাহী আলোকিত হলে বিদ্যুৎস্রোত পরিবহন করতে থাকে। যার অর্থ, আধা-পরিবাহীগুলি আলোকশক্তিকে সরাসরিভাবে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপায়িত করতে পারে। আধা-পরিবাহীগুলি সে কাজ ইতিমধ্যেই করছে এবং ধাতুর চেয়ে বেশী দক্ষতা সহকারেই করছে।

এক্ষেত্রের সূচনা-কার্য্যে সোভিয়েত পদার্থবিদ এ, ইয়োফে ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান অসামান্য।

মরুভূমি অঞ্চলে সিলিকন ব্যাটারিগুলি সৌররশ্মির অত্যুত্তপ্ত ধারাকে বিদ্যুতে পরিণত করে; পৃথিবীর তৃষ্ণার্ত কোণে জল সঞ্চালনের জন্য সেচ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত মোটরগুলিকে চালনা করে সেই বিদ্যুৎ। আধা-পরিবাহী বৈদ্যুতিক ব্যাটারিগুলি মহাকাশ উদ্‌ঘাটনের কাজেও প্রয়োগ করা হয়েছে।

আধা-পরিবাহী সরাসরিভাবে তাপসংক্রান্ত শক্তিকেও বিদ্যুতে পরিণত করে। এখন আর বৃহদায়তন জলবাষ্প পাওয়ার স্টেশন, যেখানে প্রথমে তাপ

জলকে বাষ্পে পরিণত করে এবং তারপর বাষ্পটি ডায়নামোর মোটরের সঙ্গে যুক্ত টার্বাইন চালায়, তার দরকার নেই। এটি এখনই সেকেলে হয়ে গেছে এবং একদিন এ সম্পূর্ণভাবেই অন্তর্ধান করবে। ইতিমধ্যেই কেরোসিন বাতির তাপকে বিদ্যুতে পরিণত করে আধা-পরিবাহীগুলি তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদকরূপে কাজ করছে, কাজ করছে চলমান অংশহীন রেফ্রিজারেটার হিসাবে।

এটা কেবল সূচনা। এই বিস্ময়কর ক্ষুদ্র কেলাসের সম্মুখে রয়েছে এক অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

। পঞ্চম অধ্যায় ।

পারমাণবিক কেন্দ্রকের অন্তঃপুরে

॥ চৌকাঠের সীমানায় ॥

অনু, পরমাণু, কেলাস······তারপর ?

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে এখন আমরা সরাসরি পারমাণবিক কেন্দ্রকের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করব। এখানে অনেক রহস্য এখনো অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে।

পারমাণবিক কেন্দ্রকের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে আমরা কোন্ নতুন জগতের সন্ধান পাব, তা এই শতাব্দীর বিশ দশকেও কেউ কল্পনা করতে পারেন নি; পদার্থবিজ্ঞানীর মনে ছিল শুধু কৌতূহল। আশা ছিল, পারমাণবিক কেন্দ্রক থেকে অনেক কিছুই জানা যাবে। সেটা ছিল পরমাণুর রহস্যভেদের লড়াইয়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রথম জয়লাভের কাল। কিন্তু পরমাণুর গভীর অন্তঃস্থল সম্বন্ধে তখন প্রায় কোন কিছুই জানা যায় নি।

এই বিষয়ে তৎকালীন যুগে যতটুকু জানা ছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আমরা আলোচনা সুরু করব। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে ফ্রান্সী বৈজ্ঞানিক বেকরেল সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন যে, কয়েকটি পদার্থ ক্যামেরা-প্লেটের ওপর কুয়াসা সৃষ্টি করতে পারে। এই আবিষ্কারের সূত্র অনুসরণ করে মেরী স্লোডোস্কা ও পিয়ের কুরি দেখতে পেলেন যে, ক্যামেরা প্লেটের উপর এই ধরণের কুয়াসা সৃস্টি করবার ক্ষমতা আছে তিনটি রাসায়নিক পদার্থের। এই তিনটি পদার্থ হল—রেডিয়াম, পোলোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম, পর্যাবৃত্ত ছকে যাদের স্থান শেষের দিকে।

এই ঘটনার নাম দেওয়া হল তেজস্ক্রিয়তা। সে যুগের তত্ত্বজ্ঞ মহল এই আবিষ্কারে যথেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়েন, কারণ ঘটনাটি কেন ঘটে তার কোন সদুত্তর ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান দিতে পারে নি। এদিকে এই অজ্ঞাত বিকিরণ সম্পর্কে ক্রমেই বহু নতুন তথ্য বিজ্ঞানীর হাতে জমতে থাকে। দেখা গেল, বিকিরণ তিন প্রকার : আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি।

আরও বিশদ অনুধাবনের ফলে জানা গেল যে, আলফা রশ্মিগুচ্ছ ধনাত্মক আধানবাহী কণিকা। ইলেকট্রনে যে পরিমান আধান থাকে, একটি আলফা কণিকায় থাকে তার দ্বিগুণ, আর এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের প্রায় চারগুণ। বিটা রশ্মি আর ইলেকট্রন অভিন্ন। পদার্থ-বিজ্ঞানীর মতে গামা রশ্মিগুলি হল মূলতঃ অতি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ ; তার অন্তর্ভেদশক্তি সুবিখ্যাত রন্‌জন্ রশ্মির চেয়ে অনেক বেশী।

এই আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তাঁর ছাত্র বোর-এর সহযোগে দেখালেন যে, পরমাণুর গঠন সৌরজগতের অনুরূপ। কেন্দ্রীয় "সূর্য"-টি হল পারমাণবিক কেন্দ্রক। ইলেকট্রনগুলি গ্রহের মত তাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে আমরা জানতে পারলাম যে, তেজস্ক্রিয়তার উৎস হল পারমাণবিক কেন্দ্রক।

অবশ্য আলফা কণিকাগুলির ক্ষেত্রে একথা আগেই উপলব্ধি করা হয়েছিল যে, পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রক ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তারা থাকতেই পারে না। পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরটাই আছে এই কেন্দ্রকে। অন্যদিকে, ইলেকট্রনগুলি অবস্থান করে পরমাণুর বহিঃস্থ খোলকে। এটাও আমরা প্রায়শঃই দেখতে পাই যে, ফোটনগুলি (বিদ্যুৎচৌম্বক শক্তির কোয়াণ্টাম) ঐ বহিঃস্থ খোলক থেকেই ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পরমাণুর বিদ্যুৎচৌম্বক কাঠামো থেকেই বিটা এবং গামা রশ্মির জন্ম।

না, স্পষ্টতঃ তা অসম্ভব। কারণ যখন একটি পরমাণু থেকে বিটা রশ্মি বেরিয়ে আসে তখন পরমাণুটি আয়নিত হয় না, বৈদ্যুতিক আধান অর্জন করে না। অর্থাৎ তার ইলেকট্রনীয় কাঠামোটির কোন পরিবর্তন হয় না। ইলেকট্রন খোলকের উল্লম্ফনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিগোচর আলোক এবং রন্‌জন্ রশ্মির ফোটনসমূহের শক্তির আরো হিসাব করা হল এবং দেখা গেল যে, এর পরিমাণ গামা রশ্মির ফোটন শক্তির ভগ্নাংশ মাত্র। এই ধারণা সমর্থন করল যে, এই দুই ধরণের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পারমাণবিক কেন্দ্রক থেকেই উদ্ভূত।

এর পর আরো কয়েক বছর কেটে গেল। তত্ত্বজ্ঞ মহল রাদারফোর্ডের কাছ থেকে আরো নতুন চিন্তার খোরাক পেলেন। রেডিয়াম থেকে আবির্ভূত আলফা রশ্মির পথে তিনি নাইট্রোজেন কেন্দ্রক রেখে দিয়ে এক

আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করলেন। যে ক্যামেরা প্লেটে নাইট্রোজেন কেন্দ্রকের সঙ্গে আলফা রশ্মির সংঘর্ষের ছবি তোলা হল, তাতে দেখা গেল···কয়েকটি অক্সিজেন কেন্দ্রকের সুস্পষ্ট ছাপ! কিমিয়াবিদের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণত হল: রাসায়নিক বস্তুর রূপান্তর সাধন করা হল, যদিও এই রূপান্তরে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হল না।

সেই বছরেই রাদারফোর্ড প্রথম কেন্দ্রকীয় রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হলেন; তিনি দেখতে পেলেন যে, একই মৌল রাসায়নিক পদার্থের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলির ভর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অংক কষে দেখা গেল যে, ঐ বিভিন্ন ভরগুলির পারস্পরিক পদার্থের পরিমাণ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের গুণিতক বা তার কাছাকাছি। এই ধরণের ভিন্ন ভরের কেন্দ্রগুলিকে আইসোটোপ নাম দেওয়া হল।

॥ প্রথম পদক্ষেপ ॥

তেজস্ক্রিয়তা, কেন্দ্রকের রূপান্তর এবং তারপর এল আইসোটোপ। এখন নিশ্চয়ই পারমাণবিক কেন্দ্রকের একটা তত্ত্ব খাড়া করার দিকে প্রথম পদক্ষেপের সময় উপস্থিত হয়েছে। অত্যাশ্চর্য তথ্যগুলি সবই তো পাওয়া গেছে এবং আমাদের হাতে আছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, যার ক্ষমতা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞদের কোন তাড়াহুড়া দেখা গেল না। তাঁরা আদিম মহারণ্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে তার মর্মরধ্বনি শুনতে লাগলেন, তার সুবাস আঘ্রাণ করতে লাগলেন; অরণ্যের ভিতরে ঢুকতে তাঁদের ভয় করতে লাগল। তাঁদের সদ্যোজাত সন্তান কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে নতুন পরিবেশের দুঃসহ অবস্থার অধীনস্থ করতে এখনও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না।

প্রথমে তাঁরা পরীক্ষণকারীদের বললেন, অরণ্যে প্রবেশ করার একটা পথ কেটে দিতে। অনতিবিলম্বেই তা করা হল: ১৯৩২ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী চ্যাড্‌উইক নিউট্রন আবিষ্কার করলেন। নিউট্রনকে পাথেয় করে অগ্রসর হওয়া এখন সম্ভব হল।

কিন্তু একটি প্রশ্নের কোন সদুত্তর এখনো তাঁরা পান নি। তা হল,

কোন্ কোন্ বিশিষ্ট কণিকার সমন্বয়ে পারমাণবিক কেন্দ্রক গঠিত? অবশ্য একথা তাঁরা জানতেন যে, কেন্দ্রক কোন একক কণিকার দ্বারা গঠিত নয়, তার মধ্যে অনেক রকমের কণিকা আছে। এ কথা না স্বীকার করলে তেজস্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা কি ভাবে করা যাবে? তেজস্ক্রিয়তার ফলে এক ধরণের কণিকা কেন্দ্রক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেও কেন্দ্রক কেন্দ্রকই থেকে যায়। তার তো কোন লোপ হয় না? তাছাড়া কেন্দ্রকের অন্তর্ভুক্ত অন্তত একটি কণিকা-প্রোটনের কথা তো আমরা বহু আগেই জেনেছি।

সুতরাং মনে হতে পারে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণে যে কণিকাগুলি পাওয়া যায়—যেমন আলফা কণিকা ও ইলেকট্রন, তাদের দ্বারাই কেন্দ্রক গঠিত। কিন্তু এই অনুমান অতি সরল। হিলিয়াম কেন্দ্রকে যে সকল গুণ লক্ষ্য করা যায়, আলফা কণিকাতেও সেই সকল গুণ বিদ্যমান বলে প্রতীয়মান হল। কিন্তু তার চেয়েও হালকা কেন্দ্রক আছে, হাইড্রোজেন কেন্দ্রক। অতএব হাইড্রোজেন কেন্দ্রকই কেন্দ্রকীয় সৌধনির্মাণের ক্ষুদ্রতম প্রস্তর রূপে বিবেচ্য। আর যেহেতু এইটিই হল সর্বপেক্ষা মৌলিক কণিকা, তাই গ্রীক ভাষায় এর নামকরণ করা হল প্রোটন।

এইবার আমরা কেন্দ্রকের মডেল তৈরির কাজ সুরু করতে পারি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই কাজ করতে গিয়ে আমরা যেন একটি মূল নীতি ভুলে না যাই। সেই মূলনীতি হল, কেন্দ্রকে যে বৈদ্যুতিক আধান থাকবে, তা হবে পরমাণুর বহির্ভাগে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলির বৈদ্যুতিক আধানের সমপরিমাণ এবং তার চিহ্ন হবে পূর্বোক্ত আধানের বিপরীত (ধনাত্মক)। না হলে পরমাণুটি সামগ্রিকভাবে আধানবিহীন হতে পারে না, যেমনটি আমরা দেখি। কেন্দ্রকের ভরের পরিমাণ কত হবে তাও আমরা জানি: এক বিশেষ ভর থেকে ইলেকট্রন খোলগুলির ভর বাদ দিলে যা থাকে, পরমাণুটির কেন্দ্রকের ভর মোটামুটি তার সঙ্গে সমান।

সুতরাং আমাদের আলোচনাকে সঠিক পথে চালাবার মত একটি প্রাথমিক প্রকল্প পাওয়া গেল। কেন্দ্রক প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংযোগে গঠিত। হাইড্রোজেন কেন্দ্রকে একটি মাত্র প্রোটন আছে, এর মধ্যে কোন ইলেকট্রনই নেই। হিলিয়াম কেন্দ্রকে আছে চারটি প্রোটন ও দুটি ইলেকট্রন এবং এর আধান হল, $+4-2=+2$; এর ভর হাইড্রোজেন কেন্দ্রকের

ভরের তুলনায় চারগুণের চেয়ে কিছু বেশী। অন্য দিকে বলা যেতে পারে যে, প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রন প্রায় 'ওজনবিহীন'—প্রোটন কণিকার চেয়ে প্রায় 2,000 গুণ হাল্‌কা।

আরো অগ্রসর হওয়া যাক্‌। লিথিয়াম কেন্দ্রকের ভর ও আধান, যথাক্রমে 7 এবং +3; আর এর মধ্যে আছে 7টি প্রোটন ও 4টি ইলেকট্রন। বোরন কেন্দ্রকের ভর ও আধান যথাক্রমে 11 ও +5, এর মধ্যে আছে 11টি প্রোটন ও 6টি ইলেকট্রন। নাইট্রোজেনে আছে যথাক্রমে (14 ও +7), 14টি প্রোটোন ও 7টি ইলেকট্রন এবং অক্সিজেনে (16 ও +8) আছে 16টি প্রোটন ও 8টি ইলেকট্রন। অন্যান্য মৌলগুলিও অনুরূপভাবে গ্রঠিত।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হয় যে, আমাদের বিশ্লেষণ সঠিক পথে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। হাল্‌কা কেন্দ্রকের গঠন প্রণালী সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্লেষণ প্রযুক্ত হতে পারে কিন্তু মাঝারী বা বেশী ভরের কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে নয়। তাদের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। কেন হয়, তা উদাহরণের সাহায্যে সহজেই দেখানো যেতে পারে। লৌহকেন্দ্রকের ভর 56 (এটিকে আরো সঠিকভাবে ভর-সংখ্যা বলা যেতে পারে, কারণ এর থেকে জানা যায় কেন্দ্রকের ভর প্রোটনের ভর অপেক্ষা কতগুণ বেশী) এবং তার আধান +26 ; অতএব এই কেন্দ্রকে 56টি প্রোটন ও 30টি ইলেকট্রন থাকার কথা ; অনুরূপভাবে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে (যার ভর সংখ্যা 238 এবং আধান +92) 238টি প্রোটন ও 146টি ইলেকট্রন পাওয়া চাই।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি নতুন কেন্দ্রকে প্রকৃতি একাধিক প্রোটন যোগ করে। আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী একটি করে প্রোটন নয়। অথচ যদি আমরা এই মত বর্জন করি, তাহলে কেন্দ্রকের ভর ও আধান নিয়ে আমাদের ভীষণ গোলমালের সম্মুখীন হতে হয়। তার ফলে কেন্দ্রকের গঠন প্রণালীর সুশৃংখলতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা ভেঙে পড়ে। তাছাড়া, আইসোটোপের জন্ম কোথা থেকে হয়, তার সঠিক ব্যাখ্যাও আমরা পাই না। কেন্দ্রকের ঘূর্ণন সম্বন্ধেও গোড়া থেকেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রকের ঘূর্ণনের মোট পরিমাণ তার অন্তর্ভুক্ত কণিকাদের ঘূর্ণনগুলির যোগফলের সঙ্গে সমান হবে। যেমন, আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারী হাইড্রোজেনের

(ডয়টেরিয়াম) কেন্দ্রক গঠিত হয় দুটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের দ্বারা : অতএব এই কেন্দ্রকের ঘূর্ণনের পরিমাণ হওয়া উচিত তিনটি প্রোটনের ঘূর্ণনের পরিমাণের সমান (এখানে ধরা হয়েছে যে, প্রোটন ও ইলেকট্রনের ঘূর্ণন সমপরিমাণ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, উক্ত ঘূর্ণন দুটি প্রোটন ঘূর্ণনের সমান। এবং এটাই একমাত্র গরমিল নয়। বরং বলা যায় যে, আমাদের হিসাব অনুযায়ী (এই ছক অনুসারে) কেন্দ্রকের ঘূর্ণনের পরিমাণ যা হওয়া উচিত এবং কার্যতঃ মাপের দ্বারা তার যে পরিমাণ পাই, সেই দুয়ের মিল কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং কেন্দ্রকের গঠন প্রণালী সম্পর্কে আমাদের ধারণায় নিশ্চয় কোথাও মারাত্মক ত্রুটি থেকে গেছে।

ঠিক তাইই! পরীক্ষণের দ্বারা কেন্দ্রকে যতটা আধানের সন্ধান পাওয়া যায়, কেন্দ্রকের ইলেকট্রনগুলির কাজ সেই আধানকে গড়ে তোলে। কিন্তু তাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যও আছে। সমধর্মী আধানের বাহক বলে পারমাণবিক খোলকের ইলেকট্রনগুলির মত প্রোটন কণিকাগুলিও পরস্পর পরস্পরকে ঠেলে দেয়। সুতরাং ইলেকট্রনগুলির কাজ হল প্রোটন কণিকাগুলিকে একত্রে ধরে রাখা।

হিসাব করে অতি সহজেই দেখানো যায় যে, আমরা কেন্দ্রকগঠনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম, তদনুসারে কেন্দ্রকের যে পরিমাণ ইলেকট্রনীয় আধান বা ধারক শক্তি থাকার কথা, তার থেকে অনেক বেশী ধারক শক্তি তার আছে। এ ছাড়াও অন্যান্য অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, কেন্দ্রকের মধ্যে ইলেকট্রন আছে, এ ধারণা আপত্তিজনক। এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

আলোচনার এই মোড়ে আসার পর তত্ত্বজ্ঞ মহল প্রশ্ন করলেন, সত্যই কি কেন্দ্রক প্রোটন আর ইলেকট্রনের দ্বারা গঠিত? এই মূল প্রশ্ন উত্থাপিত হবার পরেই নিউট্রন নামে একটি নতুন কণিকার কথা শোনা গেল। সেই বছরেই (১৯৩২) হাইসেনবার্গ এবং সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ডি ইভানেন্‌কো ও আই. টাম গণিতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভর করে একটি সুচিন্তিত প্রকল্প দাঁড় করালেন। এই প্রকল্পে বলা হল, যে, কেন্দ্রক শুধু মাত্র প্রোটন ও নিউট্রনের দ্বারা গঠিত। এটাই কেন্দ্রকের রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রথম পদক্ষেপ।

॥ দ্বিতীয় পদক্ষেপ ॥

ইলেকট্রন খোলকের গঠনের মত পারমাণবিক কেন্দ্রকের গঠনেও প্রকৃতির মিত্যব্যয়িতার নিদর্শন পাওয়া যায়। শুধু তফাৎ এই যে, কেন্দ্রক গঠনের ক্ষেত্রে দুই ধরণের ইঁট ব্যবহার করা হয়েছে। একটি হল প্রোটন আর অপরটি নিউট্রন।

প্রতিবার একটি করে প্রোটন যোগান দেওয়ার সময় প্রকৃতিকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, প্রোটনগুলির পারস্পরিক বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে কেন্দ্রক যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে না যায়। হাল্‌কা মৌলগুলির ক্ষেত্রে (মোটামুটি ক্যাল্‌সিয়াম অবধি যার সংখ্যা ২০) দেখা যায় যে, কেন্দ্রকে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা প্রায় অভিন্ন। কিন্তু তারপরে আরো ভারী মৌলগুলির ক্ষেত্রে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের তুলনায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মৌলের ভর যত বেশী হয়, এই ব্যবধানও তত বেশী বাড়তে থাকে। ইউরেনিয়ামের (যার ভর সংখ্যা ২৩৮ ও প্রোটন সংখ্যা ৯২) ক্ষেত্রে আমরা পাই ১৪৬টি নিউট্রন।

যখন দেখা গেল যে, এভাবে ভিত্তি তৈয়ারী করা হলে কেন্দ্রক অটুট থাকবে, তখন প্রকৃতি তার গঠন প্রণালীতে কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করল। অর্থাৎ ইচ্ছামত কখনও কেন্দ্রকের কোন অংশে কিছু বেশী নিউট্রন যুক্ত করে দেওয়া হল, আবার কখনও বা তার উল্‌টো কাজ করা হল—নিউট্রনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল। এই ধরণের যোগ-বিয়োগের ফলে সৃষ্টি হল আইসোটোপগুলি—যারা একই মৌলের বিভিন্ন রূপান্তর। যেমন ধরুন, টিন-কেন্দ্রকের দশটি সুদৃঢ় আইসোটোপ পাওয়া গেছে।

এর থেকে খুব সহজেই দেখা যায় যে, কেন্দ্রকের ভর ও আধান সংক্রান্ত যে সব তথ্য আমরা পেয়েছি, তা হাইসেনবার্গ-ইভানিনকো-ট্যামের প্রকল্পকে চমৎকার ভাবে সমর্থন করে। এই প্রকল্প অনুযায়ী হাইড্রোজেন কেন্দ্রকে আছে একটি প্রোটন ; হিলিয়াম কেন্দ্রকে, যার ভর সংখ্যা ৪ (হিলিয়াম-৪, আছে ২টি প্রোটন, ২টি নিউট্রন ; লিথিয়াম-৭এর কেন্দ্রকে ৩টি প্রোটন, ৪টি নিউট্রন ; বোরন-১১ কেন্দ্রকে ৫টি প্রোটন, ৬টি নিউট্রন ; নাইট্রোজেন-১৪

কেন্দ্রকে ৭টি প্রোটন, ৭টি নিউট্রন ; অক্সিজেন-১৬ কেন্দ্রক তৈরী হয়েছে ৮টি প্রোটন এবং ৮টি নিউট্রন দিয়ে ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নিউট্রন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি? এই কণিকাটির ভর প্রোটনের ভরের সমপরিমাণ। আর এর নামকরণের সার্থকতা এই কারণে যে, এর কোন বৈদ্যুতিক আধান নেই। এই কণিকা বৈদ্যুতিক ভাবে নিরপেক্ষ।

কোন্ অধিকারে কেন্দ্রকে ইলেকট্রনের স্থান এই কণিকাটি গ্রহণ করে? ইলেকট্রন অন্তত প্রোটনগুলিকে এক সঙ্গে ধরে রাখতে পারত। কিন্তু সেই কাজ আধানবিহীন নিউট্রনের দ্বারা কি করে হতে পারে?

এই পর্যায় এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তিগুলি কেন্দ্রকের স্থায়িত্বের যথেষ্ট কারণ নয়। কেন্দ্রকগুলি সত্যিই খুবই ঝুনা। রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিপুল চাপ বা উত্তাপ অথবা প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি, এই সব উপায়ে কেন্দ্রককে ভেঙ্গে ফেলার কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত সফল হয় নি। অথচ এই হাতিয়ারগুলির সবকটিই কেন্দ্রকের বহির্ভূত ইলেকট্রনীয় কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

তাই বৈজ্ঞানিকমহল সিদ্ধান্ত করলেন যে, কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রন কণিকার অবস্থানের নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ আছে। বস্তুতঃ, নিউট্রনই কেন্দ্রকের প্রোটনগুলিকে এক যোগে বেঁধে রাখার ব্যাপারে সিমেণ্টের কাজ করে। কিন্তু কি প্রকারের বল, এই আমাদের প্রশ্ন। বলটা নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক নয়, কারণ নিউট্রন আধানবিহীন, নিরপেক্ষ।

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায় বৈজ্ঞানিক মহল কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন এবং নিউট্রন আবিষ্কারের দু'বছর পরে আই. ট্যাম ও জাপানী বৈজ্ঞানী উকাওয়া এই প্রতিভাদীপ্ত ধারণা উপস্থাপিত করলেন যে, কেন্দ্রকের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের অত্যন্ত জোরালো কেন্দ্রকীয় বল আছে, যেগুলিকে বলা যেতে পারে বিনিময়াত্মক আকর্ষণীয় বল। এদের কার্যকারিতা প্রোটন ও নিউট্রনের অত্যন্ত সল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বিনিময়াত্মক বল? কথাটি আমাদের অপরিচিত নয় (কারণ, এই ধরণের বলের প্রভাবেই হাইড্রোজেনের প্রতিটি অণুতে দুটি করে পরমাণু একত্রে বাঁধা থাকে। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও আরো অনেক মৌল পদার্থের স্থায়িত্বশীল অণু পরমাণু-গুলিকেও বেঁধে রাখে একই বল। এই সব

অণুগুলিতে পারমাণবিক ইলেকট্রনের আদানপ্রদান অবিরাম চলতে থাকে এবং তার ফলেই পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকে।

কিন্তু পারমাণবিক কেন্দ্রকে কি ধরণের বিনিময় চলে? প্রোটন ও নিউট্রন, দুটি ভিন্ন ধরণের কণিকা। কেন্দ্রকে কোন ইলেকট্রন নেই। কাজেই আমাদের জানা দরকার, প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে কিসের বিনিময় চলে? টামের একটি হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ইলেকট্রন বিনিময়ের ফলে যে সংসক্তক বলের সৃষ্টি হয় তা কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলিকে বেঁধে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের সামনে মাত্র দু'টি পথ খোলা। হয় রণে ভঙ্গ দিয়ে স্বীকার করা যে, বিমিময়াত্মক বলের ধারণা ভ্রান্ত, না হয় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা যে, বাহ্যিক বহু অমিল সত্ত্বেও মূলতঃ প্রোটন ও নিউট্রন সমধর্মী এবং এদের একটিকে অপরটিতে পরিণত করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রোটন কণিকাকে নিউট্রন কণিকায় এবং নিউট্রন কণিকাকে প্রোটন কণিকায় পরিণত করা যায়।

নিঃসন্দেহেই এই চিন্তাধারা অত্যন্ত দুঃসাহসিক। ১৯৩৪ সালে যখন এই প্রকল্পের উদ্ভব হয়, তখন পর্যন্ত পদার্থের বিভিন্ন মৌল কণিকাগুলির একটিকে অপরটিতে পরিণত করার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নি। এ কথা সত্য যে, এর দু' বছর আগে ইলেকট্রন ও পজিট্রনকে গামা-রশ্মির ফোটনে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আলোচ্য চিন্তাধারার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বিজ্ঞানীদের মনে হল যে, দু'টি কণিকার পারস্পরিক রূপান্তরে নিশ্চয় কোন কিছুর আদান-প্রদান হয়। প্রোটন কণিকা এই 'কোন কিছু' আত্মসাৎ ক'রে নিউট্রনে পরিণত হয় এবং যখন নিউট্রন এই বস্তুটি হারায় তখন একটি প্রোটনের আবির্ভাব হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ধরণের আদানপ্রদানও সম্ভব, যার ফলে নিউট্রন কিছু পায় এবং প্রোটন কিছু হারায়।

কেন্দ্রকের কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ়; উপরন্তু, নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে যে বলের আদানপ্রদান হয়, তাদের কণিকাগুলির মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই কাজ করতে হবে। এই দু'টি তথ্যকে কেন্দ্র করে উকাওয়া উপরিউক্ত ঐ 'কোন কিছু' কণিকাটির একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কণিকাটির আধান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে, কিন্তু তার পরিমাণ হবে প্রোটনের (অথবা ইলেকট্রনের) আধানের সমান এবং এর ভর হবে ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ গুণ।

প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভর অপেক্ষা প্রায় ১,৮০০ গুণ বেশী। সুতরাং এই নবাবিষ্কৃত অদ্ভুত কণিকাটির ভরের পরিমাণ এই দুই ভরের মধ্যে কোথাও একটা থাকবে। আর তাই এর নামকরণ হল মেসন, গ্রীক ভাষায় যার মানে 'মধ্যবর্তী'।

এই সব আলোচনা থেকে আমরা তাহলে কেন্দ্রকীয় বিনিময়ে নিম্নলিখিত চিত্রটি পাই। প্রোটন কণিকা থেকে ধনাত্মক মেসনের নিঃসরণ হওয়ায় তার ধনাত্মক বৈদ্যুতিক আধান নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং প্রোটন কণিকাটি নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়। আবার নিউট্রন একটি মেসন কণিকাকে আত্মসাৎ করে নিজেকে প্রোটনে রূপান্তরিত করে। কিন্তু নিউট্রন থেকে ধনাত্মক মেসনের নিঃসারণও সম্ভব, তবে সে ক্ষেত্রে তা প্রোটনে রূপান্তরিত হয় অন্য পন্থায়। আর এই ধনাত্মক মেসন প্রোটনের দ্বারা ধৃত হলে তা প্রোটনকে নিউট্রনে রূপান্তরিত করে অন্যতর ভাবে।

॥ রহস্যময় মেসনের সন্ধানে ॥

এখন প্রশ্ন হল, মেসন কণিকার সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে? তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক নিয়ে পুনরায় পরীক্ষানিরীক্ষা চলল। সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল—না, এখানে মেসন কদাচ নেই। একান্তই যদি কেন্দ্রকে মেসন থাকে তবে বলতে হয় যে, তা কেন্দ্রক থেকে কখনই বেরিয়ে আসে না। মনে হয়, মেসন কণিকাগুলি যেন সকলের অগোচরে থেকে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করাই পছন্দ করে এবং কখনও নিজেদের জাহির করে না।

এরপর পদার্থবিজ্ঞানীগণ তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন মহাজাগতিক রশ্মির উপরে, কারণ এই রশ্মিগুলি বিভিন্ন কেন্দ্রকীয় কণিকাসংক্রান্ত তথ্যের একটি প্রধান উৎস। এক বছরের মধ্যেই মেসনের আবিষ্কার হল এবং দেখা গেল যে, উকাওয়ার গণনা মত এর ভর ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে প্রায় ২০০ গুণ বেশী।

তত্ত্ববিদদের উল্লসিত হওয়ার কথা। প্রোটন ও নিউট্রন আত্মীয় কণিকা, ধারণার দুঃসাহসিকতায় অবাক হতে হয়। আবার অঙ্ক কষে মেসনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া! এটা সত্যিই পদার্থবিদ্যার আশ্চর্য কৃতিত্বগুলির অন্যতম নিদর্শন।

কিন্তু দেখা গেল, আনন্দের দিনগুলি ক্ষণস্থায়ী। মেসন কণিকারা পারমাণবিক কেন্দ্রকের সঙ্গে কোন রকম সংশ্রবে আসতে একেবারেই নারাজ; নিউট্রন সম্পর্কে তারা দেখাল একান্ত ঔদাসীন্য। তাদের মাথা নত হল কেবলমাত্র প্রোটন কণিকার কাছে, আর তাও বৈদ্যুতিক ঘাতপ্রতিঘাতের সাধারণ সীমানার মধ্যে। পদার্থবিজ্ঞানীরা পর্যুদস্ত হলেন। এই কি সেই অন্বিষ্ট কণিকা যার যাতায়াত করবার কথা প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে, এবং যা প্রচণ্ড উদ্যম সহকারে এই দুই কণিকার মধ্যে কাজ করে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল? তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, স্পষ্টতই তা সম্ভব নয়; প্রকৃতির এই অদ্ভুত সৃষ্টিটি মোটেই সে জিনিস নয়। অতএব অনুসন্ধান অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।

প্রকৃতি এবার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সত্যিই দীর্ঘদিন ধরে লুকোচুরি খেলা সুরু করে দিলেন। কেন্দ্রকের গঠন প্রণালী সম্পর্কে অসাধারণ আবিষ্কার করা সম্ভব হল। সম্ভব হল কেন্দ্রকীয় শক্তি সঞ্চারণের গোপন তথ্য আবিষ্কার করা এবং প্রথম পারমাণবিক চুল্লি ও পারমাণবিক বোমা তৈয়ারী করা। কিন্তু এসব আবিষ্কার সত্ত্বেও ঐ গোপনচারী কণিকাটিকে ধরা গেল না। অবশেষে ১৯৪৭ সালে মহাজাগতিক রশ্মি গবেষক পাওয়েল ঐ কণিকাকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন।

যে কণিকাটি আবিষ্কৃত হল, তা মেসন, কিন্তু স্বতন্ত্র ধরণের। ইলেকট্রনীয় ভরের তুলনায় এর ভর ২০৭-এর পরিবর্তে ২৭৩ গুণ। এইবার আর কোন ভুল ভ্রান্তির অবকাশ রইল না। কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির সঙ্গে এই নবাবিষ্কৃত মেসন কণিকা (উদাসীন মিউ-মেসনের সঙ্গে এর স্বভাবের পার্থক্য থাকায় একে বলা হল পাই-মেসন) প্রচণ্ড বিক্রিয়া ঘটায়। যদি যথেষ্ট বল সঞ্চয় করে এই মেসন কণিকাটি চলাচল সুরু করে, তাহলে এর চলার মধ্যে কোন কেন্দ্রক এসে পড়লে সেই কেন্দ্রককে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়াও এর পক্ষে অসম্ভব নয়।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে, প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে মেসনের আদানপ্রদানেই কেন্দ্রকীয় বলের উৎপত্তি, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এই প্রকল্প আশ্চর্যভাবে সমর্থিত হল। প্রসঙ্গক্রমে, এই ব্যাপারে পদার্থবিজ্ঞানীরা এতটা আত্মবিশ্বাস লাভ করছিলেন যে, তাঁদের অন্বেষিত মেসনের অস্তিত্বই আছে কি না, তার সামান্যতম প্রমাণ না পেয়েও তাঁরা গভীর কেন্দ্রকীয় বনানীর মধ্যে ঢুকে পড়ে সমানে এগিয়ে যাবার পথ তৈয়ারী করতে সুরু করে দিয়েছিলেন।

॥ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বল ॥

যে নবাবিষ্কৃত কেন্দ্রকীয় বলের সন্ধান পাওয়া গেল, পদার্থবিজ্ঞানীরা কাল বিলম্ব না করে তা নিয়ে গবেষণা সুরু করে দিলেন। প্রথমেই যা তাঁদের চোখে পড়ল, তা হল আলোচ্য বলের সীমাবদ্ধ কার্যকারিতা। এ কথা অবশ্য আগেও বলা হয়েছে। দু'টি পরমাণুর মাঝে যে ব্যবধান, সেই দূরত্বের মধ্যে, অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের প্রায় দশ কোটি ভাগ দূরত্বের মধ্যে, সীমায়িত থাকে অণুর ভিতরের বিনিময় বলের প্রভাব। আর কেন্দ্রকীয় বিনিময় বলের প্রভাব সীমিত থাকে ঐ দূরত্বের দশ হাজার ভাগের একভাগ পরিধির মধ্যে। কেন্দ্রীয় কণিকাগুলির আয়তনের সমপরিমান পরিধির মধ্যেই এই শক্তি তার কাজ করতে সক্ষম হয়। কাজেই এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই শক্তিসমূহের অস্তিত্ব কেন্দ্রকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং কেন্দ্রকের বাহিরে তাদের কার্যকারিতার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

আজ পর্যন্ত যত রকম বলের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলশালী হল কেন্দ্রকীয় বল, যা প্রোটন কণিকাগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক বিতৃষ্ণা বা বিকর্ষণ প্রবণতা (এত অল্প পরিধির মধ্যে থাকায় যার পরিমান প্রচণ্ড) রয়েছে, সেই বিতৃষ্ণাকে দমন তো করেই, উপরন্তু প্রোটনগুলিকে একটি স্থায়ী কাঠামোর মধ্যে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে।

অণু, পরমাণু; কেন্দ্রক ইত্যাদি অন্যান্য বস্তুর মতই কেন্দ্রকীয় কাঠিন্য বা দৃঢ়তাকেও পদার্থবিজ্ঞানীরা বর্ণনা করে থাকেন বন্ধনী শক্তির মাধ্যমে। বন্ধনী শক্তি হল সেই শক্তি, যার দ্বারা একাধিক কণিকার সমষ্টিকে ভেঙ্গে কণিকাগুলিকে পুনরায় আলাদাভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

স্বভাবতই, এই ধরণের সমষ্টির মধ্যে যত বেশী কণিকা থাকবে, তাদের আলাদা করে দিতে তত বেশী শক্তি লাগবে। কণিকা প্রতি যে বন্ধনী শক্তি থাকে, স্থায়িত্বকে বর্ণনা করতে হলে আমরা সাধারণতঃ তাকেই ধরে থাকি। ইলেকট্রন-ভোল্ট নামে এক বিশেষ ধরণের এককে এই শক্তিকে মাপা হয়। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে এক ভোল্ট পরিমাণ বিভব পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে চলার ফলে একটি ইলেকট্রন কণিকার যে শক্তি লাভ হয়, সেই শক্তির পরিমাণ হচ্ছে এক ইলেকট্রন ভোল্ট। আমাদের চোখের সামনে যে বিরাট জগৎ, সেই জগতে এই এককের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য হলেও পারমাণবিক জগতে এর পরিমাণ তুচ্ছ নয়।

সাধারণ তাপমাত্রায় বহু পদার্থ গ্যাস হিসাবে থাকে কারণ ঐ সব পদার্থের অণুগুলি যে বন্ধনে আবদ্ধ, সাধারণ তাপমাত্রায় সেই বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। এই ধরণের অণুগুলির মধ্যে যে বন্ধনী শক্তি কাজ করে তার পরিমাণ অণু প্রতি এক ইলেকট্রন ভোল্টের একশ' ভাগেরও কম।

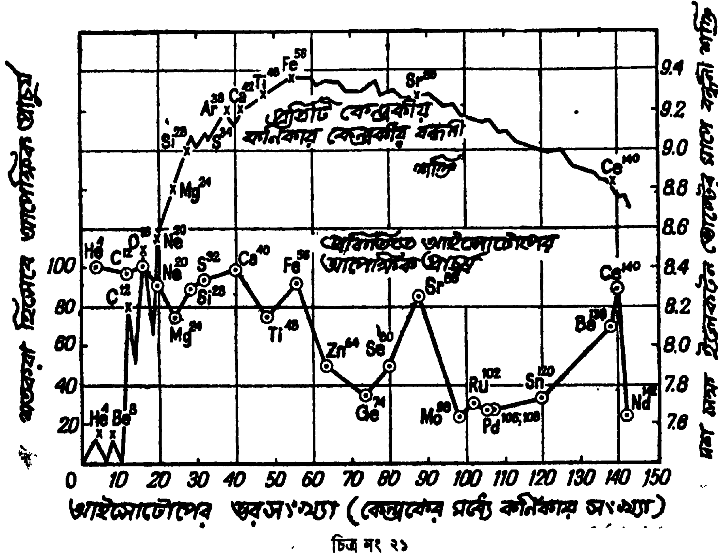
আবার এই অণুগুলিকে পরমাণুতে ভেঙ্গে ফেলতে হলে আরো বেশী শক্তির প্রয়োজন, যার পরিমান পরমাণু প্রতি দশ ইলেকট্রন ভোল্ট। এই শক্তি সুবিপুল তাপমাত্রার নির্দেশক হাজার হাজার বা আরো বেশী ডিগ্রির সমতুল্য।

সুতরাং পরমাণুকে তার অন্তর্গত ইলেকট্রনে এবং অন্তঃসারস্বরূপ কেন্দ্রককে ভেঙ্গে ফেলা আরো বেশী দুঃসাধ্য। আমরা জানি যে, পারমাণবিক ইলেকট্রনগুলির শক্তি আলাদা আলাদা; পার্থক্যটা নির্ভর করে কেন্দ্রকের সঙ্গে ইলেকট্রনটি কি ভাবে যুক্ত তার উপর। এই শক্তির পরিমাণ দশ থেকে হাজার হাজার ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে।

কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির বন্ধনশক্তি লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট। সর্বাপেক্ষা বলশালী অকেন্দ্রকীয় বল প্রয়োগ করেও কেন্দ্রকের কেন যে কোন পরিবর্তন ঘটান যায় না, এমন কি হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রায় সৃষ্ট তাপজনিত গতিতে যদি দুটি কেন্দ্রকের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, তা হলেও সেই সংঘর্ষের ফল গ্র্যানাইট পাথরের দেওয়ালে একটি রবার বল লাফিয়ে পড়লে যা হয় তার বেশী কিছু হবে না।

কেন্দ্রকীয় স্থপতির কর্মকলা অনুধাবন করে পদার্থবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন

ধরণের কেন্দ্রকের দৃঢ়তা নির্ণয় করেছেন এবং নির্ণীত তথ্যগুলিকে কেন্দ্রকগুলির ভর সংখ্যার অপেক্ষকরূপে লেখচিত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন। লেখচিত্রটি মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক। প্রথমেই চোখে পড়ে কয়েকটি উঁচুনীচু রেখা, অনেকটা পর্বতমালার মত। সাদৃশ্যটা আরও জোরাল হয় এই কারণে যে, প্রথম দেখলে মনে হয় যেন চূড়াগুলি যত্রতত্র মাথা তুলে আছে।



চিত্র নং ২১

কিন্তু আরো অগ্রসর হওয়ার আগে লেখচিত্রের নীচের বক্ররেখাটি লক্ষ্য করা যাক। প্রকৃতিতে কোন্ রাসায়নিক মৌল পদার্থ কি পরিমাণে আছে তার সূচক এই বক্ররেখা। এই সূচক রেখা অংকন করতে পদার্থবিজ্ঞানীকে সাহায্য নিতে হয়েছে ভূতত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, এমন কি প্রাণী-বিজ্ঞানীর কাছ থেকেও। স্পষ্টতই একটি মৌল পদার্থের পরিমান নির্ভর করে প্রকৃতিতে ঐ মৌলের পারমাণবিক কেন্দ্রক কত আছে তার উপর। অবশ্য এখানে প্রকৃতি বলতে শুধু পৃথিবী নয়, আমাদের চারপাশের যে জগৎ আমরা দেখি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাঁর বর্ণালী যন্ত্রের সাহায্যে যত দূর দেখতে পেয়েছেন, সেই দৃশ্যমান জগৎকেই আমরা বোঝাতে চাইছি।

এখন 21নং লেখচিত্রের বক্র রেখা দুটিকে তুলনামূলকভাবে বিচার করা যাক। এদের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য আছে? প্রথমতঃ, বাঁদিকের কোণে দেখা যায় যে, উপরের বক্ররেখাটির উচ্চতম চূড়াগুলি হিলিয়াম-4, কারবন-12, অক্সিজেন-16 ও অন্যান্য কয়েকটি মৌলের কেন্দ্রকের অনুযায়ী। এই সব সংখ্যাগুলিই 4এর গুণিতক। সুতরাং মনে হয় যেন এই সব কেন্দ্রকগুলি প্রোটন ও নিউট্রনের পরিবর্তে সরাসরি আলফা কণিকা দিয়েই গঠিত। আবার নীচের বক্ররেখার অনুরূপ অংশগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতিতে এই সব তুলনামূলক প্রাচুর্য সর্বাধিক, প্রায় শতকরা 100 ভাগ।

পর্বতসারির গা দিয়ে চলতে থাকলে লক্ষ্য করা যায় যে, উপরের বক্ররেখায় যে সব স্থানে ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে, নীচের বক্ররেখায় সেই সব স্থানে চূড়া রয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কেন্দ্রক যত বেশী দৃঢ়, প্রকৃতিতে সেই কেন্দ্রকের প্রাচুর্য তত বেশী।

এই তথ্য থেকে মনে হয় যে, পারমাণবিক কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে প্রকৃতি তার নিজস্ব এক স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র অবলম্বন করেছে। জীবন-যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিমানেরাই বেঁচে থাকে। যাদের নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যা, 2, 8, 20 ইত্যাদি, প্রকৃতিতে তাদের পরিমাণই সর্বাধিক। কেন এমন হয়, তা কেন্দ্রকীয় খোলকের আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করব।

আপাততঃ জানা দরকার যে, কেন্দ্রকগুলি আলফা কণিকা দিয়ে গঠিত, এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু একটা কথা জোর করে বলা যায় যে, পারমাণবিক কেন্দ্রকের জগতেও দুটি করে প্রোটন ও দুটি করে নিউট্রন একত্র জোট বাঁধলে সেই জোট অত্যন্ত দৃঢ় হয়। পদার্থবিজ্ঞানীর ভাষায় বলতে গেলে, এই সংখ্যায় জোট বাঁধলে কণিকাগুলির মধ্যে যে কেন্দ্রকীয় বল কাজ করে, জোট বাঁধলে তা সংপৃক্ত হয়ে যায়। এই ধরণের জোটে একটাও বাড়তি প্রোটন বা নিউট্রন জুড়ে দেওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, হিলিয়াম কেন্দ্রকের কথা স্মরণ করা যায়। তার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন কোন কণিকাকে তার অন্দরমহলে স্থান দিতে এই কেন্দ্রক অনিচ্ছুক। প্রকৃতপক্ষে এই কেন্দ্রক মোটেই অতিথিপরায়ণ নয়। এমন কেন্দ্রক পাওয়া যায় নি যার ভরসংখ্যা 5 (অর্থাৎ 2টি প্রোটন ও 3টি নিউট্রন অথবা 3টি প্রোট্রন ও 2টি নিউট্রন)।

অতিথিকে নিজের ঘরে জায়গা দিতে অস্বীকার করে হিলিয়ামগোষ্ঠী নিজের সামর্থকে জোরালো করে। হাইড্রোজেন কেন্দ্রককে (যার মধ্যে কেবল একটি মাত্র প্রোটন কণিকা থাকায় কেন্দ্রকীয় বলের কোন অস্তিত্বই নেই) বাদ দিলে হিলিয়াম কেন্দ্রকই প্রকৃতির দৃঢ়তম কেন্দ্রক।

একমাত্র কেন্দ্রকীয় বলের মধ্যেই সংপৃক্তি নামক এক নতুন ধর্ম দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অপর একটি নতুন ও অস্বাভাবিক ধর্ম লক্ষণীয়। তাহলে এদের আধান-নিরপেক্ষতা কেন্দ্রকীয় বল আধানকে কোন আমলই দেয় না এবং যত সহজে তারা একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের মধ্যে কাজ করে, ঠিক তত্ সহজেই তারা কাজ করতে পারে দুটি প্রোটন ও অথবা দুটি নিউট্রনের মধ্যে। এ ঘটনা কেন ঘটে? তা আজও অবধি পদার্থবিদরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি।

॥ কেন্দ্রকের দৃঢ়তা সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা ॥

যে বিনিময়াত্মক বলগুলি এই সব দৃঢ় কেন্দ্রকীয় কাঠামো গঠন করে, সেই বলগুলি এক ধরণের আকর্ষণী বল যা প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাগুলিকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে। এই কণিকাগুলির পারস্পরিক আকর্ষণের সীমা কতদূর? সীমা নিশ্চয়ই আছে, না হলে তারা সব এক সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

স্বভাবতই প্রকৃতি তা হতে দেয় না। কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলি যখন পরস্পরের অত্যন্ত কাছে থাকে, তখন তাদের মধ্যে যে বলশালী কেন্দ্রকীয় আকর্ষণী বল কাজ করে, সেই বলের প্রভাবকে নাকচ করে দেবার জন্য প্রকৃতি অনুরূপ বলশালী বিকর্ষণী বলও একযোগে কাজে লাগায়! এর ফলে কণিকাগুলি পরস্পরকে ভেদ ক'রে ভিতরে ঢুকতে পারে না।

একেই বলা হয়ে থাকে কেন্দ্রকীয় বলের কার্যকারিতার নিম্ন সীমানা। উচ্চ সীমানা—যার কথা আগেই বলা হয়েছে—হল সেই বৃহত্তম দূরত্ব, যে পর্যন্ত কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলি পরস্পরের কাছ থেকে সরে থাকতে পারে, অথচ সরে থাকলেও কেন্দ্রকীয় আকর্ষণী বলের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় না। মোটামুটিভাবে, এই দূরত্বের পরিমাণ কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির নিজেদের আয়তনের পরিমাণের সমান।

এই ঘটনার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে, কারণ এর সাহায্যে বন্ধনী শক্তির বক্ররেখার সাধারণ প্রবণতার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব: অর্থাৎ কেন কেন্দ্রক-গুলির ভরসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বক্ররেখাটি নিম্নাভিমুখী হয়। বস্তুতঃ যে সব হাল্‌কা কেন্দ্রকে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন থাকে, সেই সব কেন্দ্রকের প্রতিটি কণিকাই অপর কণিকাদের সকলের সঙ্গেই কেন্দ্রকীয় বলের দ্বারা যুক্ত থাকতে পারে।

কিন্তু সংপৃক্তি নামক যে ধর্ম থেকে জানা যায় যে, কেন্দ্রকীয় বল চতুষ্টয় কণার জোট বাঁধনই পছন্দ করে, সেই সংপৃক্তি কি ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়? এর উত্তর খুব সরল। কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির আকৃতি অভিন্ন। কাজেই উক্ত 'চতুষ্টয়'গুলিকে আলাদা করার কোন উপায়ই নেই। সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক কেলাসে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের আয়নগুলিকে জোড়ায় জোড়ায় আলাদা করার চেষ্টা করুন, ঠিক যেমন তারা পূর্বে NaCl অণুগুলিতে একটির সঙ্গে একটি সাজানো ছিল। দেখবেন তা সম্ভব নয়: কেলাসীয় জাফরিতে বিন্যস্ত সোডিয়াম ও ক্লোরিনের একই আয়ন 'ভূতপূর্ব' অণুগুলির মধ্যে বিভিন্ন অণুতে ঢুকতে পারে, সেকথা আমরা আগেই বলেছি।

স্বভাবতঃই কেন্দ্রকে যত বেশী কণিকা থাকবে, তার আয়তন তত বড় হবে। এখন প্রতিটি কণিকা কেন্দ্রকীয় বলের প্রভাবে তার ঠিক আশে-পাশে যে সব কণিকা আছে, তাদের সঙ্গেই জড়িত থাকবে। মনে হয় যেন একটা সামগ্রিক বাঁধনের পরিবর্তে এখানে একাধিক শৃঙ্খল বাঁধনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরণের কেন্দ্রকগুলির স্থায়িত্ব ক্ষীণতর হতে থাকে। আর তা ঘটে বিশেষ করে এই কারণে যে, প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে যে বিকর্ষণী বল আছে, যা কেন্দ্রকীয় বলগুলির বিপরীতধর্মী, সেই বিকর্ষণী বলের আধিক্য ঘটে।

পর্যাবৃত্ত ছকের শেষের দিকে যে বড় ও ভারী কেন্দ্রকগুলির অবস্থান, তারা অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী। কিন্তু আপনা থেকেই অধিকতর স্থায়ী হওয়ার সুযোগও প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে। যেমন জাহাজ থেকে অপ্রয়োজনীয় ভার নামিয়ে তার ভেসে থাকার ক্ষমতাকে বাড়ানো হয়, ঠিক তেমনি কেন্দ্রকও নিজের দেহে কোন বাড়তি কেন্দ্রকীয় কণিকা থাকলে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজের জীবনকে আরো স্থায়ী করে তুলতে পারে।

কেন্দ্রক থেকে যে বাড়তি কণিকার স্খলন হয়, তার থেকে উদ্ভব হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের।

প্রসঙ্গত আপনাদের হয়তো জানা আছে যে, পর্যাবৃত্ত ছকের গোড়ার দিকে এবং মাঝখানেও বহুসংখ্যক তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক আছে। তবে এদের বেশীর ভাগই প্রকৃতির বদলে মানুষের দ্বারা তৈরী। আদিতে তারা ছিল অভঙ্গুর। কিন্তু তাদের উপর কেন্দ্রকীয় কণিকার (মূলতঃ নিউট্রন) গোলা-বর্ষণ করে পদার্থবিজ্ঞানীরা তাদের কণিকার সংখ্যা জোর করে বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে তাদের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

এই কেন্দ্রকগুলি আবার তাদের স্থায়ী অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু যে পথে তারা গিয়েছিল, ফেরবার বেলায় সে পথ না ধরে অন্য পথে ফেরে। শুধু তাই নয়, ভ্রমণের পর তারা যে অবস্থায় ফিরে আসে, তা ঠিক ভ্রমণের আগের অবস্থা নয়। বাড়তি নিউট্রনের সংযোগে কেন্দ্রক অস্বস্তি বোধ করে এবং এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করবার জন্য তা ক্রমাগত ইলেকট্রন ও গামা ফোটন বিকিরণ করে। আর যতক্ষণ না তা একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রকে রূপান্তরিত হয়, ততক্ষণ এ ধরণের বিকিরণ চলতে থাকে।

এই ঘটনার (একে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বলা হয়) মূলে আছে ছলে বলে কৌশলে কেন্দ্রকের নিজের স্থায়িত্ব রক্ষা করবার প্রবণতা। অস্থায়ী বস্তু ক্ষণজীবী। প্রকৃতিতে কেন্দ্রকের প্রাচুর্য সংক্রান্ত লেখচিত্রটি স্মরণ করুন। এই লেখচিত্র থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, যে কেন্দ্রক যত স্থায়ী, প্রকৃতির মধ্যে তার প্রাচুর্য তত বেশী।

॥ কেন্দ্রকের সূত্র ॥

কেন্দ্রকের স্থায়িত্ব সংক্রান্ত সূত্রগুলি অত্যন্ত জটিল। বিগত তিরিশ বছরের গবেষণা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ আজও এই সূত্রগুলি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তবে কয়েকটি সূত্রের অন্তর্নিহিত গোপন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রথম তথ্যটি হল, আলফা তেজস্ক্রিয়তা বা কেন্দ্রকের আলফা রশ্মি ক্ষরণ। ঘটনাটি নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার আগেই ধরা পড়েছিল, যদিও আলফা

কণিকাগুলির স্থায়িত্ব কিসের উপর নির্ভর করে তা তখনও জানা ছিল না।

সুতরাং আমাদের সামনে এখন দুটি প্রশ্ন আছে: কেন্দ্রক থেকে আলফা কণিকা কেন বেরিয়ে আসে আর কেনই বা প্রোটন এবং নিউট্রন আলাদা-ভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না?

অপেক্ষাকৃত শক্ত দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা আগে সুরু করা যাক। বন্ধনী শক্তির বক্ররেখায় দেখা যাচ্ছে যে, সব কেন্দ্রকে চারটি কণিকার জোট থাকে, অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রন জোড়ায় জোড়ায় থাকে (যেমন হিলিয়াম-4, কার্বন-12, অক্সিজেন-16); সেই সব কেন্দ্রক তাদের প্রতিবেশী কেন্দ্রকগুলির তুলনায় বেশী দৃঢ়। এদিকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারী তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকের ক্ষয়সাধন হয় অবিকল ঐ কণিকা চতুষ্ট দ্বারাই। আলফা কণিকার এই ধরণের দ্বিমুখী আচরণের কারণ কি?

আমাদের সমস্যা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে যখন এই কথা স্মরণ করি যে, চার কণিকা বিশিষ্ট জোটের ক্ষেত্রে কেন্দ্রকীয় বলের সংপৃক্তি ঘটে, যার ফলে ঐ জোটের সঙ্গে কোন বাড়তি (অর্থাৎ পঞ্চম) কণিকাকে যোগ করে দেওয়া অসম্ভব হয়। অথচ তা যদি হয় তবে হিলিয়াম কেন্দ্রকের চেয়ে ভারী কেন্দ্রকগুলি আদৌ কেন টিকে থাকে?

এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হলে আলফা কণিকাগুলির বাস্তব অবস্থান ও তাদের মধ্যে মেসন বিনিময়ের কথা বিশদভাবে অনুধাবন করা দরকার। এক ধরণের আদানপ্রদানের কথা আমরা জানি। তা হল, নিজের দেহ থেকে ঋনাত্মক আধানের পাই-মেসনের ক্ষরণ ঘটিয়ে নিউট্রন কণিকা প্রোটনে রূপান্তরিত হয়, আবার প্রোটন কণিকাটি ঐ মেসনকে আত্মসাৎ ক'রে মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে নিউট্রনে রূপান্তরিত করে।

সুতরাং, গড়পড়তা হিসাবে একটি কণিকা চতুষ্টয়ের জোটে সব সময়েই এক জোড়া প্রোটন ও এক জোড়া নিউট্রন থেকে যায়। কিন্তু একবার মনে করুন, এই রকম জোটের কোন নিউট্রন একটা মেসন ছেড়ে দিল এবং সেই মেসন কণিকাটিকে প্রতিবেশী অপর কোন জোটের একটি প্রোটন উদরস্থ করল। সে ক্ষেত্রে বলা যায় যে, একই সঙ্গে দুটি অপরাধ ঘটে গেল: প্রথম জোটে তিনটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের সমন্বয় হল, আর প্রতিবেশী দ্বিতীয়

জোটে সমন্বয় হল তিনটি নিউট্রন ও একটি প্রোটনের। কিন্তু এই ঘটনাকে অপরাধ বলা হল কেন? কারণ, পাওলীর সূত্র থেকে জানা গেছে যে, প্রোটন ও নিউট্রনের ঘূর্ণন ইলেকট্রনের অনুরূপ হওয়ায় ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে যে সব বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে, এদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এই সূত্র অনুযায়ী কোন একটি কণিকা তার কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় একাধিক ধরণের ঘূর্ণন চালিয়ে যেতে পারে না।

আলফা কণিকা অত্যন্ত দৃঢ়, কারণ এর মধ্যে যে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের জোড় রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি একটি একক শক্তি-স্তরে অবস্থিত —যা হল ন্যূনতম সম্ভাব্য শক্তি-স্তর। প্রোটন দুটি আছে এক স্তরে এবং নিউট্রন দুটিও আছে তার সমান স্তরে। এই সহাবস্থান সম্ভব হয় কারণ কেন্দ্রকের অন্তর্ভুক্ত প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা প্রতি মুহূর্তে ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ তারা প্রকৃতই ভিন্ন রূপের কণিকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। ধরা যাক, একটি কণিকা চতুষ্টয়ের জোটে তিনটি প্রোটন আছে। তাহলে এদের একটিকে হয় পাওলির সুদৃঢ় আটঘাট-বাঁধা নীতিকে লঙ্ঘন করে থাকতে হবে, নচেৎ থাকতে হবে এমন একটা শক্তি-স্তরে যেখানে তার শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী। আবার এই ধরণের উচ্চ শক্তি-স্তরে অবস্থান করা মানে বন্ধনী শক্তির হ্রাস হওয়া।

কেন্দ্রকীয় কণিকারা কোন 'অপরাধ' করতে চায় না; অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী স্তরে থাকাও তারা পছন্দ করে না। এ অবস্থায় এসে পড়লে তারা সঙ্গে সঙ্গে মেসন বিমুক্ত করে: আমরা আবার দুটি স্বাভাবিক কণিকা চতুষ্টয়ের জোট পেয়ে যাই। তবে এই রকম স্বতঃস্ফূর্ত আদানপ্রদান চলায় জোটগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক বাঁধনের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জোটগুলি আগের মত ছাড়া ছাড়া ভাবে না থেকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

হাল্কা কেন্দ্রক থেকে আমাদের দৃষ্টি যতই দূরে সরে যায়, ততই আমরা দেখতে পাই যে, স্থায়িত্ব রক্ষার কাজে কণিকা চতুষ্টয়ের অবদান ক্রমশই কমে আসে। অথচ ভারী কেন্দ্রকের ক্ষেত্রেও এই জোটের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রকের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় তার চারপাশে যে সব কণিকা থাকে, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে পারে কেবলমাত্র তাদের আশে-পাশের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী কণাদের সঙ্গে (এ কথা

অবশ্য আগেও বলা হয়েছে)। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কেন্দ্রকের পিঠে অবস্থিত কণাগুলি পুনরায় কণিকা চতুষ্টয়ের জোট বাঁধে কারণ এইটিই দৃঢ়তম ভারসাম্যের অবস্থা।

সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারী কেন্দ্রক প্রোটন অথবা নিউট্রনের পরিবর্তে কেবল কণিকা চতুষ্টয়ের জোট বিকিরণ করে (অর্থাৎ আলফা কণিকার বিকিরণ হয়)। কিন্তু জোটগুলি কি করে কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসে? কেন্দ্রক হল অনেকগুলি কণিকার সমন্বয় অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, এটি হল একটি বিভব কূপ, কণিকাদের যুক্ত অবস্থা থেকে যাকে পৃথক করে রেখেছে একটি উঁচু পাঁচিল। এই কূপের গভীরতা (অর্থাৎ দেওয়ালের উচ্চতা) আমাদের জানা আছে। তা হল বন্ধনী শক্তির সমপরিমাণ।

অন্যান্য যে সব দেওয়াল বা বাধার কথা আমরা আগে বলেছি, এই কূপের দেওয়ালের প্রকৃতি তাদের থেকে স্বতন্ত্র, কারণ এই প্রাচীর লঙ্ঘন করতে কোন চেষ্টা করতে হয় না। কেন্দ্রকীয় প্রাচীরটি কিন্তু মোটেই সেই রকম সিঁড়ির মত নয়, যার পেছনে কোন দেওয়াল নেই। একে বোধহয় 'বেড়া' বললেই ঠিক হয়, তবে বেশী চওড়া নয় খুব উঁচু। সহজ কথায়, এই পাঁচিলের বিস্তার কতটা হবে, তা নির্ভর করে কেন্দ্রকীয় বলগুলির কার্যকারিতা কতদূর বিস্তৃত তার উপর। আর এর উচ্চতা থেকে জানা যায় ঐ সব বলের পরিমাণ।

এরপর আমাদের আবার কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অবতারণা করতে হয়। তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক থেকে আলফা কণিকা বিচ্ছুরণের প্রক্রিয়াকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভাষায় বলা হয় 'সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়া'। যে ভাবে কোন ধাতু থেকে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে অথবা অন্তরক ও আধা-পরিবাহীর মধ্যে তারা প্রবেশ করে, উল্লিখিত সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়ার পদ্ধতি তার থেকে পৃথক নয়। এদের সকলের ক্ষেত্রে যা অবিরত কাজ করে চলেছে, তা হল তরঙ্গ-ধর্ম; এক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ধর্ম এবং অন্য ক্ষেত্রে আলফা কণিকার তরঙ্গ-ধর্ম।

কণিকা চতুষ্টয়ের কার্যকলাপে আমরা যে দ্বৈতভাব লক্ষ্য করেছিলাম উপরের বিশ্লেষণ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আসলে, এখানে দ্বৈতভাবের কোন প্রশ্নই নেই। কি ঘটছে বা কি ঘটতে পারে, তা কোয়ান্টাম

সম্ভাবনার উপরই নির্ভর করে। নিছক তত্ত্বগতভাবে অক্সিজেন কেন্দ্র থেকেও আলফা কণিকার বিচ্ছুরণ সম্ভব, কিন্তু এই সম্ভাবনা এত কম যে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হাল্‌কা কেন্দ্রকে আলফা কণিকার বিচ্ছুরণের পথে যে বেড়া রয়েছে তা যথেষ্ট উঁচু (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বন্ধনী শক্তির পরিমাণ প্রচণ্ড)। আবার ভারী কেন্দ্রকে সেই বেড়া যথেষ্ট নিচু (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বন্ধনী শক্তি অত্যন্ত কম)। এখন, সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা ঐ বেড়া বা পাঁচিলের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায় এই সম্ভাবনাও তত কম হয়। এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত আছে কেন্দ্রকীয় রহস্যের মূল।

অন্য দিকে; ভারী কেন্দ্রকে আলফা কণিকা বিচ্ছুরণের পথে যে বাধা রয়েছে, তা একক ভাবে প্রোটন অথবা নিউট্রন কণিকার বিচ্ছুরণের পথের বাধার তুলনায় যথেষ্ট নিচু। ফলে, এক্ষেত্রে কণিকাগুলির একক ভাবে বিচ্ছুরণ না হয়ে কণিকা চতুষ্টয়ের সমন্বিত বিচ্ছুরণ হয়।

॥ কেন্দ্রক কি বিভিন্ন খোলকের দ্বারা তৈরী ॥

পরমাণুর যেমন ইলেকট্রন-সদৃশ মেঘে-ঘেরা একটি কেন্দ্রীয় অঙ্গ আছে, কেন্দ্রকের তেমনটি আছে বলে মনে হয় না। প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে কেন্দ্রক গঠিত, এই ঘটনা আবিষ্কৃত হওয়ার পর কয়েক বছর ধরে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রকের ক্ষুদ্র ফাঁকা আয়তনটি কেন্দ্রকীয় পদার্থ-প্রোটন ও নিউট্রনের কুয়াশা দিয়ে সমানভাবে ভরাট।

কিন্তু কেন্দ্রকীয় বলগুলির সংপৃক্তি ও কণিকার স্বল্পতা, এই দুই ঘটনা আবিষ্কারের পর মনে হতে লাগল যে, কেন্দ্রকীয় পদার্থ (যার দ্বারা কেন্দ্রকের ফাঁকা আয়তন ভরাট করা হয়েছে) বোধহয় একেবারেই আকৃতিবিহীন নয়। ঐ ফাঁকা আয়তনে ছোট ছোট আলফা কণিকার কোষের রূপরেখাও যেন দেখা যেতে লাগল। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও বাস্তব অনুসন্ধানের আলোকে কেন্দ্রকীয় অরণ্যের গভীরে যত প্রবেশ করা হল, ততই পরিষ্কার হতে লাগল যে, এই অরণ্যতে আছে সম্পূর্ণ সব বৃক্ষসমষ্টি। যদিও দূর থেকে মনে হয়েছিল যে, অরণ্যটি আকৃতিহীন, এখন দেখা গেল যে, তা ঠিক নয়। বস্তুতঃ এর একটি বিশিষ্ট চেহারা আছে।

আগেই জানা গেছে যে, কেন্দ্রকের মধ্যে কণিকা চতুষ্টয়ের জোটের অবস্থানও শক্তির সর্বনিম্নস্তরে এবং কেন্দ্রকের বিভিন্ন ধরণের কণিকাসমষ্টির মধ্যে এই চতুষ্টয়ের জোটই সর্বাধিক দৃঢ়। এই রকম অবস্থানের সঙ্গে খাপ খেতে পারে, শক্তির তেমন একটি সাধারণ স্তর আছে। সেই স্তরে দেখা যায়, দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন কণিকা, যারা বিপরীত দিকে ঘূর্ণন করে চলেছে।

একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রকে কণিকা-চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় জোটটি অপর একটি শক্তি-স্তরে অবস্থিত। তৃতীয় জোটটি তৃতীয় কোনো স্তরে। এই রকম ধারাবাহিকভাবে এদের অবস্থান লক্ষণীয়। কণিকা-চতুষ্টয়ের জোট সংখ্যা যত বেড়ে যায়, কেন্দ্রকের উচ্চতর শক্তি-স্তরগুলি ততই ভর্তি হয়ে আসে, যে রকম হয়ে থাকে পরমাণুর অন্তর্ভুক্ত ইলেকট্রনগুলির ক্ষেত্রে।

কিন্তু সব কেন্দ্রকেই যে কণিকা-চতুষ্টয়ের জোট থাকবে এমন কোন কথা নেই। তার মানে, যে সব কেন্দ্রকে কণিকা সমষ্টি 4-এর গুণিতক নয়, সেই সব ক্ষেত্রে তথাবিধ শক্তি-স্তরগুলি অপরিপূর্ণ থেকে যায়।

কেন্দ্রকের ছবিটি তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেকটা পরমাণুর বহিঃকাঠামোর অনুরূপ, যে কাঠামোতে পরিপূর্ণ, নিবদ্ধ ও স্থায়িত্বশীল ইলেকট্রন খোলকের সন্ধান পাওয়া যায় (নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কথা স্মরণ করুন)। কেন্দ্রকের ক্ষেত্রেও পাওয়া যাচ্ছে বহু পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় কেন্দ্রকীয় খোলক, যে খোলকগুলো কণিকা-চতুষ্টয় অথবা অধিক সংখ্যার কণিকা দ্বারা গঠিত।

অবশ্য, কেবল একটি বাহ্য সাদৃশ্যই যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রকের মধ্যে যে স্তর বা খোলক রয়েছে তার যথোপযুক্ত ও বাস্তব প্রমাণ আমাদের পাওয়া দরকার। কেন্দ্রকের দৃঢ়তা ও প্রাচুর্য সংক্রান্ত বক্ররেখাগুলির দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক। কয়েকটি সর্বোচ্চ চূড়া বেছে সেখানকার কেন্দ্রকে কি কি পরিমাণ প্রোটন ও নিউট্রন আছে, তার হিসাব করা যাক।

প্রথমেই আসে হিলিয়াম-4 ; আলফা কণিকা এর কেন্দ্রক, যে কেন্দ্রকে 2টি প্রোটন ও 2টি নিউট্রন আছে। তারপর আসে অক্সিজেন-16 ; যার মধ্যে পাওয়া যায় 8টি প্রোটন ও 8টি নিউট্রন। তারপর ক্যালসিয়াম-40 ; যার মধ্যে আছে 20টি প্রোটন ও 20টি নিউট্রন। এইভাবে অন্য সব কেন্দ্রকগুলিও সাজানো। এবং বক্ররেখার ডান দিকের শেষে আমরা সেই শেষ

চূড়াটি দেখতে পাই যেখানে সীসা-208এর অবস্থান। এই মৌলের কেন্দ্রকে 82টি প্রোটন ও 126টি নিউট্রন আছে। এই প্রসঙ্গে 50টি প্রোটন দ্বারা গঠিত টিন কেন্দ্রকের কথাও বলতে হয়। এর দৃঢ়তা এত প্রবল যে প্রকৃতি এর দশটি সুদৃঢ় আইসোটোপ উদ্ভাবন করেছে। অথচ অন্যান্য প্রোটন সংখ্যার ক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচটি মাত্র স্থায়ী আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া যায়।

সুতরাং কেন্দ্রক দৃঢ়তম হয়, যখন প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে 2, 8, 20, 50, 82 এবং 126 হয়। এই জাতীয় কেন্দ্রকগুলি সেই সব নিষ্ক্রিয় মৌলের পরমাণুর সঙ্গে তুলনীয় যাদের মধ্যে নিহিত ইলেকট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে 2, 10, 18, 36, 54, এবং 86। স্ব স্ব ক্ষেত্রে এরা উভয়েই দৃঢ়তার প্রবলতম নিদর্শন।

প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যাগুলিকে 'ঐন্দ্রজালিক সংখ্যা' বলা হয়েছে। এই নামকরণ সঙ্গত। পরমাণুর অন্তর্গত কেন্দ্রক ও ইলেকট্রন খোলক, এরা দুই ভিন্ন জগতে ভিন্ন সূত্রের আজ্ঞাধীনে বাস করেও একই রকম গঠন প্রণালীর নিদর্শন দেবে, এই ঘটনার মধ্যে যেন কোন যাদুস্পর্শের ইঙ্গিত রয়েছে।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, ঐন্দ্রজালিক সংখ্যাগুলির সঙ্গে দৃঢ়তম পরমাণুগুলির অন্তর্ভুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যার তুলনা করলে অনেক পার্থক্যই চোখে পড়ে। একমাত্র হিলিয়ামের ক্ষেত্রে—যার স্থায়িত্ব উভয় জগতেই সর্বাপেক্ষা দৃঢ়—উপরিউক্ত দুই সংখ্যা একেবারে মিলে যায়। অন্য ক্ষেত্রে এই দুই ধরণের সংখ্যার যে পার্থক্য দেখা যায়, তা আকস্মিক নয়। কেন্দ্রক ও বহিঃস্থিত ইলেকট্রন কুয়াসার অস্তিত্বের বাস্তব পরিবেশ এতই পৃথক যে, ঐ দুই সংখ্যার মিল হওয়াকেই বরং আকস্মিক বলা চলত।

তা সত্ত্বেও আমরা বলব যে, কেন্দ্রকের মধ্যে খোলক ব্যবস্থার মত একটা কিছু আছে। আর এই কথার স্বপক্ষে পরীক্ষালব্ধ তথ্যও রয়েছে। পটাসিয়াম পরমাণুর কথাটাই ধরা থাক (সংখ্যা 19)। এর যোজ্যতা একাংক, অর্থাৎ এই পরমাণুতে আছে নিষ্ক্রিয় আর্গন পরমাণুর পরিপূর্ণ ও নিবদ্ধ খোলকটির বাহিরে অবস্থিত একটি ইলেকট্রন। পটাসিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন কাঠামোর মোট ঘূর্ণনের পরিমাণ ঐ যোজ্য ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের সমান। আর তা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অন্য ইলেকট্রনগুলি যুগ্মভাবে

বিপরীত দিকে ঘূর্ণন করে বলে তারা পরস্পরকে নাকচ করে, যার ফলে তাদের মোট ঘূর্ণনের পরিমাণ শূন্য অংকে এসে দাঁড়ায়।

এখন এর সঙ্গে অক্সিজেন-17 আইসটোপের কেন্দ্রকের তুলনা করা যাক। এই কেন্দ্রকে চারটি কণিকা-চতুষ্টয়ের জোট ছাড়াও একটা বাড়তি নিউট্রন আছে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, অক্সিজেন কেন্দ্রকের ঘূর্ণন ঐ বাড়তি নিউট্রনের ঘূর্ণনের সমান হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তাই-ই হয়।

হিসাব আর বাস্তব ঘটনার মধ্যে মিল শুধু এই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। কেন্দ্রকীয় খোলকের নক্সাকে ভিত্তি করে কেন্দ্রকের ঘূর্ণনের যে হিসাব পূর্বেই করা হয়েছিল, পরে তা ঐ ঘূর্ণনের পরীক্ষালব্ধ পরিমানের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায়।

॥ গামা রশ্মি কোথা থেকে আসে ? ॥

গামা রশ্মি নামক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তৃতীয় ধারাটি গভীরভাবে অনুধাবন করলে ইলেকট্রন খোলক আর কেন্দ্রকীয় খোলকের মধ্যে যে সাধারণ সাদৃশ্যগুলি রয়েছে, তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। গামা রশ্মির অনুধাবন করে পদার্থবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কেন্দ্রকীয় পরিবার সম্পর্কে অনেক তথ্য আহরণ করেছেন।

যে ঘটনা প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল গামা রশ্মির বর্ণালী-ধারা। এই বর্ণালীতে বিভিন্ন রেখা দেখা যায়। বর্ণালীতে রেখার তাৎপর্য কি, তা আমাদের জানা আছে। এর মানে হল এই যে, কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির শক্তির পরিমান অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। সুতরাং ঐ কণিকাগুলিকে অবস্থান করতে হয় কয়েকটি বিশিষ্ট অবস্থায়। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময় গামা রশ্মির উৎপত্তি হয়।

কেন্দ্রকীয় শক্তির স্তর বলতে কি বুঝি ? আর কেন্দ্রকীয় কণিকার দ্বারা তারা কি ভাবে আবৃত ? এখানে মানচিত্রের অধিকাংশই শূন্য স্থান দিয়ে গঠিত। তবে কেন্দ্রকে শক্তির বিশিষ্ট স্তর ভেদ আছে; এ কথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই স্তরবিশেষের কথা শ্রোয়েডিঙ্গারের সেই সমীকরণ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল, যে সমীকরণ কেন্দ্রকীয় জগৎ সমেত সর্বপ্রকার সংশ্লিষ্ট কণাসমাবেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পরমাণুর ক্ষেত্রে যে সূত্র দিয়ে বিভিন্ন কণার পারস্পরিক ক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়, তা হল সুপরিচিত কুলম্-এর সূত্র। এই সূত্রের সাহায্যে ইলেকট্রনের পারস্পরিক বিকর্ষণ অথবা কেন্দ্রক কর্তৃক তাদের আকর্ষণের ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণে এই নিয়মই প্রয়োগ করি। কিন্তু কেন্দ্রীয় বলগুলির কোনো কোনো সূত্র এ যাবৎ জানা যায় নি।

কাজেই পদার্থবিজ্ঞানীদের বিপরীত সমস্যার সমাধান করতে হবে : গামা রশ্মির বর্ণালী লক্ষ করা এবং এর থেকে, কেন্দ্রকে যে বিভিন্ন শক্তিস্তর রয়েছে এবং তাদের যেভাবে পূরণ করা হয়েছে, তার হিসাব করা। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে, একদা পরমাণুর শক্তিস্তরগুলির একীকরণ করতে গিয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা ঠিক এই ধরণের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাতেন। গামা রশ্মি বর্ণালীর প্রতিটি রেখার উজ্জ্বলতা ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিকরা কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ায় একটি সূত্র আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হলেন।

দেখা গেল এই কাজ ভয়ংকর কঠিন। আজ পর্যন্ত এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। সুস্পষ্টতই, কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ কিছু না জানা পর্যন্ত এই সমস্যা থেকেই যাবে। এই কাজ করতে যে সব পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা পরের অধ্যায় আলোচনা করা হবে।

এই সব অসুবিধার কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, কেন্দ্রকের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিস্তরের ধারণা এবং প্রোটন ও নিউট্রনের 'সম্ভাবনা মেঘের' দ্বারা গঠিত খোলকের ধারণা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। এই ধারণার সাহায্যে গামা রশ্মির উৎস ও তার বৈচিত্র্যময় বিশেষত্বের অনেক কথা আমরা জানতে পেরেছি।

প্রথমতঃ, একটা কথা পরিষ্কার ; গামা রশ্মির কণিকা বিকিরণ করতে হলে কেন্দ্রককে ন্যূনতম শক্তিসমন্বিত কোন স্থায়ী অবস্থা থেকে এমন কোন অবস্থায় যেতে হবে যা অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তির আধার : যে অবস্থাকে পরমাণুর সাদৃশ্যে বলা চলে "উত্তেজিত অবস্থা"। যখন কেন্দ্রক তার সাবেক অথবা অধিকতর স্থায়িত্বশীল অবস্থায় ফিরে যায়, তখনই গামা কণিকার বিকিরণ হয়।

বৈদ্যুতিক বলের তুলনায় কেন্দ্রকীয় বল লক্ষ লক্ষ গুণ অধিকতর

শক্তিশালী। এই কারণে ইলেকট্রনের তুলনায় কেন্দ্রকের বিভিন্ন শক্তিস্তর-গুলির পারস্পরিক দূরত্ব অনেক বেশী। তাই স্বভাবতই আশা করতে পারি যে, আলোক ফোটনের তুলনায় গামা কণিকাগুলি ঠিক ততগুণ বেশী শক্তিশালী, যার মানে হচ্ছে গামা কণিকা-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোক তরঙ্গের চেয়ে অনুরূপভাবে কম। বাস্তবে আমরা এই ঘটনাই লক্ষ্য করে থাকি। যত রকম বিকিরণের কথা আমাদের জানা আছে, তার মধ্যে গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নূন্যতম।

এখন তাহলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, কেন কেন্দ্রকের তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গামারশ্মি অংশ গ্রহণ করে। আসলে এই রূপান্তর কেন্দ্রকের একটি বিশেষ অবস্থা থেকে অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় সংক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, মাত্র এককালীন কয়েকটি বাড়তি কণিকার অপসারণ ঘটিয়ে কেন্দ্রকের স্থায়িত্ব আনা যায় না। অবশ্যই এই অবস্থায় নতুন কেন্দ্রকটি আগের তুলনায় দৃঢ়তর হয় কিন্তু এখনও তা উত্তেজিত অবস্থায় আছে। তার অবস্থা-স্তরের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে গামা কণিকার বিকিরণ মারফৎ। এই বিকিরণ শেষ হলে কেন্দ্রকের তেজস্ক্রিয়তাও নিঃশেষ হয়ে যায়।

কেন্দ্রক কিন্তু এমন আর এক ভাবে তার বাড়তি শক্তি ক্ষরণ করতে পারে, যা পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রন খোলকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। গামা কণিকা ক্ষেপণ না করে কেন্দ্রক তার বাড়তি উত্তেজনা শক্তি চুপিসাড়ে ইলেকট্রন মেঘের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই শক্তি এত প্রচণ্ড যে কেন্দ্রকের এই 'দান' পারমাণবিক সৌধের পক্ষে প্রায় একটা ভূমিকম্পের মত। এ কথা সত্য যে গাঁথুনিটা তা সত্ত্বেও টিকে থাকে, তবুও তার দেহ থেকে কয়েকটি ইলেকট্রন প্রচণ্ড গতিবেগে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনাটি সরাসরি গামা রশ্মি বিকিরণের সঙ্গে সফলভাবে পাল্লা দিয়ে চলে এবং একে বলা হয় আভ্যন্তরিক বিপরিণাম।

॥ কেন্দ্রক কি তরলের কৌটা ॥

কেন্দ্রকীয় খোলক, ঐন্দ্রজালিক কেন্দ্রকসমূহ……ছবিগুলি নিঃসন্দেহে মনোজ্ঞ। কিন্তু এই মনোহর ছবি দিয়ে অনেক পরীক্ষালব্ধ তথ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ; ঐ তথ্যগুলি খোলক মডেলের কাঠমোর মধ্যে খাপ খায় না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রথমতঃ, সত্যই যদি কেন্দ্রকীয় খোলক থাকতো, তবে তার সঙ্গে ইলেকট্রন খোলকের প্রচুর চারিত্রিক প্রভেদ দেখা যেত। আসলে কেন্দ্রকের মধ্যে খোলকের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করাই কষ্টকল্পনা। কেন্দ্রকের এমন কোন অন্তঃস্থল নেই, যার চারপাশে কেন্দ্রকীয় কণিকার সমাবেশ হতে পারে। তা ছাড়া, পরমাণুর বহিঃস্থ অংশে যে সব কণিকা আছে, তাদের সংখ্যা এবং কেন্দ্রকের মধ্যে আবদ্ধ কণিকাসমষ্টির কণিকাসংখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সবশেষে বলতে হয়, দুই ধরণের খোলক থাকবার তথা—একটি প্রোটন খোলক, অপরটি নিউট্রন খোলক।

সুতরাং বহিঃস্থ পারমাণবিক জগত থেকে খোলক কথাটি আমদানী করে যখন তাকে কেন্দ্রকের অন্তর্জগতে প্রয়োগ করা হয়, তখন তার মানে পাল্টে গিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হল এক ধরণের নিভৃতচারী, স্থায়ী, সংপৃক্ত কেন্দ্রকীয় কণিকার বিশেষ সমাবেশ। তা ছাড়া এই সমাবেশ সর্বদা অথবা সকল জায়গায় ঘটে না।

অবশ্য হাল্‌কা কেন্দ্রকের বেলায় খোলক কথাটি কিছুটা সঙ্গতভাবে ব্যবহার করা চলে, কারণ এখানে অতি অল্প সংখ্যক কেন্দ্রকীয় কণিকা থাকে। কিন্তু কেন্দ্রকের আয়তন যত বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন শক্তি-খোলকগুলির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তত লোপ পেতে থাকে। ফলে কেন্দ্রকের কাঠামো ক্রমশঃ আকৃতিবিহীন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে এত বেশী কেন্দ্রকীয় কণিকার সমাবেশ হয় এবং তাদের মেঘগুলি পরস্পরের উপর এত বেশি ছড়িয়ে পড়ে যে, কণিকাগুলির একক বিশিষ্ট গতি বলতে কিছুই থাকে না এবং তারা আর কোয়াণ্টাম সূত্র মেনে চলে না বলেই মনে হয়।

এই কারণে কেন্দ্রকে আর পারমাণবিক সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং খোলক মডেলের ধারণা ত্যাগ করতে হয়। তাহলে কেন্দ্রকের চেহারা কোন্ নতুন মডেল দিয়ে চিত্রিত করবো ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছু আগে বৈজ্ঞানিকরা তরল বিন্দুর অণুরূপ কেন্দ্রকের প্রতিরূপ প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবনার কি কারণ, তা পরে আলোচনা করা হবে। কেন্দ্রককে কল্পনা করা হল এমন একটি ভর, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমজাতীয় অথচ যার ভিতরে কোন সুসংবদ্ধ কাঠামো নেই (যেমন আলফা কণিকা অথবা খোলকগুলি)। পৃথক পৃথক কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলি—যাদের বলা হল কেন্দ্রকীয় তরলের অণু—ঐ তরল বিন্দুর মধ্যে বিশৃঙ্খল গতিতে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এর ফলে কেন্দ্রকীয় তরল কিছুটা প্রবাহমান হয়ে ওঠে। তরল বিন্দুর মত কেন্দ্রকেরও চৌহদ্দি আছে, তবে তা প্রবাহমান বা চলমান্ এবং বিভিন্ন অন্তঃস্থ বা বহিঃস্থ কারণে তার কাঠামোর রূপান্তর সম্ভব। তবে এই সব কারণে তার তলদেশ বিদীর্ণ হয় না। কেন্দ্রকীয় বিন্দুর চতুঃসীমায় কেন্দ্রকীয় তরলজনিত এক ধরণের পৃষ্ঠটান থাকায় তলদেশটি অক্ষত থাকে। এই কেন্দ্রকীয় পৃষ্ঠটান সাধারণ তরলের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আকর্ষণ বলের প্রভাবে এবং তরল বিন্দুর বহির্দেশীয় অন্য কোন বলের অনুপস্থিতি হেতু, কেন্দ্রকীয় কণাগুলি এক জোটে বাঁধা থাকে। এবং কেন্দ্রকীয় বলের প্রভাব এই কেন্দ্রকীয় তরলকে বিন্দুর আকৃতি দেয়।

উপমার এইখানে শেষ। এখন সাধারণ তরলের সঙ্গে কেন্দ্রকীয় তরলের তুলনা করা যাক। সাধারণ হিসাবে দেখা যায় যে, কেন্দ্রকের অন্তর্গত কণিকাগুলি সাধারণ তরলের অনুর তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী ঠেসাঠেসি হয়ে অবস্থান করে। জলের থেকে যে জলবিন্দু বেরিয়ে আসে সেই মাপের একটি কেন্দ্রকীয় তরল বিন্দুর ওজন এক কোটি টনেরও বেশী।

বিস্ময়কর কথা! অথচ আমরা বিলক্ষণ জানি যে, কোন বস্তুর গুণ তার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

একটি গ্যাসের ঘনত্বকে যদি হাজার গুণ কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে তা কেলাসে রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা সূত্রের নিয়মাধীন হয়ে পড়ে। কাজে কাজেই আমাদের ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, আভ্যন্তরিক দিক থেকে সাধারণ তরলের সঙ্গে কেন্দ্রকীয় তরলের কোন মিল নেই। তাদের ঘনত্বে প্রচণ্ড পার্থক্য (কোটি কোটি গুণ) এবং কেন্দ্রকীয় কণিকা ও সাধারণ অণুর মধ্যে যথাক্রমে যে সব বল কাজ করে তারা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে এদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কাঁচের ওপর এক বিন্দু পারদ রেখে আস্তে আস্তে টোকা মারুন। পারদ বিন্দুতে কম্পনের সৃষ্টি হবে এবং ছোট ছোট তরঙ্গের দল তার তলদেশের দিকে ধাবমান হবে। যদি বিন্দুটিকে জোরে টোকা দেওয়া যায় তবে তা গুঁড়িয়ে ছোট ছোট বিন্দুর সৃষ্টি করবে।

এই ঘটনা থেকে সম্প্রতিকালের পদার্থবিদ্যার একটি সর্বাধিক বিস্ময়কর আবিষ্কার আমাদের মনে আসবে। ১৯৩৯ সালে একটি ঘটনায় বৈজ্ঞানিক মহল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল এবং যাদের অমঙ্গলসূচক তাৎপর্য প্রাকযুদ্ধের দিনগুলিতে একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানীরাই বুঝতে পেরেছিলেন। তা হল ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের চূর্ণন বা ভাঙ্গনের আবিষ্কার।

পারমাণবিক কেন্দ্রক জগতের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের সুসঙ্গত ব্যাখা করবার প্রয়াসে বিভিন্ন দেশের তত্ত্ববিদরা এগিয়ে এলেন। নিল বোর্ ও সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ইয়া ফ্রেংকেল স্বতন্ত্রভাবে একটি মতবাদ প্রস্তাব করলেন। কেন্দ্রক সম্পর্কে তাঁদের নব প্রচারিত তরল বিন্দুর নক্সার সাহায্যে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের চূর্ণনকে তাঁরা সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেন।

॥ তরলবিন্দু কেন্দ্রক বিদীর্ণ হল ॥

বোর ও ফ্রেংকলের যুক্তি অনেকটা এই ধরণের : ধরা যাক একটি কেন্দ্রক স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। আরো ধরে নেওয়া যাক, যে কেন্দ্রকীয় কণাগুলির গতিবেগ যথেষ্ট সুশৃংখল। যদি কেন্দ্রকের কাঠামো দৃঢ় হয় তবে এর বাসিন্দারা যুগ্মভাবে বেশ নিভৃত জীবন যাপন করে চলবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে হঠাৎ বাইরে থেকে একজন অনিয়ন্ত্রিত অতিথি এসে হাজির হল। সে সরাসরি অন্দরমহলে প্রবেশ করে প্রত্যেক বাসিন্দাকে ব্যস্ত করে তুললো। কুশল ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের হৈ হুল্লোড়ে কেন্দ্রকীয় গৃহটি নরককুণ্ডে পরিণত হল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশ এমন হল যে, এখন আর নবাগত কণিকাটিকে পৃথকভাবে চিনে নেওয়া অসম্ভব। যে শক্তি নবাগত সঙ্গে করে এনেছিল, তা নিমেষে সকলের মধ্যে বিতরিত হল।

সুতরাং এখন অন্যান্য কেন্দ্রকীয় কণাগুলি অথবা নবাগত কণার পক্ষে ঐ শক্তি ত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে গেল। কাজেই একটি নতুন কেন্দ্রকের জন্ম হল। এন. বোর একে বলেছেন যৌগ কেন্দ্রক।

কিন্তু এই অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। শেষ পর্যন্ত কোন একটি কণিকা এমন জোর ধাক্কা খায় যে, কেন্দ্রকের সীমানায় যে বিভব বেড়া আছে তা লংঘন করে বাহিরে বেরিয়ে পড়ে। যে কণিকাটি বেরিয়ে গেল তার প্রকৃতি যদি নবাগত কণিকার থেকে পৃথক হয়, তবে যে সব ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেল, তাদের বলা হবে কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া। নামটি সঙ্গত কারণ নবলব্ধ কেন্দ্রক আর সাবেকী কেন্দ্রক এক জাতীয় নয়। রসায়নেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে যার ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে বস্তুগুলি যা থাকে, পরে তা থাকে না।

যৌগ কেন্দ্রকে কণিকাগুলির এলোপাথাড়ী চলন বলন তরল বিন্দুর অণুগুলির তাপজনিত অনির্দিষ্ট গতিবেগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তরল বিন্দু থেকে পৃথক পৃথক অণুগুলি মাঝে মাঝে বাষ্পে পরিণত হয়। ঠিক একই ভাবে যেন বহিরাগত কোন কণিকার ধাক্কায় কেন্দ্রক 'উত্তপ্ত' হয় এবং তার দেহ থেকে কেন্দ্রকীয় কণিকা 'বাষ্প' হয়ে বেরিয়ে আসে।

এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রকের মধ্যে কি ঘটে তা কেউ সঠিক জানে না। তবে একথা বলা যায় যে, কেন্দ্রক উত্তপ্ত তরল বিন্দুর মত আচরণ করে। বিন্দুটির তলদেশ ভাল করে লক্ষ্য করা যাক। এখানে সব সময় একটা আলোড়ন বা কম্পন চলেছে এবং কোন একটি অণু তরলের তলচ্যুত হয়ে বেরিয়ে গেলে অপর অণুগুলি তার শূন্যস্থান পূর্ণ করে।

আমরা জানি, তরলের তলদেশে যে দোলনের সৃষ্টি হয় তার বিস্তারের পরিমাণ নির্ভর করে ঐ তরলের পৃষ্ঠ-টানের ওপর। এই টান যত কমে বিস্তার তত বাড়ে। আমরা আগেই বলেছি যে কেন্দ্রকীয় তরল বিন্দুর পৃষ্ঠ-টান কেন্দ্রকীয় আকর্ষণী বলের প্রভাবে সৃষ্ট হয়। কেন্দ্রকের ভর ও আয়তন যত বেশী ও বড় হয়, এই বলগুলি ততই ক্ষীণতর হয়, আর স্বভাবতই কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলিকে শক্ত করে বেঁধে রাখা তাদের পক্ষে ততই দুরূহ হয়ে ওঠে। ফলে অতি অল্প ধাক্কার প্রভাবেও ভারী কেন্দ্রকের তলদেশে ভয়ংকর দোলন সুরু হয়ে যায়।

ভারী ও অপেক্ষাকৃত নমনীয় অস্থায়ী ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের সঙ্গে

নিউট্রনের সংঘর্ষে এই রকম ধাক্কায় উৎপত্তি হতে পারে (এখানে স্মরণীয়, এই কেন্দ্রকগুলিতে দৃঢ়তার অভাব আছে বলেই তারা তেজস্ক্রিয়)। তাপজনিত নিউট্রনের (যার শক্তি পারমাণবিক নিউট্রনের তুলনায় কোটি কোটি গুণ কম) নামমাত্র সংঘর্ষেও ইউরেনিয়াম-235 কেন্দ্রকের ভাঙ্গন ধরে।

স্বাভাবিক জলীয় বিন্দু কি ভাবে বিভক্ত হয়? দ্রুতগতির চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রণালীর সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। যথোপযুক্ত সংঘর্ষের প্রভাবে বিন্দুটি অনুনাদিত হয় এবং তার তলপৃষ্ঠে তরঙ্গের সঞ্চার হয়। তারপর বিন্দুটি একপেশে ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে কোমরের কাছে বিভক্ত হয়ে তা দুইটি বিন্দুতে পরিণত হয়।

অবশ্য বিন্দুর জটিলতর বিভাজন প্রণালীও লক্ষ্য করা গেছে, যে ক্ষেত্রে বড় বড় বিন্দু বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন আয়তনের ছোট ছোট বিন্দু কণিকার সৃষ্টি করে।

বোর ও ফ্রেংকেল অনুমান করেন যে, নিউট্রন কণিকা ভারী ও অস্থায়ী কেন্দ্রকের উপর আঘাত হেনে তার তলপৃষ্ঠে বিকৃতি ঘটায়। ফলে পূর্বোক্ত ঘটনার অনুরূপে কেন্দ্রকের ভাঙ্গন ধরে।

॥ কেন্দ্রকীয় ভাঙ্গনের গোপন রহস্য ॥

কিন্তু নিউট্রন কেন কেন্দ্রকীয় ভাঙ্গনের জন্য দায়ী হয়? এবং ছোট বা মাঝারি ভরের কেন্দ্রকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্ট হলে যেমনটি ঘটে, সেইভাবে প্রত্যেকটি কণিকার বাষ্পীকরণ না ঘটিয়ে বৃহৎ ও ভারী কেন্দ্রকগুলি কেন বড় বড় টুকরায় বিভক্ত হয়ে যাওয়া পছন্দ করে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব যে, যে বেড়া কেন্দ্রককে বহির্জগৎ থেকে পৃথক রাখে, আগেই বলা হয়েছে, সেই বেড়ার দুইটি দিক আছে। কিন্তু তারা প্রতিসম নয়।

কেন্দ্রকীয় বেড়ার ভিতর দিকটি নিউট্রনের তুলনায় প্রোটন কণিকাগুলির ক্ষেত্রে বেশী ঢালু। এর উচ্চতা কেন্দ্রকীয় বলগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং প্রোটনের ক্ষেত্রে প্রোটন কণিকাগুলির বিকর্ষণ বলের প্রভাবে ঐ উচ্চতার হ্রাস কমে যায়। এই বেড়ার বাধায় স্বাভাবিক অবস্থায় কণিকাগুলি কেন্দ্রক

ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে না। সুতরাং কেন্দ্রক মোটামুটি দৃঢ় থাকে। কিন্তু বাইরের দিকে বেড়ার কথা একটু স্বতন্ত্র। প্রোটনের ক্ষেত্রে তা বাধাই থেকে যায়। এই কারণেই দেখা যায় যে, স্বজাতীয় কোন অতিথি বাহির থেকে ভেতরে এসে পড়লে কেন্দ্রকের অন্তর্গত প্রোটন কণিকাগুলি এ জোটে তাকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে। অথচ নিউট্রনের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন বাধা নেই কারণ সে বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। বরঞ্চ, এখানে যে কূপ আছে, ইচ্ছা করলে তারা তার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারে। বস্তুতঃ কেন্দ্রকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সেখানেই থেকে যায়।

অতএব প্রোটনকে যদি কেন্দ্রকের মধ্যে ঢুকতে হয়, বিশেষ করে যে কেন্দ্রক ভারী ও বহু প্রোটন কণিকার সমাবেশে গঠিত—তবে তাকে হতে হবে প্রভূত শক্তির অধিকারী (পরিমাণে কোটি কোটি ইলেকট্রন-ভোলট্)। কিন্তু নিউট্রনের বেলায় কোন শক্তির প্রয়োজন নেই। তাই অতি অল্প শক্তির নিউট্রনও (এমন কি তাপজনিত নিউট্রন যার শক্তি এক ইলেকট্রন ভোলটের দশ সহস্র অংশ) কেন্দ্রকে ঢুকে পড়তে পারে।

অতঃপর, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। মনে হতে পারে যে, ইউরেনিয়াম-235-এর কেন্দ্রকের মধ্যে গিয়ে নিউট্রন তার ভর এত বাড়িয়ে দেবে যে, কেন্দ্রকটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। কিন্তু একটির পরিবর্তে ঐ কেন্দ্রক তার দৃঢ়তাপে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে আরো তিনটি নিউট্রনকে আত্মস্মাৎ করে নিজেকে ইউরেনিয়াম-238-এর কেন্দ্রকে রূপান্তরিত করতে পারে।

তাহলে আমরা কি দেখলাম? নবাগত নিউট্রন কেন্দ্রকের ভর বা তার শক্তি বাড়ায় না। এমন কি তাকে কোন রকম নাড়াও দেয় না। কিন্তু তা যদি হয়, তবে ইউরেনিয়াম-235-এর ভাঙ্গন ঘটে কি ভাবে?

বিষয়টি সত্যই বড় জটিল এবং আবার আমাদের এই সব কোয়ান্টামদের কথায় ফিরে আসতে হয়; আসল কথা হল, ইউরেনিয়াম-235-এর কেন্দ্রকের ভাঙ্গন ঘটাতে পারে কেবল এক বিশিষ্ট শক্তির নিউট্রন। এই শক্তির পরিমাণ কত হবে, তা নির্ভর করে ইউরেনিয়াম-235 কেন্দ্রকের স্থায়ী অবস্থা ও তার নিকটস্থ উত্তেজিত অবস্থায় যথাক্রমে যে শক্তিস্তরগুলি রয়েছে তাদের দূরত্বের উপর। সেই কারণে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে

উত্তেজিত করতে সক্ষম হয় সেই নিউট্রন, যার শক্তির পরিমাণ উল্লিখিত স্তরগুলির মধ্যে শক্তি-পার্থক্যের সমান।

ইউরেনিয়ান-235 কেন্দ্রকের উত্তেজিত ও স্থায়ী অবস্থার মধ্যে শক্তিদূরত্ব খুবই অল্প। মনে হয়, উত্তেজিত অবস্থায় এসে এই কেন্দ্রক হাল্কা কেন্দ্রকের মত একটা গামা ফোটন ও অপর কোন কণিকা বিকিরণ করে তার পূর্বতন অথবা অন্য কোন স্থায়ী অবস্থায় ফিরে যাবে। কিন্তু তা হয় না।

আর এই কারণে তা হয় না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারী কেন্দ্রক পৃথক পৃথক কণিকার পরিবর্তে আলফা কণিকা (কণিকা চতুষ্টয়) বিকিরণ করাই পছন্দ করে। তার কারণ পৃথক পৃথক কণিকার তুলনায়, আলফা কণিকা বিকিরণের বিভব-বাধা অনেক কম। কিছুটা সেই রকম ব্যাপার এখানেও দেখা গেছে। ইউরেনিয়াম-235 কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে বাধার পরিমাণ অল্প হওয়ায় ভাঙ্গনের দরুণ বড় বড় কেন্দ্রকীয় অংশগুলির সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত অবস্থায় এসে পড়লে, এই ধরণের কেন্দ্রক টলমল করতে করতে ভাঙ্গনের বাধা ডিঙ্গিয়ে নিজেকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে ফেলে।

অণুর ক্ষেত্রেও এই ধরণের ঘটনা অনেক ঘটে। অণু থেকে একটি ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু তাকে পৃথক পৃথক পরমাণুতে বিভক্ত করতে অনেক কম শক্তির প্রয়োজন হয়। এই কারণেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনের পরিবর্তে অণুগুলি পরমাণুতে অথবা পরমাণু জোটে বিভক্ত হয়। নিউট্রনের সাহায্যে ইউরেনিয়াম-238 কেন্দ্রকের ভাঙ্গন পদ্ধতি অনেকটা ইউরেনিয়াম-235-এর ভাঙ্গন পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এই কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে উত্তেজিত ও সাবেকী স্থায়ী অবস্থার মধ্যে একটি বিরাট শক্তির ব্যবধান রয়েছে, যার পরিমাণ কয়েক লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট। কাজেই এই রকম কেন্দ্রককে উত্তেজিত অবস্থায় নিয়ে যেতে হলে অত্যন্ত দ্রুতগতি ও শক্তিশালী নিউট্রনের প্রয়োজন।

॥ কতগুলি কেন্দ্রক থাকতে পারে ॥

পাঠক নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন যে, এই সংখ্যা পরিমিত। কেন্দ্রক যত ভারী হবে, তার দৃঢ়তা ততই কম হবে। কিন্তু ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের

পক্ষেও তার 'বাড়তি' আলফা কণিকাগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জিত করে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর অবস্থায় উন্নীত হতে গড়ে শত শত কোটি বছর লেগে যায়। হিসাব করে দেখতে অসুবিধা হয় না যে, ইউরেনিয়ামের চেয়েও ভারী কেন্দ্রককে আলফা বিকিরণ করতে হলে বেশ কয়েক বছর বেঁচে থাকতে হয়।

আরও একটি বস্তু আছে, যা এই "ভারভিত্তিক সংখ্যা"র ওপর সীমারেখা টেনে দেয়। আমরা কিছু আগে দেখেছি যে, বড় বড় অংশে বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে ভারী কেন্দ্রকগুলি নিজেদের ঘিরে রাখে অল্প বাধার পাঁচিল দিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও—পাঠক নিশ্চয় অনুমানে বুঝতে পারছেন, কেন্দ্রকের পক্ষে এই বাধা অতিক্রম করে যাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা কিছু পরিমানে থাকে।

নিউট্রন অথবা অন্য কোন প্রকার উত্তেজনার প্রয়োজন হয় না। কেন্দ্রক আপনা থেকেই টুকরা হয়ে যায় এবং সুড়ঙ্গাকারে নিজের বাধা অতিক্রম করে যায়। কেন্দ্রকের ভাঙ্গন প্রকৃতই কি এই ভাবে ঘটে? ১৯৪০ সালে বাস্তব অভিজ্ঞতায় জানা গেল, হ্যাঁ, তাই হয়। সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী ফ্লেরভ এবং পেত্রবাক কেন্দ্রকের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙ্গন আবিষ্কার করলেন। বিষয়টি নিছক কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার অনুমান সাপেক্ষ না হয়ে প্রত্যক্ষ তথ্যের দ্বারা স্বীকৃতি।

কেন্দ্রক যত ভারী হবে এবং তার মধ্যে যত বেশী কণিকা থাকবে, এই ভাবে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা তার তত বেশী হবে। তবে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু ক্যালিফর্নিয়ামের (সংখ্যা 98) স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙ্গন ঘটতে কোটি কোটি বছরের পরিবর্তে গড়ে মাত্র কয়েক বছর লাগে।

তাছাড়া, অন্য এক রকম কেন্দ্রকের কথা আমরা জানি, যার ক্ষেত্রে ভাঙ্গনের বাধা লোপ পেয়ে যায়। এই রকম কেন্দ্রকের ভাঙ্গনে কোন আপত্তি থাকে না প্রকৃতপক্ষে, উক্ত কেন্দ্রক জন্ম লাভই করতে পারে না, কারণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তা টুকরা হয়ে যায়। পরমাণু গঠনের "স্বীকৃত পরিকল্পনার" শেষ সংখ্যা হল 120। তার মানে, কেন্দ্রকে (কাজে কাজেই পরমাণুতেও) কখনও 120-র বেশী প্রোটন কোন অবস্থাতেই থাকতে পারে না।

কেন্দ্রক ভাঙ্গনকে কতটা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে তা নির্ভর করে তাতে কতগুলি প্রোটন কণিকা আছে, তার উপর। ভারী কেন্দ্রকে প্রোটন কণিকাগুলির পারস্পরিক বিকর্ষণ বল তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায় আর দূর সীমান্ত প্রদেশের কণিকাগুলির মধ্যে কেন্দ্রকীয় আকর্ষণ বল খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়।

তার ফলে আমরা দেখি যে, কেন্দ্রকীয় তলপৃষ্ঠের ধারে পাশে প্রোটন কণিকাগুলি দেদীপ্যমান অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাদের এক পাশে নিউট্রন কণিকার মন ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বিকর্ষণ বলের বিক্রিয়ায় তলপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে যায়, কেন্দ্রক বিভক্ত হয়ে যায় বড় বড় খণ্ডে।

॥ একই সময় খোলক এবং তরল বিন্দু রূপে কেন্দ্রকের অবস্থান ॥

পারমাণবিক কেন্দ্রকের দুটি প্রতিকৃতির কথা আমরা কিছু আগে আলোচনা করেছি। এদের একটি খোলক কাঠামোর কথা জানিয়ে আমাদের সামনে পারমাণবিক গঠনের চিত্র তুলে ধরে। অন্যটি তরল বিন্দুর উদাহরণ মনে করিয়ে দেয়। এদের মধ্যে কোন্ প্রতিকৃতি বাস্তবানুযায়ী?

সবচেয়ে যুক্তিসম্মত হল, দুটি প্রতিকৃতিই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যথোপযোগী। খোলক প্রতিকৃতি থেকে সেই ধরণের কেন্দ্রকের বর্ণনা আরো ভাল ভাবে পাওয়া যায়, যা এখনো কোন বাহ্যিক কারণে উত্তেজিত না হয়ে সুপ্ত আছে। আবার যখন দেখি, কোন কেন্দ্রক চাপের ভারে পিষ্ট, চারপাশের সব কিছু ফুটছে, কণিকাগুলি পরস্পরকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারছে অথবা বাষ্প হয়ে বেরিয়ে পড়ছে এবং এই সব ঘটনার প্রভাবে কেন্দ্রক ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ছে, তখন এদের সঠিক বিবরণ পেতে হলে তরল বিন্দুর প্রতিকৃতি অপেক্ষাকৃত বেশী কাজে লাগে।

এই দুটি প্রতিকৃতির একীকরণ ক'রে এমন একটা প্রতিকৃতি কি গঠন করা যায় না, যার সাহায্যে ঐ দুই রকমের ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করা যায়? আমরা কিন্তু প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম মতবাদ থেকে জানতে পেরেছি যে, দরজি যে

ভাবে দুটি কাপড়ের টুকরা জুড়ে দেয়, সেইভাবে এই দুই প্রতিকৃতি জুড়ে দেওয়া যায় না।

একটি সংযুক্ত প্রতিকৃতির কথা, যাকে বলা যায় এক সামান্যীকৃত প্রতিকৃতি, বোরের পুত্র বিখ্যাত ড্যানিশ পদার্থবিজ্ঞানী ওগ্‌ বোর দশ বছর পূর্বে উত্থাপন করেছিলেন। যদিও এই মতবাদের কিছু কিছু অংশ পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছিল, তবুও সামগ্রিকভাবে এর কিছু অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মতবাদের মূল ভিত্তি হল, কেন্দ্রক তখনই খোলক কাঠামোর নিদর্শন হয়, যখন তার অন্তর্গত প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা সেই ঐন্দ্রজালিক সংখ্যার সমান অথবা তার কাছাকাছি হয়। অন্যথায়, তার আচরণ তরল-বিন্দুর অনুরূপ। শুধু তাই নয়। এই ধরণের আচরণ তখনই আরো প্রকট হয়, যখন পরিপূর্ণ এবং বদ্ধ খোলকগুলি বাইরে অবস্থিত কণিকার সংখ্যা তাদের সর্ব নিকটস্থ বৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ খোলকে অবস্থিত কণিকা সংখ্যার প্রায় ⅓ অংশ হয়।

দেখা গেছে যে, বিশিষ্ট কণিকার একক বিকিরণ থেকে সুরু করে সমস্ত অবস্থার চরম ভাঙ্গন ধরানো কেন্দ্রকের এই সব খামখেয়ালী আচরণের পিছনে আছে, পরিপূর্ণ কেন্দ্রকীয় খোলকের বাইরে অবস্থিত কণিকাগুলি। কিন্তু পরিপূর্ণ খোলকে যে সব কণিকা থাকে, তাদের আচরণ অপেক্ষাকৃত বিনীত, কেন্দ্রকের এই সব কার্যকলাপে তারা জড়িত থাকে না।

আমাদের আবার ফিরে আসতে হয় সদর মহলের ইলেকট্রন খোলকের কথায়। পাঠকের মনে আছে যে, অনঢ় পরমাণুর বদ্ধ খোলকে অবস্থিত ইলেকট্রনের দল অত্যন্ত উন্নাসিকভাবে উদাসীন থাকে। অন্য দিকে, অপরিপূর্ণ খোলকের ইলেকট্রনগুলি প্রতিবেশী পরমাণুগুলির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে মেলামেশা করে অণু, কেলাস অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

অথচ সামান্যীকৃত প্রতিকৃতিতে ধরা হয়েছে যে, কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির মধ্যে সরাসরি পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে খুব কমই এবং খোলক রূপের তাৎপর্য অতি সীমিত। তা ছাড়া পারস্পরিক ক্রিয়া যেমন দুটি ক'রে কণিকার মধ্যে চলে, তেমনি দলবদ্ধ কণিকার মধ্যেও তা ঘটে বলে এখানে তরলবিন্দু প্রতিকৃতি অধিক প্রযোজ্য। কেন্দ্রকীয় তলপৃষ্ঠের বিকৃতির মধ্যে দিয়ে এই

ঘটনাগুলি প্রকাশিত হয়। তার ফলে কেন্দ্রকে প্রোটন আধানের বিস্তার মণ্ডলাকারে হয় না। এ ছাড়াও, অন্য কিছু কিছু কেন্দ্রকীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।

সামান্যীকৃত প্রতিকৃতি থেকে পারমাণবিক কেন্দ্রকের বৈদ্যুতিক, চৌম্বক অন্যান্য ধর্মগুলির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে অত্যন্ত ভালভাবে খাপ খায়।

প্রতিকৃতি এবং তার ভিত্তিতে পদার্থবিজ্ঞানীরা পারমাণবিক কেন্দ্রকের বিভিন্ন ধর্মের যে বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছেন, তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা গেল। এইগুলি বাদেও অন্যান্য অনেক তথ্যের অনুমান করা গেছে।

এতগুলি প্রতিকৃতির স্বীকৃতি আমাদের কাজের পক্ষে মঙ্গলজনক না ক্ষতিকারক? খুব সম্ভবতঃ ক্ষতিকারক। কারণ কেন্দ্রকের বহুমুখী স্বভাব সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে তার চেহারা একটাই। একাধিক প্রতিকৃতি থেকে এককভাবে যার কোনটি-ই অযোগ্য নয় অথচ প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু কিছু ত্রুটি আছে—বোঝা যায় যে, যদিও কেন্দ্রক এক সমন্বিত কণিকা, তবুও এর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা বা জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ।

এ যেন আলোছায়ার বিভিন্ন সমাবেশে কোন একটি বস্তুর বিভিন্ন কোণ থেকে নেওয়া বিভিন্ন অংশের অনেকগুলি ফটো। স্বভাবতঃই, ঐ টুকরা অংশের ছবি দেখে মূল বস্তু সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যায় না।

পারমাণবিক কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বপ্রধান অসুবিধা হল এই যে, আমরা কেন্দ্রকীয় বলগুলির বিষয় এখনও ভালভাবে জানি না।

কণিকাগুলির আধান নিয়ে এই বলগুলি মোটেই মাথা ঘামায় না। তাদের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং তারা প্রচণ্ড শক্তিশালী। এইখানে বলে রাখা ভাল যে, অন্যান্য বিনিময় বলের মত এই বলগুলিও পারস্পরিক ক্রিয়ারত কণিকাগুলির পারস্পরিক ঘূর্ণনের গতির উপর নির্ভরশীল।

কেন্দ্রকীয় বলগুলিকে আমরা তখনই আরো ভালভাবে জানতে পারব, যখন পদার্থ বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির অন্তঃস্থল পর্যবেক্ষণ করে তাদের কাঠামো সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন। এই সমস্যা নিয়ে পদার্থবিদ্যা সবে নাড়া চাড়া সুরু করেছেন। গবেষণার বিষয় হিসাবে এটি স্বয়ং একটি জগৎ, যা পারমাণবিক কেন্দ্রকের জগতের চেয়েও বোধ করি বিস্তৃততর।

॥ কেন্দ্রকে কখনো ছিল না, এমন সব কণিকা তাই থেকে বেরিয়ে আসে ॥

আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি, কি করে কেন্দ্রক থেকে আলফা কণিকা এবং গামা ফোটন বেরিয়ে আসে। কিন্তু বিটা কণিকা অথবা সাধারণ ইলেকট্রনের বিকিরণ কি ভাবে হয় ?

প্রায় তিরিশ বছর আগে যখন এই সমস্যা নিয়ে প্রথম কাজ সুরু হয়, তখন পদার্থবিজ্ঞানীদের যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় ছিল। কেন্দ্রকের আলফা এবং গামা তেজস্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা তখন সবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে পাওয়া গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল যে, বিটা তেজস্ক্রিয়তার রহস্যও বোধহয় বেশীদিন গোপন থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল, প্রকৃতি তার গোপন কথা জানাবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়। এখন কি আজ অবধি পদার্থবিদ্যা এই রহস্যকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করতে পারে নি।

গোলমালের জট ছাড়াতে গিয়ে যে সমস্যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আরও জড়িয়ে পড়েছে, তা হল বিটা তেজস্ক্রিয়তা, সাধারণতঃ যার মাধ্যমে পারমাণবিক কেন্দ্রকের ক্ষয়সাধন হয়। ১৯৩৪ সালে আইরিন কুরী ও ফ্রেডরিক জোলিও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করার পরে এবং বিশেষ করে পারমাণবিক চুল্লী এসে কেন্দ্রকের উপর বিপুলভাবে গোলাবর্ষণ সম্ভব করে তোলার পরেই পদার্থবিজ্ঞানীদের হাতে এমন সব নতুন তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক আসতে লাগল, যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে কোনকালে ছিল না।

এই শতাব্দীর বিগত পঁচিশ বছরে এক হাজারেরও বেশী নতুন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হয়েছে। এবং এদের অধিকাংশ আলফা কণিকার পরিবর্তে বিটা কণিকা বিকিরণ করে।

বিটা ভাঙনের ব্যাখ্যার প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হল এই যে, কেন্দ্রকের মধ্যে ইলেকট্রন থাকতে পারে না। কেন, তা কেন্দ্রকের প্রোটন নিউট্রন প্রতিকৃতি নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি। পারমাণবিক কেন্দ্রকে ইলেকট্রন পাওয়া উচিত নয় কেন, তার প্রধান কারণ এখন দেখানো হবে।

আসল কথা হল, কেন্দ্রকের মধ্যে ইলেকট্রন খাপ খায় না। কেন্দ্রকের মধ্যে ইলেকট্রনের থাকবার সম্ভাবনা স্বীকার করে নেওয়া চলে যদি আমরা সম্ভাবনার মেঘকে কোনমতে তার মধ্যে পুরে দিতে পারি। কিন্তু অসাধারণ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও যখন তার শক্তি কেন্দ্রকীয় শক্তির সমপরিমাণ হয়, তখনও দ্য ব্রগলি ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ কেন্দ্রকের আয়তন অপেক্ষা শত শত গুণ বেশী হয়। আর আমরা দেখেছি, হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে, ইলেকট্রন মেঘের আয়তন ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘের সমান।

তা ছাড়া আরও একটি কারণে কেন্দ্রকের মধ্যে ইলেকট্রন থাকতে পারে না। তা হল এই যে, অন্যান্য কেন্দ্রকীয় কণিকার ঘূর্ণনের সঙ্গে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের পরিমাণ যোগ করলে যে মান সংখ্যা দাঁড়ায়, তা কেন্দ্রকের ঘূর্ণনের সঠিক মান নয়।

এ বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন একবার সন্দেহাতীত হলেন, কেন্দ্রকে আশ্রয় লাভ করা থেকে ইলেকট্রনকে তখন তাঁরা সোজাসুজি বঞ্চিত করলেন। তাহলে যে কেন্দ্রকে ইলেকট্রনগুলি কোন দিনই ছিল না, সেই কেন্দ্রক থেকে তারা বেরিয়ে আসে কি করে? কেন্দ্রকে যে ভারী কণিকাগুলি আছে তারাই জন্ম দেয় এই অত্যাধিক হাল্কা ইলেকট্রনকে। ঠিক যেন 'বিগবার্থা'-র নলমুখ দিয়ে একটা ছোট গুলি বেরিয়ে আসছে।

এই কেন্দ্রক সত্যই এক অত্যাশ্চর্য বস্তু! আরো বিস্ময়ের কথা, কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ইলেকট্রন পদার্থবিদ্যার দুটি মূল সূত্রকে লঙ্ঘন করে। একটি হল শক্তির নিত্যতার, অপরটি হল কৌণিক ভরবেগের।

॥ ইলেকট্রনের একজন সাঙাৎ আছে ॥

পদার্থবিদ্যার কয়েকটি মূল সূত্র আছে যাদের উপর ভর করে বিজ্ঞানের সমস্ত ভিত্তি গঠিত। এই সূত্রগুলি সকল ক্ষেত্রে এবং সকল ঘটনায় প্রযোজ্য।

একটি হল, গতির কোন সৃষ্টি বা ক্ষয় হয় না। গতির ধারা প্রণালী অথবা আকৃতির পরিবর্তন সম্ভব। এমন কি তা অপ্রত্যক্ষও হতে পারে, কিন্তু কখনই তা উবে যেতে পারে না।

সাবেকী ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার উষাকালে বৈজ্ঞানিকগণ গতি নির্ণয়ের

তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, গতির বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়, তার নিরূপণ ও গণনাও করা দরকার। পদার্থবিদ্যায় দুটি নতুন রাশির প্রচলন হল : শক্তি এবং ভরবেগ।

গতির জন্ম অথবা মৃত্যু নেই, এই প্রস্তাবনা রূপান্তরিত হয়ে আমাদের জানায় যে, একই কর্মে অংশগ্রহণকারী বস্তুগুলির মোট শক্তি ও ভরবেগ অক্ষুণ্ণ থাকে। বন্দুকের পশ্চাদ্‌গমন, কার্যকারক এঞ্জিনের উত্তপ্ত হওয়া, ভূগর্ভে 'পাইল' চালনা ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনা শক্তির নিত্যতা ও ভরবেগের নিত্যতা, এই দুটি সূত্রকে নিখুঁতভাবে মেনে চলে। চক্রবৎ গতির ক্ষেত্রেও এই রকম একটি মূল সূত্র হল, কৌণিক ভরবেগের অক্ষুণ্ণতা। বরফের উপর স্কেট্ চালনার সময়ও ঐ সূত্র মেনে চলা হয়। যখন চালকেরা তাদের হাতগুলি একত্র করে আনে, তখন তাদের ঘূর্ণনের বেগ বৃদ্ধি পায়।

বিটা কণিকার শক্তির মান শূন্য থেকে এক সর্বোচ্চ সংখ্যা পর্যন্ত হতে পারে, এই তথ্যের খবর পেয়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা কি রকম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে—এবং সেই সময়েই এ কথা জানা ছিল—যে, কেন্দ্রক একটি কোয়ান্টাম ব্যবস্থা যার মধ্যে বিশিষ্ট শক্তি-স্তর রয়েছে।

অর্থাৎ, কেন্দ্রকের যে কোন কার্য-প্রক্রিয়া এমন ভাবে সংগঠিত হয় (এই যুক্তির স্বপক্ষে বিটা কণিকা বিকিরণের কথা ধরা যেতে পারে), যার ফলে ঐ কেন্দ্রক এক নির্দিষ্ট শক্তি-স্তর থেকে অন্য একটি নির্দিষ্ট স্তরে চলে যায়। তার মানে, ঐ দুটি স্তরের মধ্যে যে শক্তি ব্যবধান রয়েছে এবং সেই হেতু যে শক্তি নিয়ে বিটা কণিকা বেরিয়ে আসছে, তার মান একইভাবে নির্দিষ্ট। অথচ বিটা ভাঙনে ইলেকট্রন শক্তির যে বর্ণালী পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে বিশিষ্ট পরিমাণের শক্তির অনুরূপ কোন রেখার সংকেত পাওয়া যায় নি। এই সব ঘটনা থেকে মনে হয়েছিল যে, হয় অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রমাণ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রক কোয়ান্টাম সূত্র মেনে চলে না, না হয় তার বিটা ভাঙন শক্তির নিত্যতার সূত্রটি লঙ্ঘন করে।

আর শুধু ঐ সূত্রই নয়। ইলেকট্রন তার সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত শক্তি ও ঘূর্ণনকে সঙ্গে নিয়েই কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসে। এ ছাড়াও আমরা দেখতে পাই যে, বিটা কণিকা বেরিয়ে আসবার পরে কেন্দ্রকীয় ঘূর্ণন

অপরিবর্তিত থাকে। তবে এমনও হতে পারে যে, ইলেকট্রন তার ঘূর্ণনকে কেন্দ্রকের মধ্যে ছেড়ে আসে। কিন্তু না, তা অসম্ভব। আধানবিহীন ইলেকট্রন, চাবিবিহীন পিয়ানো অথবা মস্তিষ্কবিহীন বৈজ্ঞানিকের মত এ ধরণের ঘটনাও অবাস্তব।

ঘটনাগুলি বৈজ্ঞানিক মহলে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কেন্দ্রকীয় ব্যবস্থাপনায় কোয়ান্টাম সূত্রগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিকের এমন দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তাঁরা শক্তির নিত্যতার সূত্রকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সূত্রটি নিছক "সনাতনী" চিন্তার জের মনে করে তাঁরা তা নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিলেন।

আবার অন্যরা মনে করছিলেন যে, তা করা ঠিক হবে না। পরিকল্পনাটি কিছুদিনের মধ্যে পরিত্যক্ত হলেও সংকটের কোন আশু সমস্যার আশা দেখা গেল না। অতঃপর উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ পাওলী মন্তব্য করলেন: "আসামী ইলেকট্রনের একজন সহকারী আছে।" সেই সহকারীর চেহারাটি কেমন?

বিটা ভাঙ্গনে কেন্দ্রক, বিমুক্ত ইলেকট্রনের সমপরিমাণ, একটি বাড়তি ধনাত্মক আধান অর্জন করে। বলা যায়, কেন্দ্রক আয়নিত হয়, যার মানে, সহকারীটি আধান-বিহীন, অর্থাৎ বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ।

এই সহকারী ইলেকট্রনের সমপরিমান অথচ বিপরীতধর্মী ঘূর্ণন থাকা উচিত। এই দুই ঘূর্ণন পরস্পরের নাকচ করায় শেষ পর্যন্ত কোন ঘূর্ণনই অবশিষ্ট থাকে না। তাহলে, ইলেকট্রন ও তার সহকারীকে দেহ থেকে নিক্ষেপ করবার পর কেন্দ্রকের ঘূর্ণন সূত্রানুযায়ী যেমন হবার কথা, সেই রকমই—অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় থেকে যায়।

শেষ কথা, বিটা ভাঙ্গনের ফলে ইলেকট্রন ও তার সহকর্মী যে শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে, তা ইলেকট্রনের চরম সম্ভাব্য শক্তির সমপরিমাণ।

এই চরম বা সর্বোচ্চ শক্তি নির্দিষ্ট পরিমানের। অর্থাৎ, এই শক্তি বিটা ভাঙ্গনের পূর্ব ও পরে কেন্দ্রকের দুটি শক্তি স্তরের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তার সমপরিমানঁ। কিন্তু যে কোন ভাবে এই শক্তিকে ইলেকট্রন ও তার সহযোগীর মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যেতে পারে। বন্টন পদ্ধতি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দিয়ে নির্ধারিত হয় না এবং তার ওপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা চলে না।

এইভাবে কেন্দ্রকের নির্দিষ্ট শক্তির পরিমানও অবিকৃত থাকে, আবার শক্তির নিত্যতা ও ঘূর্ণন সংক্রান্ত সুত্রগুলিকেও লঙ্ঘন করতে হয় না, অচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটি সুকৌশলী উপায় পাওলি আবিষ্কার করলেন।

একটি গোলমাল তবুও থেকে গেল। ইলেকট্রন "চোর" ধরা পড়লেও তার সহযোগী কিন্তু পাশ কাটিয়ে অগোচরেই থেকে গেল। "কেমন তখন আমরা কি বলেছিলাম?" মন্তব্য করলেন অবিশ্বাসীর দল। এবং পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তখন তাঁদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁরা সহযোগীর শেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ তার ভর, পরোক্ষভাবে নিরূপণ করবার চেষ্টা করলেন। সরাসরি নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও একথা জোর করে বলা যায় যে, তার পরিমান অত্যন্ত কম; ইলেকট্রন ভর অপেক্ষা তা অন্ততঃ হাজার গুণেরও কম!

এই অদ্ভুত সহচরকে শেষ পর্যন্ত ধরা গেল। এটি আধানবিহীন এবং এর ভরও প্রায় শূন্য। থাকবার মধ্যে আছে কেবল শক্তি ও ঘূর্ণন। আধান-বিহীন হওয়ায় এর আকৃতি অনেকটা সেই নিউট্রনের মত দাঁড়ায়, যা অল্প কিছু দিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। নিউট্রনের তুলনায় এ কেবল লক্ষ গুণ হাল্‌কা। তাই তাঁরা এর একটি ছোটখাটো নাম দিলেন, "নিউটি নো" বা ক্ষুদে নিউট্রন।

এই দুই ধরণের কণিকায় কোন মিল নেই। প্রোটন কণিকাগুলির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ায় নিউট্রন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তাদের ধাক্কা দিতে পারে এবং সুদৃঢ় বাঁধুনীর পারমাণবিক কেন্দ্রক তৈরী করতে পারে। কিন্তু নিউট্রনের ক্ষেত্রে? এটি এক অশরীরী আত্মা। হিসাব থেকে দেখা যায় যে, এই কণিকা তার অস্তিত্বের কোন নিদর্শন না দিয়েও সমস্ত দৃশ্যমান জগতের —লক্ষ লক্ষ আলোক বৎসর যার ব্যাপ্তি—তার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারে। কোন বস্তুর সঙ্গে এর কোন পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে না।

একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে আমরা বলতে পারি যে, মাত্র কয়েক বছর নিউট্রনোর অস্তিত্বের কথা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে পরোক্ষ প্রমানের মারফৎ। বিটা ভাঙনের তত্বে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, কেন্দ্রকীয় বলের তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তা' প্রযোজ্য। যতদিন পর্যন্ত পাই-

মেশনের আবিষ্কার না হয়েছিল, তত দিন শেষোক্ত তত্ত্বকে অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে হয়েছে। ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী ফার্মীর সহযোগে পাওলী বিটা ভাঙনের যে তত্ত্ব রচনা করেন, পঁচিশ বছর লেগেছিল তার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে।

এই অবসরে কিছুক্ষণের জন্য পিছন পানে তাকানো যাক। বিটা ভাঙনে কেন্দ্রক থেকে যে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে, আমাদের অনুসন্ধান করে জানতে হবে, তা কোথা থেকে আসে।

॥ কেন্দ্রকের মধ্যে ইলেকট্রনের জন্ম ॥

একটি ঘটনার সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমরা পরিচিত হয়েছি। তা হল, অতি ক্ষুদ্র বস্তুর জগতে প্রতি পদেই বিস্ময় ছড়িয়ে আছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন কণিকার পারস্পরিক রূপান্তর নামক এক সার্বিক ঘটনা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে।

আমাদের বিশ্ব জগতে বিভিন্ন বস্তু যেমন সাধারণতঃ বা স্বাভাবিক ভাবে দৃঢ় ও আপেক্ষিকভাবে অপরিবর্তনীয় থাকে, সেই রকম পারমাণবিক জগতে বিভিন্ন কণিকার পারস্পরিক রূপান্তর অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা।

এই রকম একটি রূপান্তরের কথা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি। তা হল কেন্দ্রকীয় বলগুলির অন্তঃস্থলে প্রোটন থেকে নিউট্রনে এবং নিউট্রন থেকে প্রোটনের পারস্পরিক রূপান্তর।

এই প্রক্রিয়ায় একটি ধনাত্মক পাই-মেসন বিকিরণ করে প্রোটন নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়। আবার ঐ নিউট্রন একটি মেসনকে আত্মসাৎ করে প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু আমরা আরও দেখেছি যে, একটি ঋণাত্মক পাইমেশন ক্ষরণ করেও নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে।

হয়তো বিটা ভাঙনে এই মেসনই কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু না, ভরের সূক্ষ্ম মাপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তা হয় না। কেন্দ্রক যা ক্ষরণ করে, তা পাই-মেসন নয়। তা হল এর চেয়ে দুইশত গুণ হাল্কা এক কণিকা, ইলেকট্রন। যে বিশেষ অবস্থায় বিটা ভাঙন ঘটে, তার মধ্যে মেসন কখনই কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

আমাদের আবার একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হয়। নিউট্রন আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে পদার্থবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, পারমাণবিক কেন্দ্রকের প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ এই কণিকাটি অস্থায়ী।

গড়পড়তা হিসাবে বলা যায় যে, কেন্দ্রকের বাহিরে অবস্থিত একটি বন্ধনহীন নিউট্রন তার জন্মের ঠিক ১২ মিনিট পরে নিজেকে প্রোটনে রূপান্তরিত করে। আর এই রূপান্তরেই একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউটি নোর নিঃসরণ ঘটে!

মনে হচ্ছে যে, বিটা-ভাঙ্গন সমস্যার সমাধান এইবার আসন্ন। এই দুটি কণিকাই কি কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসে না? নিঃসন্দেহে! কিন্তু কেন্দ্রকে যে নিউট্রন থাকে, তা বন্ধনহীন বা স্বাধীন নয়। সুতরাং কেন্দ্রকীয় নিউট্রনের প্রোটনে রূপান্তর হওয়া উচিত অন্যভাবে।

তবুও বিটা ভাঙ্গনের গোলকধাঁধায় যেটুকু পথের সন্ধান এত দিনের পরিশ্রমে পাওয়া গেছে, তা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এমন হতে পারে যে, কেন্দ্রকের নিউট্রন হয়তো দু-এক মুহূর্তের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করে।

না, ১২ মিনিট কেন, এক মুহূর্তের জন্যও তা হতে পারে না। কিন্তু স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিটা-কণিকা-বিকিরণকারী কেন্দ্রকগুলি হয় নিজেরাই অস্থায়ী (যেমন পর্যাবৃত্ত ছকের শেষের দিকের ভারী কেন্দ্রকগুলি), না হয় সংঘাত মারফৎ নিউট্রন তাদের অস্থায়ী করে দেয়। এবং বিটা বিকিরণ ঘটনাটি কেন্দ্রকের অস্থায়িত্ব থেকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অবস্থায় যাওয়ার নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি হেলানো দেয়ালকে বাইরে থেকে খুঁটি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব। পারমাণবিক কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে সব কিছুই ভিতর থেকে এবং আরো ভালভাবে করা হয়। আগেই আমরা তুলনামূলক ভাবে প্রোটনকে কেন্দ্রকীয় ইমারতের ইঁট এবং যে সিমেন্টের সাহায্যে ইঁটগুলি একত্র বেঁধে রাখা হয়, নিউট্রনকে সেই সিমেন্ট নামে আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু যদি ইমারতটি সুদৃঢ় না হয়, অথবা যদি তার ওপর বাইরে থেকে নিউট্রন জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে ধাক্কা দেওয়া হয়, তবে আমরা কি করবো?

কেন্দ্রকীয় ইমারতের ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতি কিছু সিমেন্ট

ইঁটে (যদি সিমেন্টের আধিক্য ঘটে) অথবা কিছু ইঁটকে সিমেন্টে (বিপরীত ক্ষেত্রে) রূপান্তরিত করে।

কেন্দ্রক তার 'বাড়তি' অথবা 'ঘাটতি' আধান পরিত্যাগ করে এই রূপান্তর সাধন করে। 'নিউট্রন সিমেন্টে' রূপান্তরিত হওয়ার সময় 'প্রোটন ইঁট' তার আধান পরিত্যাগ ক'রে পজিট্রন (ইলেকট্রনের ধনাত্মক আধান-সম্পন্ন প্রতিবিম্ব) রূপে সেই আধান বিকিরণ করে। আর যখন নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়, তখন তা একটি ইলেকট্রন বিকিরণ ক'রে কেন্দ্রকের মোট-আধান বাড়িয়ে দেয়।

এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াগুলি কত তাড়াতাড়ি ঘটে ? নিশ্চয় ১২ মিনিটে নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, কেন্দ্রকে অবস্থিত নিউট্রনের পরিবেশ ও তার স্বাধীন জ্ঞাতি ভাইয়ের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মাঝে মাঝে কেন্দ্রকের মধ্যে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে, তার পক্ষে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগ কম সময়ের জন্যেও অস্থায়ী অবস্থায় বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়।

কোন কোন সময় এই ধরণের পরিবেশ নিউট্রন অথবা প্রোটনের ভাঙ্গনকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে দেয়। এই রকম অবস্থায় বিটা ভাঙ্গন সুরু হওয়ার আগে কেন্দ্রক বহুদিন যাবৎ বেঁচে থাকে—গড়পড়তায় তার আয়ুর পরিমাণ শত শত বা হাজার হাজার বছর হতে পারে। সাধারণ-ভাবে, এই ঘটনা খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ বিধিসম্মত কেন্দ্রকীয় কাঠামোগুলি যেমন বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, তেমনি কেন্দ্রকীয় কণিকা-গুলির বাসোপযোগী পরিবেশও বিভিন্ন ধরণের হতে পারে।

বিটা-তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকের পরমায়ু কত হবে, কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা আজও তা নিখুঁতভাবে গণনা করতে অক্ষম। তার কারণ শুধু এই নয় যে, কেন্দ্রকীয় গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা (অর্থাৎ, চূড়ান্ত ভাবে দেখলে বলতে হয় যে, কেন্দ্রকীয় বলগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান) খুবই অস্বচ্ছ। আসল কথা হল, স্বাধীন নিউট্রনের ভাঙ্গন পদ্ধতিকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা আজও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

এই ভাঙ্গনের পেছনে যে আশ্চর্যজনক বলগুলি কাজ করে, তাদের আবিষ্কার পদার্থবিদ্যায় বহু ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। পরের অধ্যায়ে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বিটা ভাঙ্গনের কয়েকটি বৈচিত্র্যের কথায় ফিরে আসা যাক। একটি হল, কেন্দ্রক সব সময় কেবল ইলেকট্রনই নিক্ষেপ করে না।

মাঝে মাঝে ইলেকট্রনের প্রতিবিম্বগুলিকেও কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। ইলেকট্রনের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কেবল একটি বিষয়ে— বৈদ্যুতিক আধানের দিক থেকে। তারা হল ধনাত্মক আধানবাহী। এই ধরণের বিটা ভাঙ্গনকে ব্যাখ্যা করা আরো দুরূহ। (এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে, সাধারণ ইলেকট্রন-প্রক্ষেপ ভাঙ্গনের তুলনায় এই ধরণের ভাঙ্গন কমই ঘটে)। নিউট্রন ধনাত্মক ইলেকট্রন নিক্ষেপ করতে পারে না। এই কাজ প্রোটন করতে পারে এবং তা করবার পরে প্রোটনটি নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তবে বিটা ভাঙ্গনের ব্যাপারে প্রোটন একেবারে স্থায়ী— অর্থাৎ এই বিষয় তার ধর্ম নিউট্রনের ধর্মের বিপরীত।

আমরা তাহলে পুনরায় সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম: কেন্দ্রক থেকে সেই সকল কণিকা কি করে বেরিয়ে আসে, যারা আদৌ সেখানে ছিল না? মনে হয়, পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো। আমরা বুঝতে পারি ইলেকট্রন কোথা থেকে আসে—তারা আসে কেন্দ্রকীয় নিউট্রন থেকে। কিন্তু ধনাত্মক ইলেকট্রন— যাদের বলা হয় পজিট্রন— কোথা থেকে আসে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে, তবে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে পরের অধ্যায়ে। আমাদের আরো একটু ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তবে কোন কোন পাঠকের সুবিধা হতে পারে ভেবে এখানে এইটুকুই শুধু বলা যেতে পারে যে, নাটকের শেষাঙ্ক সত্যই জমজমাট হয়ে উঠবে, কেবল আমাদের একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

পাঠকের আগ্রহ মিটবার জন্য একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক, কি ভাবে কেন্দ্রক পারমাণবিক মেঘ থেকে ইলেকট্রন আহরণ ক'রে তা আত্মসাৎ করে। এই জিঘাংসাবৃত্তিকে পদার্থবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'ইলেকট্রন গ্রাস'।

কিন্তু এই ঘটনা কি করে সম্ভব হয়? এই বইয়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, বোর-এর আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম সূত্রগুলি পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয় যে, 'আত্মহত্যা' পরমাণুর পক্ষে সম্ভব। বিকিরণের মাধ্যমে ইলেকট্রন যেন শক্তি ক্ষয় না করে অথবা কেন্দ্রকের মধ্যে পড়ে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে কক্ষপথের অবতারণা করা হয়েছিল।

হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রকীয় আধানের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় এবং সেই পরমাণুতে অল্প সংখ্যক ইলেকট্রন থাকায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। যে অংশে কেন্দ্রক থাকে, সেইখানে ইলেকট্রনের সম্ভাবনা মেঘ পৌঁছতে পারে না। কিন্তু ভারী কেন্দ্রকে যে সব ইলেকট্রন অন্তঃস্থলের গভীরে থাকে (অর্থাৎ কেন্দ্রকের নিকটতম খোলকে যাদের অবস্থিতি), তাদের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বাইরের দিক থেকে এই ইলেকট্রনগুলি অপর বহুসংখ্যক ইলেকট্রন দ্বারা বিকর্ষিত হয়, আবার ভিতরের দিক থেকে ভারী ধনাত্মক কেন্দ্রক কর্তৃক তারা একই ভাবে আকৃষ্ট হয়। ইলেকট্রনগুলি এই দুই বিপরীতধর্মী ক্রিয়ার প্রভাব দীর্ঘ সময়ের জন্য সহ্য করতে পারে না। ফলে ইলেকট্রন-মেঘ নিষিদ্ধ এলাকার দিকে প্রসারিত হতে থাকে এবং কেন্দ্রকের মধ্যে পারমাণবিক ইলেকট্রন-গুলির ঢুকে পড়বার একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর সম্ভাবনা যখন দেখা গেছে, তখন প্রকৃতি কোন কোন পরমাণুর ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা অবশ্যই করবে। একেই বলা হয় কেন্দ্রক কর্তৃক ইলেকট্রন-গ্রাস।

এখন প্রশ্ন হল, কেন্দ্রকের মধ্যে ইলেকট্রন ঢুকে পড়ার ফল কি হবে? উত্তরে বলব, পজিট্রন বিটা ভাঙনের অনুরূপে, কেন্দ্রকের আধান এক একক পরিমাণে কমে যাবে। কিন্তু ঘূর্ণনের কি পরিবর্তন হবে? ইলেকট্রনের কাছ থেকে কিছু বাড়তি ঘূর্ণন লাভ করা সত্ত্বেও কেন্দ্রকের ঘূর্ণন অপরিবর্তিত থেকে যাবে।

আর তাই যদি হয়, তবে আমাদের একটিই সিদ্ধান্তে আসতে হবে: যে ঘূর্ণন সঙ্গে নিয়ে ইলেকট্রন কেন্দ্রকে এসেছিল, সেই বাড়তি ঘূর্ণনকে সঙ্গে নিয়ে অপর একটি কণিকা—অর্থাৎ ইলেকট্রনের পুরাতন সহযোগী নিউট্রিনো—কেন্দ্রক থেকে নির্গত হয়। এ ক্ষেত্রে তফাৎটা এই যে, নির্গমনটা

ইলেকট্রনের সঙ্গে এক যোগে ঘটে না, কেবল তখনই দেখা দেয় যখন কোন ইলেকট্রন কেন্দ্রকের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সুতরাং পরমাণুর অন্তঃস্থলে যে 'হত্যাকাণ্ড' ঘটে গেল তার একমাত্র সাক্ষী হল একটি নিউট্রিনো, সেই মায়াময় অশরীরী আত্মা। আমরা জানি, এই চতুর ব্যক্তিটিকে জেরার মধ্যে টেনে আনা প্রচণ্ড দুরূহ, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। অথচ হাল আমলে তাও সম্ভব হয়েছে এইভাবে: আমাদের 'সাক্ষী' অন্য একটি কেন্দ্রককে ধাক্কা দিয়ে প্রোটনকে ধনাত্মক ইলেকট্রনে এবং নিউট্রনে রূপান্তরিত করতে পারে। এই ঘটনাটি আমরা পরের অধ্যায়ে যা আলোচনা করব, তার ঠিক বিপরীত পদ্ধতিতে ঘটে। একে বলা হয় বিবর্তিত বিটা ভাঙন।

নিউট্রিনোগুলিকে নিয়ে একক ভাবে পরীক্ষা করা অসম্ভব। একমাত্র উপায় হল, বহুসংখ্যক নিউট্রিনো জোগাড় করা। কারণ তাহলে এই দল থেকে দুই-একটি নিউট্রিনো ধরা পড়তে পারে।

আর ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই পারমাণবিক চুল্লীকে শক্তিশালী নিউট্রন প্রবাহ সৃষ্টি করবার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। চুল্লীর প্রাচীরে বিলুপ্ত হয়ে এই নিউট্রনগুলি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে। ভাঙন ধরা কেন্দ্রকগুলির ধ্বংসাবশেষের হিসাবে যে উত্তেজিত কেন্দ্রকগুলি থেকে যায়, তারাও এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে।

একেই বলা হয় বিটা তেজস্ক্রিয়তা। পারমাণবিক চুল্লী প্রতি মিনিটে প্রচুর সংখ্যক নিউট্রিনো সৃষ্টি করে, যারা অনায়াসে চুল্লীর সেই বর্ম ভেদ করে চলে যায়, যে বর্ম দিয়ে নিউট্রন ও গামা রশ্মিকে ঢেকে রাখা হয়।

চুল্লীর কাছেই রাখা ছিল একটি স্ফুলিঙ্গ গণক। এই যন্ত্রটিকে এমন এক ধরণের তরল (টলুইন) দিয়ে ভর্তি করা হয়, যার মধ্যে হাইড্রোজেন কেন্দ্রক প্রচুর সংখ্যায় থাকে। গামা ফোটনের আবির্ভাবে যন্ত্রটির দেওয়াল ঝিকমিক করে ওঠে। নিউট্রিনো গ্রাসের ফলে যে পজিট্রনের উৎপত্তি হয়, তারা অচিরেই ঐ তরল পরমাণুর ইলেকট্রনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেখানে এই সংযোগ ঘটে, সেইখানেই শক্তিশালী গামা ফোটনের সৃষ্টি হয় (এই আকর্ষণীয় ঘটনার বিশদ বিবরণ পরের অধ্যায়ে পাওয়া যাবে)। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখনই স্ফুলিঙ্গ গণক যন্ত্র ঝিকমিক ক'রে ওঠে।

নিউট্রন গ্রাসের পথ প্রশস্ত করবার জন্যেই এ জলের মধ্যে আনুপাতিক-ভাবে বিশুদ্ধ ক্যাডমিয়াম মিশিয়ে দেওয়া হয়, কারণ এই মৌলের কেন্দ্রক লোভীর মত অত্যন্ত আগ্রহসহকারে মুক্ত নিউট্রনগুলিকে আত্মসাৎ করে। এখানেও নিউট্রন গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গামা ফোটোনের বিকিরণ হয় এবং তার স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়।

কাজেই এক সেকেণ্ডের লক্ষগুণ কম সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই দুই স্ফুলিঙ্গায়ন থেকে আশান্বিত ঘটনার সমাধান কোন্ পথে, তার নির্দেশ পাওয়া যায়।

আর এই দুই ক্ষণিক উজ্জ্বল দীপ্তির (যাদের সংখ্যা এত অল্প যে, দীর্ঘ সময় ধরে চুল্লী কর্মরত থাকলেও মাত্র কয়েকবার এই রকম ঘটনা ঘটে) বাস্তব স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। এর একটাই কারণ হতে পারে। তা হল, নিউট্রিনো ও প্রোটনের সংঘর্ষ, যা পজিট্রন ও নিউট্রন সৃষ্টি করে। এইভাবে পাওলীর প্রকল্প রচিত হওয়ার পঁচিশ বছর পরে পারমাণবিক জগতের আর একটি কণিকাকে চিনতে পারা গেল, যে কণিকার জন্ম হয়েছিল 'পেন্সিলের আগায়', অর্থাৎ গাণিতিক গবেষণার ফলে। পরবর্তী যুগের অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে, এই নিউট্রিনো পারমাণবিক জগতের এক বিস্ময়কর কণিকা। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে পরে গল্প করা হবে।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সহযোগে কেন্দ্রকীয় জগতে আমাদের পরিক্রমণ এইখানেই শেষ হল। অবশ্য এখনও অনেক খানা খন্দ, অলি গলি থেকে গেল। হয়তো এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির কোন অন্ত নেই।

বস্তুর মৌল কণিকাগুলির যে আরো অন্ধকার, অজ্ঞাত জগৎ রয়েছে, আমরা এখন সেই দিকে পদার্পণ করব। এই জগতেই সব চেয়ে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, কণিকার মধ্যে তরঙ্গের অথবা তরঙ্গের মধ্যে কণিকার ধর্ম সংক্রান্ত সূত্রগুলির যথাযথ রূপায়ণ।

। ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরমাণু কেন্দ্রক থেকে মৌল কণা

॥ একটি নতুন জগতের আবিষ্কার ॥

মনে হতে পারে, পারমাণবিক কেন্দ্রকের চেয়ে আরো কঠিন ও স্থায়ী আর কীই বা হতে পারে? উচ্চ চাপ, চূড়ান্ত তাপমাত্রা, বিপুল বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র, কোন কিছুই একে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। কেন্দ্রকের সংগঠনগুলি প্রকৃতির সব থেকে শক্ত ইমারৎ—পদার্থবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এইরকম।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে সেই ধারণা তারপর বেশ অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দেখা গেছে, অধিকাংশ ভারী কেন্দ্রকই অত্যন্ত অস্থায়ী। হাল্কা ও মাঝারি কেন্দ্রকদের মধ্যেও বেশ কয়েকটির সংগঠন দুর্বল। ক্রমশ এটা বোঝা গেল যে, কেন্দ্রকের উপাদানগুলি দিয়ে প্রকৃতি যখন কেন্দ্রককে গড়ে তোলে, তখন তার মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনের অনুপাতে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটলে তা থেকে স্থায়িত্বহীনতার সৃষ্টি হতে পারে।

কেন্দ্রকের মধ্যে যে সব কণার অস্তিত্ব নেই, কেন্দ্রক থেকে (ভাঙনের সময়) তাদের নির্গত হতে দেখে বিজ্ঞানকে এটাও ধরে নিতে হল যে, কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে এবং প্রোটন রূপান্তরিত হতে পারে নিউট্রনে। এই সূত্র ধরে নিউট্রিনোর ধারণার জন্ম।

কেন্দ্রকের স্থায়িত্বেরই কারণ, মনে হয়েছিল, পাই-মেসন নামে নতুন একটি কণা। এই কণাটির অনুসন্ধান করতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা মিউ-মেসনকে আবিষ্কার করলেন।

ক্রমশ বিজ্ঞানীদের চৈতন্য হল যে, পরমাণু ও তার কেন্দ্রকের মৌল উপাদানগুলির জগৎকে যেমন একেবারে অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী বলে ধারণা

করা গেছল, এই জগৎটি ঠিক সেরকম নয়। পরমাণুর গভীরে ও পরমাণু-কেন্দ্রকের আরো গহন গভীরে অনুসন্ধানকারীরা এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হলেন, যা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর থেকেও অনেক বেশি বিস্ময়কর।

এই নতুন অবস্থাতেও কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তার যোগ্যতা প্রমাণ করল। এর ভবিষ্যদ্বাণী করার আশ্চর্য ক্ষমতাকে মৌল কণার নতুন জগতেও ফলবতী হতে দেখা গেল। প্রত্যেকটি নতুন ভবিষ্যদ্বাণী যখন পরীক্ষার দ্বারা উৎকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হল, অবিশ্বাসীরা তখন একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। এটা আরো উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতে প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী এক-একটি ঘটনা।

সাধারণ জ্ঞানই বটে! বিজ্ঞানীরা যদি কেবল প্রাত্যহিক সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হতেন, বিজ্ঞান তাহলে এখনও শামুকের মত মন্থর গতিতে চলতে থাকত।

সব থেকে অসাধারণ আবিষ্কারগুলি সচরাচর তখনই ঘটে, সাধারণ জ্ঞান যখন একেবারে বিপর্যস্ত। অনেক ঘটনারই তাৎপর্য বহির্ভাগে থাকে না, থাকে গভীরে। যা সাধারণ ও সুস্পষ্ট, তা প্রায়ই ভ্রান্তিজনক। ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্রের অদ্ভুত জগতে বিজ্ঞান যখন প্রবেশ করে, তখন এই 'প্রায়ই' শব্দটির স্থলে বসাতে হয় 'সর্বদাই'।

চলুন, ১৯২৮ সালে আমরা ফিরে যাই। নতুন জগৎ তখন সবে খুলে যাচ্ছে। প্রোটন ও ইলেকট্রন, এই দু'টি কণার বিষয় আমরা জেনেছি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বয়স মাত্র তিন বছর। এটা ঠিক যে, অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সে তখন একটির পর একটি প্রহেলিকার সমাধান করে চলেছে। হাইড্রোজেন পরমাণু ও হাইড্রোজেন অণুর গঠন আমরা অবশেষে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি। তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক থেকে আল্‌ফা কণা কেমন করে নিঃসারিত হয়, সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়া ('টানেল এফেক্ট') আমাদের তা বুঝতে সাহায্য করেছে। তবে আমরা কেন্দ্রকস্থিত বা অন্যান্য কণার সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানি না।

তারপর পল ডিরাক নামে একজন তরুণ ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন (এঁরা সবাই সত্যি কত অল্পবয়স্ক : শ্রোয়েডিংগার ৩৮, হাইজেনবার্গ ২৮

ও ডিরাক ২৫); তিনি বললেন যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাফল্যগুলি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কারণ বস্তুর কেবল অপেক্ষাকৃত ধীর গতির বর্ণনা ছিল যে সনাতনী পদার্থবিদ্যায়, তাই থেকেই এই তত্ত্বের উদ্ভব।

কিন্তু ইলেকট্রন যখন প্রতি সেকেণ্ডে কেন্দ্রকের চতুর্দিকে কোটি কোটি বার আবর্তন করছে, তখন পুরনো বোর তত্ত্বেই কি ইলেকট্রনের গতিকে ধীর মনে করা যেতে পারে? হাল্কা কেন্দ্রকে ইলেকট্রনের বেগ সেকেণ্ডে হাজার হাজার কিলোমিটারের মত, ভারী কেন্দ্রকে ঐ বেগ লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার।

গতি তাহলে নিশ্চয় ধীর নয়। অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে এই যে, পারমাণবিক কণার এ সব দ্রুত গতির ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে আমাদের প্রসারিত করতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

প্রায় বিশ বছর আগে এমন একটি তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছিল, যাতে সাধারণ বস্তুর দ্রুতগতির বিষয় নিখুঁতভাবে আলোচনা করা হয়। ঐ তত্ত্বের নাম ছিল আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব। তত্ত্বটির জন্মদাতা হলেন অ্যাল্‌বার্ট আইন্‌স্টাইন।

ডিরাকের সিদ্ধান্ত হল, ক্ষুদ্র কণার দ্রুত গতির ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে প্রসারিত করার উপায়—আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সঙ্গে ঐ বলবিদ্যার সংযোগ সাধন।

॥ অদৃশ্য বিভাজক রেখা ॥

এই পুস্তিকায় আমরা অবশ্যই আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশদ বিবরণ দিতে পারি না। তার জন্য এর নিজস্ব একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যা জড়িত, আমরা শুধু তাইতে মনোনিবেশ করব।

প্রথমত, কাকে বলা হবে দ্রুত গতি ও কাকে ধীর গতি, সেটা স্থির করা যাক। সাধারণ জীবনে এটা মোটামুটি পরিষ্কার: শামুকের গতি হল ধীর, আর জেট বিমানের গতি হল দ্রুত।

ভাবতাত্ত্বিক শোনাচ্ছে? তা বটে। কিন্তু মানুষের গতি—যে ভাবে সে হাঁটে বা দৌড়য়—তাই তো ছিল ধীরতা ও দ্রুততার মাপকাঠি।

কিন্তু দূরে দ্রুতগামী রেলগাড়ির দিকে চেয়ে দেখুন কত আস্তে আস্তে সে চলছে। অথবা দূর আকাশে জেট বিমানের দিকে তাকান, আবার সেই ধীর গতি। কৃত্রিম উপগ্রহকে পর্যন্ত দ্রুতগামী বলে মনে হয় না। দ্রুত ও ধীর, এগুলি হল আপেক্ষিক ধারণা—প্রকৃতপক্ষে খুব বেশি রকমই আপেক্ষিক।

এইরকম ধারণায় পদার্থবিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা চাইছিলেন, বেগের এমন কোন ধরণের ধ্রুব পরিমাপক, যা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, সুতরাং অন্যান্য সকল গতিবেগের মূল্যায়নে ব্যবহারযোগ্য। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য গতির কোন না কোন ধরণের নির্দিষ্ট পরিমাপের প্রয়োজন তাঁদের ছিল, যাতে গতির অন্যান্য বেগের মূল্যায়নেও সেই পরিমাপকে ব্যবহার করতে পারা যায়।

সম্ভবত পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের গতিকে গ্রহণ করা চলে? সাধারণভাবে বলতে গেলে, মন্দ হয় না তাহলে। কিন্তু মানুষ দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাকাশের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে; সেজন্য পৃথিবী, সূর্য বা প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ জ্যোতিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, এমন কোন পরিমাপক আবিষ্কার করা শ্রেয়—বিশ্বের সব বস্তুতেই তাকে প্রয়োগ করা চলবে, বিশ্বজনীন হবে সেই পরিমাপ।

প্রকৃতির অনুগ্রহে যা পাওয়া গেল, তা হল শূন্যতার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ প্রবাহের গতি, শূন্যদেশে আলোককণার গতি। এই গতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার, পরিচিত সব গতির মধ্যে এ হচ্ছে দ্রুততম।

এর থেকে দ্রুততর আর কিছু নেই, আলোর তুলনায় সমস্ত গতিই অপেক্ষাকৃত মন্থর। যে সব গতি আলোর গতির সমীপবর্তী, পদার্থবিজ্ঞানীরা তাদের জন্য 'দ্রুত' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই বিভাগ খানিকটা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী; প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রচলিত রীতি, কিন্তু এর মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে।

বস্তুর গতি যখন আলোর গতির সমীপবর্তী হতে থাকে, তার ধর্মগুলি মূলগত ও আশাতীতভাবে পরিবর্তিত হতে সুরু হয়, বিশেষ করে বস্তুটি যদি অনেকগুলি কণার সংযোগে গঠিত হয়ে থাকে। এই ধরণের পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করা এখানে সহজসাধ্য।

কোন বস্তুর গতি যখন আলোর গতির নিকটবর্তী হয়, তখন একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন হল তার ভরের বৃদ্ধি। বস্তুটির গতি আলোর গতির যত অধিক নিকটবর্তী হয়, ততই তার ভরের বেশি বেশি বৃদ্ধি ঘটে। যে ঘটনায় বাইরে থেকে এটা বোঝা যায়, তা হল, বস্তুটির গতি বাড়াচ্ছে যে বল, সেই বলকে বস্তুটি প্রতিরোধ করতে সুরু করে। ফলে বস্তুটির গতি বাড়ানোর জন্য ক্রমশই বৃহত্তর বল প্রয়োগ করতে হয়।

কিন্তু এমন কোন বৃহৎ বল নেই, যাতে তাকে আলোর সমান গতিসম্পন্ন করতে পারে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে কোন জড় বস্তুকেই ঐরকম গতিসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। জড় বস্তু বলতে আমরা বুঝি, এমন যে কোন বস্তু (বা কণার সমষ্টি) যা স্থির থাকতে পারে। আমরা পরে দেখব যে, ফোটন স্থির থাকতে পারে না; আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সেজন্য ফোটনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অঙ্কের ভাষায় এই ধারণাকে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ সূত্রটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়:

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

এখানে, v-গতিসম্পন্ন বস্তুটির ভর হচ্ছে $m(v)$; বস্তুটি যখন গতিহীন, তখন তার তথাকথিত স্থিতি ভর m_0; আর c আলোর গতিবেগ।

এই সম্পর্ক থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, v যখন c-এর নিকটবর্তী হয়, সূত্রটির নিম্নাংশ প্রথমে ধীরে ও তারপর ক্রমশ দ্রুততরভাবে হ্রাস পেতে থাকে। সেই অনুযায়ী আবার $m(v)$ বৃদ্ধি পায়, কারণ m_0 হচ্ছে বেগ নিরপেক্ষ একটি ধ্রুবক সংখ্যা। পরিশেষে v যখন c-এর সমান হয়, বস্তুটির ভর হয়ে ওঠে অপরিমেয়-বৃহৎ। অন্যভাবে বলতে গেলে, বস্তুটিকে হতে হয় অপরিমেয়-বৃহৎ ভর সম্পন্ন।

এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এমন একটা কাণ্ড করতে পারে কেবল অপরিমেয় বৃহৎ কোন বল। কিন্তু প্রকৃতিতে সেরকম অসীম ভর বা অসীম বলের অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মাণ্ড নিজে অসীম বটে, কিন্তু তার মধ্যে অন্য এমন কিছু নেই, যা সীমাহীন।

আমরা আগে বলেছি, এই সূত্র ফোটনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমরা

দাঁড়াতে পারে; এর থেকে কিছু পাওয়া যায় না। ফোটন স্থির থাকতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়: ফোটনের স্থিতিভর হল শূন্য। আমাদের সূত্রে m_0-এর এই মান বসিয়ে দিলে দেখি যে, ফোটনের ক্ষেত্রে গতি হয় c-এর সমান আর ভর $m(c)$ হয় $\frac{0}{0}$। অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী এই ভর অনির্দেশ্য অর্থাৎ এর যে কোন মান হওয়াই সম্ভব।

আমরা পরে দেখব, ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে থাকে: ফোটনের ভর বড় বা ছোট, সবরকমই হতে পারে। কিন্তু যখন $v = c$, তখনই কেবল এর অস্তিত্ব। এ সবের অর্থ হল, ফোটনের পক্ষে শুধু আলোর বেগেই চলা সম্ভব।

এটাই হল আপনাদের আলোর গতি! কোন জড় পদার্থের এ গতি থাকতে পারে না; আবার ফোটনের পক্ষে অন্য কোন গতি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং আলোর গতি হচ্ছে জড় পদার্থ ও ফোটনের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য বাধা।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বে ভরের যে বৃদ্ধির কথা বলা হয়, সাধারণ জীবনে আমরা তা দেখি না কেন? সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটার যে রকেটের গতি, তার পলায়নী বেগ পরীক্ষা করা যাক। পৃথিবীতে তার যে স্থিতিভর, তাই থেকে তার ভরের বৃদ্ধি আমরা হিসাব করব। পৃথিবীতে যদি এর ওজন হয় ১০০ কিলোগ্রাম, প্রতি সেকেণ্ডে ১১ কিঃ মিঃ গতির দরুন এর ভর বেড়ে যাবে ০.৩৫ মিলিগ্রাম।

কিন্তু ঐ বেগকে যদি আমরা প্রতি সেকেণ্ডে ২,৫০,০০০ কিঃ মিঃ করতে পারি, ভর তাহলে স্থিতিভরের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি বেড়ে যাবে। কণা-ত্বরক (particle accelerators) নামক বিশেষ যন্ত্রে যে আধানযুক্ত পারমাণবিক কণাগুলি ত্বরান্বিত হয়ে উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়, তাদের ক্ষেত্রে ঐ রকম ঘটনা ঘটে। এই ধরণের যন্ত্রাদি নির্মাণ করার সময় নক্সাকারীদের ঐ ঘটনা স্মরণ রাখতে হয়।

॥ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ ॥

বস্তুর গতির যে পরিবর্তনের ফলে ঐ গতি আলোর গতির সমীপবর্তী হয়, তৎসম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনাও আমাদের জানার আছে। ভরের পরিবর্তন হয়, এবং সময়ের নিজস্ব ধারা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যায়। পদার্থবিজ্ঞানীদের ভাষায় ঐটি হল বস্তুটির প্রকৃত সময়। আমাদের দেহগুলির যেন নিজ নিজ ঘড়ি আছে। দেহের অত্যাবশ্যক ক্রিয়াকলাপের ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই ঘড়িগুলি টিক্ টিক্ করতে থাকে।

অপরপক্ষে, 'সাধারণ সময়'—সাধারণ ঘড়ির যে সময়, সেই সময় অনুযায়ী আমরা সকালে উঠি, কাজ করতে যাই ও রাত্রিতে শুয়ে পড়ি। দিন ও রাত্রির যে পরিবর্তন, নিজের অক্ষে পৃথিবীর যে আবর্তন, তার উপর নির্ভরশীল এই সময়।

'কী তাড়াতাড়ি সময় কাটছে' বা 'কী আস্তে আস্তে সময় চলেছে'—এখানে আমরা আমাদের নিজস্ব সময়ের কথা বলি, আমাদের দৈহিক ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আমাদের ব্যক্তিগত সময়ের কথা। তবু এর মধ্যে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দিক আছে—ছন্দ যত দ্রুততর হয় সময়ও তত দ্রুততর হয়।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বে এর সঙ্গে একটি অত্যন্ত পরিষ্কার সাদৃশ্য আছে। এই তত্ত্ব বলে যে, বস্তু যত দ্রুতবেগে চলে, তার প্রকৃত বা নিজ সময়ের গতি তত ধীর হয়, এবং সেজন্য বস্তুটির নিকট 'সাধারণ' সময় দ্রুততর গতিসম্পন্ন হয়ে দেখা দেয়।

দূরপাল্লার মহাকাশ অভিযানে আগ্রহের ফলে ঘড়ির এই আপাত অসম্ভব কাণ্ডের কথা আজ সুপরিচিত। বিজ্ঞানের গল্পে প্রায় আলোর সমান বেগসম্পন্ন ফোটন রকেটে অধিষ্ঠিত হয়ে মহাকাশযাত্রীরা মহাকাশ ভ্রমণের কয়েক বছর, ধরা যাক ১০ বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখে যে, তাদের বন্ধুরা সব অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তারা তখন বলে, 'কি তাড়াতাড়ি বছরগুলো কেটে গেছে!' তারা ঠিকই বলে, কারণ পৃথিবীর থেকে মহাকাশযানে প্রকৃত সময়ের গতি অপেক্ষাকৃত ধীর।

সময়ের সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি, অঙ্কের সাহায্যে তাকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা চলে :

$$t(v) = t_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

এখানে, $t\ (v)$ হচ্ছে মহাকাশযাত্রীর ঘড়ির প্রকৃত সময় ও t_0 পার্থিব কোন ঘড়ির দ্বারা নির্ণীত সময়। অন্যান্য অক্ষরগুলির সচরাচর যা অর্থ হয়, এই সূত্রটিতেও সেই অর্থ। সূত্রটি থেকে বোঝা যায় যে, আলোর সমান গতি-সম্পন্ন ফোটনের ক্ষেত্রে সময়ের আদৌ কোন গতি নেই। কোন একটি ফোটনের উপর যদি আমরা একটি ঘড়ি বসিয়ে দিতে পারতাম, সময় স্থির হয়ে থাকত—ঘড়িটি চলতই না।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বে আপাত অসম্ভব অন্যান্য কাণ্ডের কথাও বলা হয়, তবে আমরা এখানে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব না। অন্য একটি সূত্র আছে, পরে সেটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। সেটি হল বিখ্যাত আইনস্টাইন সূত্র :

$$E_0 = m_0c^2$$

এখানে, m_0-স্থিতিভর সম্পন্ন নিশ্চল বস্তুর শক্তি হচ্ছে E_0। গতীয় বা স্থৈতিক শক্তি থেকে একে পৃথক করার জন্য আমরা একে বলি বস্তুটির স্থিতি শক্তি বা প্রকৃত শক্তি।

এটা দেখা যাবে যে, ঐ শক্তি বস্তুটির গতি বা অবস্থান, কোনটার উপরই নির্ভরশীল নয়। সনাতনী পদার্থবিদ্যায় কেবল দু' ধরণের শক্তির কথা জানা আছে। এই নতুনটির সেখানে কোন স্থান নেই। এটি এমন একটা কিছু, যা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; একটু পরে আমরা এর বিষয় আলোচনা করব। এখানকার মত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কীভাবে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় তার প্রয়োগ হয়েছিল, সে কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

॥ প্রাথমিক সমস্যাসমূহ ॥

বিংশ শতাব্দীর সবথেকে বড় দুটি তত্ত্বের সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় ডিরাককে আমরা নিরত দেখেছি। এই সমন্বয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগৎ থেকে আগত অভিনব তথ্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাকে শক্তিশালী করে তুলবে।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে শ্রোডিঙ্গারের সূত্র হল প্রকৃতির সব রকম সিন্দুকের চাবিকাঠি। কিন্তু কয়েকটি ঘটনাকে এ ব্যাখ্যা করতে পারে নি বলে একে উন্নত করবার উপায় অনুসন্ধান করা হচ্ছিল।

শীঘ্রই বোঝা গেল, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সঙ্গে এই সূত্রের সমন্বয় সহজসাধ্য নয়। ডিরাক প্রথমে ভেবেছিলেন যে, আপেক্ষিকতাগতভাবে অপরিবর্তনীয় সমাধান পাওয়া যাবে পরিবর্তিত সূত্রটি থেকে। (পরে দেখা গেল, তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল না। কিন্তু কে জানে, এই 'মনোরম' ভুলটি যদি না ঘটত, ডিরাক হয়তো একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের পাশ দিয়ে চলে যেতেন!)

আপেক্ষিকতাগতভাবে অপরিবর্তনীয়—ভয়াবহ কথা এগুলি। প্রকৃতপক্ষে, পদার্থবিদ্যার সব তত্ত্বের পক্ষেই একটি ভীতিজনক বাক্য। এই তকমা আঁটা কোন তত্ত্বকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে, তত্ত্বটি কোন কাজেরই নয়।

ব্যাপারটির সারমর্ম হল এই—নৌকায় চড়ে আপনি কি কখনো বল খেলার চেষ্টা করেছেন? বিমানে চড়ে আপনি বল খেলছেন, এটা কল্পনা করার চেষ্টা করুন। মাটিতে খেলার থেকে তাতে কি কোন তফাৎ আছে? ঠিকই বলেছেন, কোন তফাৎ নেই। ঠিক বটে, তবে একটি সর্তে: নৌকা বা বিমানকে একই বেগে সমান গতিতে চলতে হবে।

বেগ যাই হোক, সমান গতির সঙ্গে স্থিতির পার্থক্য ধরার কোন উপায় নেই। দিন ও রাত্রির পরিবর্তন না হলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির আমরা ধারণা করতে পারব না। ঋতুর পরিবর্তন না হলে পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণের কথা আমরা জানতে পারব না। সঠিকভাবে বলতে গেলে, শেষের দু'টি উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নয়, কারণ আবর্তন সবসময়ই ত্বরান্বিত গতি। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এই ত্বরণ এত অকিঞ্চিৎকর যে, আমরা উভয়কেই সম-গতি বলে মনে করতে পারি।

প্রায় আলোর সমান গতিসম্পন্ন মহাকাশযানে বস্তুর যে সব গতি, তাদের সঙ্গে পৃথিবীর বুকে ঐ সব গতির পার্থক্য হওয়ার কথা নয় (যদি অবশ্য মাধ্যাকর্ষণ একই থাকে, অর্থাৎ মহাকাশযানে যদি কোন উপায়ে কৃত্রিমভাবে মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করা যায়)। পৃথিবীতে বা মহাকাশযানে, যেখানেই হোক,

স্থান ও কালে বস্তুর অবস্থানকে নির্ণয় করার যে নির্দেশক কাঠামো, তার বেগের উপর বস্তুর গতি নির্ভর করে না ; সেইজন্য বস্তুর গতির নিয়মগুলিও নির্দেশক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল নয়।

সব নির্দেশক কাঠামোর পারস্পরিক গতি যদি সমানই থাকে, তাহলে তাদের বেগ যাই হোক, ঐ সব কাঠামোর গতির নিয়মের সূত্রগুলি একই থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সূত্রগুলি বিভিন্ন বেগের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় থাকে।

পদার্থবিদ্যার ভাষায় 'পরিপ্রেক্ষিতে অপরিবর্তনীয়' এই কথাগুলি হয়ে দাঁড়ায় 'আপেক্ষিকতাগতভাবে অপরিবর্তনীয়'। এদের ভয়াবহ অর্থ হল : কোন সূত্র অনুযায়ী প্রায় আলোর সমান গতিসম্পন্ন মহাকাশযানে কোন একটি বস্তুর গতিপথ যদি পরাবৃত্তের আকার নেয়, আর পৃথিবীতে ঐ গতিপথ যদি হয় একটি অধিবৃত্ত, তাহলে সূত্রটি ত্রুটিপূর্ণ ও পরিত্যাজ্য।

শ্রোয়েডিংগার সূত্রকে পরিবর্তন করার যখন চেষ্টা করা হল, তখন ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছিল।

॥ একটি আকস্মিক আবিষ্কার ॥

সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডিরাক একটি অসাধারণ প্রস্তাব করলেন—শ্রোয়েডিংগারের সূত্রে একটির স্থলে তিনি উপস্থিত করলেন চারটি তরঙ্গ-অপেক্ষক। ফলে যে সূত্রটি দাঁড়াল, তা মোটেই মূল সূত্রটির মত নয়। কিন্তু নতুন সূত্রটি থেকে আপেক্ষিকতাগতভাবে অপরিবর্তনীয় সূত্রের সব সমাধান পাওয়া গেল।

সূত্রটিতে তরঙ্গ-অপেক্ষকের সংখ্যা অনুসারে সমাধান হল চারটি। কিন্তু একটির স্থলে ইলেকট্রনের চারটি 'সম্ভাব্যতা' আমরা কেমন করে অনুধাবন করব ?

তিন বছর আগে যদি ইলেকট্রনের ঘূর্ণন আবিষ্কৃত না হত, তাহলে অনেক বছর হয়তো প্রথম দু'টি সমাধানের অর্থ দুর্জ্ঞেয় হয়ে থাকত।

ইলেকট্রনের গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে ইলেকট্রন ঘূর্ণনের সম্ভাব্য যে দুই ধারা, ডিরাক সূত্রের প্রথম দু'টি সমাধান থেকে তাদের জানা যায়। এই

সমাধান থেকে ঘূর্ণনের হিসাব করে দেখা গেছে যে, পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে তা খুব ভালভাবে মিলে যাচ্ছে।

এবার ঘূর্ণনের বিষয়ে আমাদের আরো সামান্য কিছু বলতে হবে। প্রথমত, ঘূর্ণন হল ইলেকট্রনের এক ধরণের গতি, ঐ গতির বেগ যখন প্রায় আলোর বেগের সমান। বস্তুতঃ, যদি 'নিজের অক্ষের চতুর্দিকে, ইলেকট্রনের আবর্তনের ফল বলে ঘূর্ণনকে আমরা মুহূর্তের জন্যও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি (আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, এরূপ একটি ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক), তাহলে দেখা যাবে, এই আবর্তনে ইলেকট্রনের বেগ আলোর গতির থেকে শতকরা এক ভাগেরও সামান্যতম ভগ্নাংশ মাত্র কম।

এটা বুঝতে পারা যায়, ঘূর্ণনের বিষয় বলার সময় আমরা যে গতির কথা ভাবছি, সাধারণ স্থানে ইলেকট্রনের সাধারণ গতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। ইলেকট্রনের ঘূর্ণন কোনভাবেই সাধারণ গতির উপর নির্ভরশীল নয়। ইলেকট্রনের গতি দ্রুত বা ধীর হোক অথবা ইলেকট্রন স্থির থাকুক, ঘূর্ণনের অস্তিত্ব বজায় থাকে। ঘূর্ণনের মান সব সময় একই।

বলা যেতে পারে, স্থিতি শক্তি যেমন কণার আভ্যন্তরীণ ধর্ম, ঘূর্ণনও ঠিক সেইরকম। ঘূর্ণনের যদি আমরা পরিবর্তন করি, কণার প্রকারভেদ ঘটে। এই বিষয় পরে আবার আমরা আলোচনা করব।

ঘূর্ণনের প্রকাশ হয় কীভাবে? পারমাণবিক বর্ণালী বর্ণনা করার সময় এ সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা হয়েছিল। বহুকাল আগে, গত শতাব্দীর শেষ-ভাগেই দেখা গেছল যে, চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে কোন বস্তুকে রাখলে তার বর্ণালী রেখাগুলি নানাসংখ্যক অস্পষ্টতর রেখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে প্রমাণিত হয়, সব মৌল পদার্থেরই পরমাণুর বর্ণালী রেখার অনুরূপ বিভাজন ঘটে।

১৯২৫ সালে উলেন্‌বেক ও গুড্‌স্মিট নামে দু'জন তরুণ বিজ্ঞানী যখন ঘূর্ণনের ধারণার সূত্রপাত করলেন, তখনই কেবল (জীম্যান এফেক্ট নামে খ্যাত) এই ঘটনার প্রকৃতি বোঝা গেল, বোঝা গেল একটি রেখা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন সংখ্যার 'অনুচর' রেখা সৃষ্টি হওয়ার কারণ।

অতঃপর যুক্তিধারা এইভাবে চলল—ইলেকট্রনের ঘূর্ণন আছে। অর্থাৎ চরম বিশ্লেষণে কৌণিক ভরবেগ আছে ইলেকট্রনের। এর উৎপত্তির ব্যাপারে এখনও আমাদের উৎসুক্য নেই; গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এর দ্বারা

ইলেকট্রনের কোন এক ধরণের গতি বোঝায়, কিন্তু ইলেকট্রনের গতি হল বিদ্যুৎপ্রবাহ একটি মাত্র কণা থেকে উদ্ভূত প্রবাহ। 'বাস্তব' বিদ্যুৎপ্রবাহের মূলে থাকে বহুসংখ্যক ইলেকট্রনের গতি।

একশো বছরেরও বেশি একথা জানা যে, বিদ্যুৎপ্রবাহের চৌম্বকধর্ম আছে। অন্যভাবে বললে, ইলেকট্রনকে একটি ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট চুম্বক হিসাবে ভাবা যেতে পারে। এই ধরণের একটি প্রাথমিক চুম্বককে চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে সেটি ঐ ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান স্থির করে নেবে। সব থেকে সহজ পরিস্থিতিতে দু'টি অবস্থান আমরা পেতে পারি : একটি চুম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে একই দিকে (চরম স্থায়ী), অন্যটি ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে (চরম অস্থায়ী)।

এখন স্থায়িত্ব কী? ক্ষেত্রের সঙ্গে একই দিকে একটি চুম্বক অবস্থান করলে ঐ ক্ষেত্রে তার স্থৈতিক শক্তি সব থেকে কম। ক্ষেত্রের বিপরীত অবস্থানে শক্তি হল সব থেকে বেশি।

এই শক্তিগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য কী? সহজেই তা হিসাব করা চলে ; এবং চুম্বকক্ষেত্রের একই বা বিপরীত দিকে ঘূর্ণনযুক্ত ইলেকট্রনের দ্বারা পরমাণু থেকে যে সব ফোটন নিঃসরিত হয়, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্যে তাকে রূপান্তরিত করা যায়।

অতঃপর দেখা যায়, ইলেকট্রনের দু'টি বিপরীত অবস্থান অনুযায়ী হিসাব করলে দ্বিগুণিত বর্ণালী রেখাগুলি যতবার বিভক্ত হওয়ার কথা, ঠিক ততবারই তারা বিভক্ত হয়।

যে সব স্থূল রেখা তিন, চার ও অধিক সংখ্যক অনুচর রেখায় বিভক্ত হয়ে যায়—পরের প্রশ্ন হচ্ছে তাদের সম্পর্কে। ঘূর্ণনের দু'টি অবস্থান থেকে শুধু একজোড়া অনুচর পাওয়া যায়। তাদের সংখ্যা আর বেশি হতে পারে না, কেননা ইলেকট্রন চুম্বকরা সোজা সব থেকে স্থায়ী অবস্থায় লাফিয়ে চলে যায়।

এখানে আমরা স্মরণ করি যে, ঘূর্ণন সম্পর্কিত গতি ইলেকট্রনের আছে, আবার সেই সঙ্গে পরমাণু কেন্দ্রকের চতুর্দিকে কক্ষপথেও সে পরিক্রমণ করছে। এই কক্ষপথে গতি প্রকৃতপক্ষে গতির মতই কিছু একটা। 'গতায়াতার পুঞ্জের' ধারণার জন্য পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতির এর থেকে ভাল চিত্রকল্প আমরা ভাবতে পারি না।

তাহলেও এ হচ্ছে গতি, এক ধরণের একাত্মক প্রবাহ ; এর প্রভাব একটি ক্ষুদ্র চুম্বকের প্রভাবের মত। বেশ জটিল হয়ে উঠছে এখন ব্যাপারটা : পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন একটি দ্বিচুম্বকের মত।

চুম্বকক্ষেত্রে এই ধরণের চুম্বকের আচরণ কেমন? যথেষ্ট বিস্ময়কর। এর অবস্থানের সংখ্যা দুই না হয়ে তিন, চার বা আরো বেশি হতে পারে। ইলেকট্রনের প্রাথমিক চুম্বক যখন একটি অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী অবস্থান থেকে বেশি স্থায়ী অবস্থানে চলে আসে, মধ্যবর্তী কয়েকটি অবস্থানে সেটি থেমে যেতে পারে। চুম্বকটির চরম অবস্থা দুটির মধ্যে যে সর্বোচ্চ শক্তি, এই সব অবস্থার শক্তি তার পূর্ণ ভগ্নাংশ। অর্থাৎ এগুলি অত্যন্ত নির্দিষ্ট শক্তি এবং এদের মধ্যে পার্থক্য হল বিশেষ পরিমাপের কোয়ান্টাম ব্যবধান। চুম্বকক্ষেত্রে পরমাণুস্থিত ইলেকট্রন-চুম্বকের নির্দিষ্ট অবস্থানগুলির যে ঘটনা, পদার্থবিজ্ঞানীরা তার নাম দিলেন 'স্থান কোয়ান্টাম-করণ' (স্পেস্ কোয়ান্টাইজেশন)।

এখন অবশিষ্ট অংশ বুঝতে পারা যায়। ইলেকট্রন-চুম্বকের যতগুলি অবস্থান সম্ভব, বর্ণালী রেখা ততগুলি অনুচর রেখায় বিভক্ত হয়। সেইরকম আবার অনুচর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলির মধ্যে পার্থক্যের হিসাব পরীক্ষার ফলের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে যায়।

ডিরাকের সূত্র থেকে একেবারে হঠাৎ যে ঘূর্ণন এসে পড়েছিল, তার সম্বন্ধে এখনকার মত এই যথেষ্ট। সূত্রটির আরো দুটি সমাধান আছে।

॥ আরও আশাতীত একটি আবিষ্কার ॥

প্রথম দুটি সমাধান যেমন ইলেকট্রন-ঘূর্ণনেরই বিপরীত অবস্থানকে বোঝায়, এই সমাধান দুটির মধ্যেও তেমনই খুব বেশিরকম সাদৃশ্য আছে।

এখানেও দুই বিপরীত ব্যাপার ঘটনা আছে : এক দিঙ্মুখিতা একটি অবস্থান ধনাত্মক মোট ইলেকট্রন শক্তিকে বোঝায়, অন্যটি বোঝায় ঋণাত্মক মোট ইলেকট্রন শক্তিকে। আপনি বলবেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই ; আমরা তো আগেই দেখেছি, ইলেকট্রন মুক্ত ভাবে বিচরণ করছে অথবা

পরমাণুর মধ্যে যেমন, অন্য কণার সঙ্গে সেইভাবে সংযুক্ত আছে, তার উপর নির্ভর করে মোট শক্তির যে কোন চিহ্ন হতে পারে।

কিন্তু ডিরাকের সূত্র তো লেখা হয়েছে কেবল মুক্ত ইলেকট্রনের জন্য।

'হ্যাঁ!' তাহলে ডিরাকের ইলেকট্রন একই সময়ে মুক্ত ও বন্ধনযুক্ত। অর্থহীন বাক্য!

ডিরাক নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, এটা অর্থহীন। সবথেকে সহজ ব্যাপার অবশ্য — যেটি আপনার দরকার নেই, সেটিকে বাতিল করা; ঘরের ক্ষেত্রফল যুক্ত-বা-বিযুক্ত 20 বর্গ মিটার পাওয়া গেলে যেমন একটিকে বাতিল করা হয়, ঠিক সেইরকম আর কি। ঋণাত্মক মান সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে অর্থহীন বলে মুক্ত ইলেকট্রনের ঋণাত্মক শক্তিকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারতাম।

যাহোক তা করার জন্য ডিরাক ব্যস্ত হননি। তিনি ইংরেজ এবং একজন ইংরেজের মতই হয়তো তাঁর যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান ছিল। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি অর্থহীনতার উৎস অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কেননা হয়তো অর্থহীনতার মধ্যেও কোন অর্থ আছে।

শেষে ডিরাক এমন একটি ধারণার কথা বললেন, যাতে মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। হয়তো 'উদ্ভট' সমাধানটি ইলেকট্রনের না হয়ে ইলেকট্রনের আধানের বিপরীত আধানযুক্ত অন্য কোন কণার। ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক, সুতরাং এই কণার ধনাত্মক আধান থাকতে হবে। যাহোক পরম মানের দিক থেকে দুটিকে হতে হবে সমান। ডিরাক ভেবেছিলেন, প্রোটনকে দিয়ে বোধহয় চলবে, কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল যে, ঋণাত্মক শক্তিযুক্ত যে কণা, তার ভর ইলেকট্রনের ভরের একেবারে সমান। প্রোটনকে দিয়ে নিশ্চয় চলবে না, কারণ এটি ইলেকট্রনের থেকে প্রায় দু' হাজার গুণ ভারী। একমাত্র সম্ভাবনা হল ইলেকট্রনের কোন দর্পণ প্রতিবিম্ব।

যাই হোক, এরূপ একটি ধনাত্মক কণার মোট শক্তি যে কেন ঋণাত্মক, এই চিত্র থেকে তা ব্যাখ্যা করা যায় না। শক্তি ঋণাত্মক হওয়ার অর্থ কণাটি অন্য কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু সূত্রটির সমাধান করলে ইলেকট্রন একেবারে মুক্ত এবং অন্যান্য কণা এতদূরে অবস্থিত যে, পরস্পরের উপর বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করা চলে। একটি সীমাহীন ও পরম শূন্যতার মধ্যে

ইলেকট্রন একা গতিশীল। তাহলে ইলেকট্রনের দর্পণ-প্রতিবিম্ব, এই দ্বিতীয় ধনাত্মক কণাকে আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি?

এখানে ডিরাকের মাথায় এল সবথেকে উদ্ভট ধারণা। যে শূন্যতার মধ্যে কেবল ইলেকট্রনটি ছাড়া আর একটিও কণা নেই, সেই শূন্যতা মোটেই শূন্য নয়। ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত, শূন্যতা ইলেকট্রন দিয়ে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। ইলেকট্রনের ধনাত্মক প্রতিবিম্ব হচ্ছে পরিপূর্ণ শূন্যতার একটি গর্ত।

পাগলামি, নিছক পাগলামি, তবুও তার মধ্যে এমন সাহসিকতা আছে যে, সব দিক রক্ষা হয়।

যেখানে কোন যন্ত্র — তা সে যতই সূক্ষ্ম হোক — একটিও কণার অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারবে না, সেই স্থানকে আমরা কি বলব? শূন্য!

এইবার সহজভাবে ব্যাপারটাকে দেখুন। ধরুন, ওখানে এমন সব কণা আছে, যন্ত্রের উপর যাদের কোন প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে না। তাহলে ঐ স্থান যদি কণা দিয়ে পরিপূর্ণও হয়, আপনি তাকে শূন্য স্থানই বলতে থাকবেন।

সত্য বটে, কিন্তু কণাগুলিকে কী করে তাদের প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থেকে বর্জিত করা যায়? সেটা কি তাদের অস্তিত্বেরই বিরোধী নয়?

কিছুক্ষণের জন্য সিদ্ধান্ত সব মুলতবী রাখা যাক। প্রথমে, আসুন একটি দুর্বল বিদ্যুৎক্ষেত্রের সাহায্যে আমরা কোন ধাতুর গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি। বিদ্যুৎপ্রবাহের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই; আমরা বলি, বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনে ধাতুটি পূর্ণ। যাহোক আমাদের পরীক্ষা যদি এই একটিতেই সীমাবদ্ধ থাকত, ধাতুর সম্বন্ধে আমাদের একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারণা হত। কেননা ওর মধ্যে পরমাণুও আছে এবং তাদের ইলেকট্রন কোন একটি যন্ত্রে, ধরুন, কোন অ্যামমিটারে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। এই ইলেকট্রনগুলি পারমাণবিক স্তরে অবস্থিত, তাদের অবস্থান একটি 'কুয়া'র মধ্যে। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে পরিমাপক যন্ত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ তাদের যথেষ্ট শক্তির অভাব।

অবশ্য আপনি বলবেন, অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে ও অন্য কোন পরীক্ষায় ধাতুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণু, এমন কি পরমাণু-কেন্দ্রককে পর্যন্ত

যারা সম্ভব। কিন্তু শূন্যতাকে কোন ধরণের যন্ত্র দিয়েই নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং শূন্যতার মধ্যে কিছু নেই, কিছু থাকতে পারে না।

সাধারণ জ্ঞানে তাই মনে হয়। ডিরাক বলেন অন্য কথা।

শূন্যতা ইলেকট্রনে পরিপূর্ণ। অসীম-বিস্তৃত একটি একীভূত শূন্যতার সৃষ্টিতে সারা বিশ্ব অংশগ্রহণ করে। শূন্যতার অপরিসীম-বৃহৎ সংখ্যক শক্তি-স্তরকে পূর্ণ করে আছে তার ভিতরকার অসীমসংখ্যক ইলেকট্রন। এর ফলে কণাসমূহের একটি একীভূত ও আন্তঃসম্পর্কিত সমষ্টি গঠিত হয়েছে। পাউলির নীতি অনুযায়ী প্রতিটি স্তরে অবস্থান করতে পারে বিপরীত ঘূর্ণনযুক্ত দুটি ইলেকট্রন, তার থেকে একটিও বেশি নয়।

সাধারণ যে 'বিশ্বজনীন কুয়া'র মধ্যে ইলেকট্রনরা অবস্থিত, সেটি প্রশস্ত ও গভীরও বটে। এর সর্বোচ্চ শক্তি-স্তরটির অবস্থান মোট শক্তির শূন্য মান থেকে নিচের দিকে m_0c^2 শক্তি-দূরত্বে। শূন্যতার ভিতরকার সব ইলেকট্রনের সেজন্য অবশ্যই ঋণাত্মক শক্তি থাকবে।

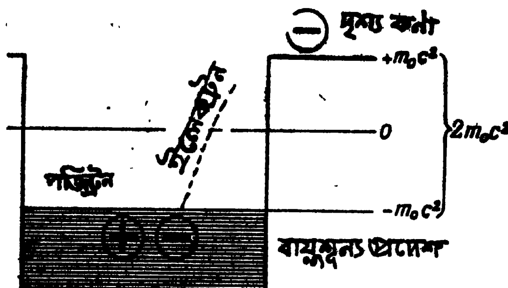
শূন্যতার এই সব ইলেকট্রন লাফ দিয়ে তাদের কুয়ার বাইরে বেরিয়ে না এলে কোন যন্ত্রই তাদের অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথমত যা করণীয়, তা হল m_0c^2-পরিমান শক্তি তাদের দিয়ে দেওয়া। তবু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, স্থির হোক বা গতিশীল হোক, প্রতিটি কণারই রয়েছে নিজস্ব শক্তি m_0c^2।

শূন্যতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে ইলেকট্রনকে কেবল m_0c^2-এর সমান উচ্চতার বাধা অতিক্রম করলেই চলবে না, তাকে তার প্রাপ্য m_0c^2-পরিমাণ স্থিতি-শক্তিও অর্জন করতে হবে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি, কোন যন্ত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে শূন্যতার ইলেকট্রনগুলিকে যে বাধা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তার মোট উচ্চতা $2m_0c^2$।

সেটা বেশ অনেকখানি শক্তি। এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, মাত্র ত্রিশ বছর হল পদার্থবিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনকে ঐ পরিমাণ শক্তি দিতে সমর্থ হয়েছেন। ডিরাক যখন তাঁর পরিপূর্ণ শূন্যতার প্রস্তাব করেন, তখন এই মানের শক্তির কথা কেবল স্বপ্নেই চিন্তা করা যেত।

কিন্তু বাস্তবে যেমন হয়, শূন্যতার মধ্যে থাকলেও কেন সেভাবে

ইলেকট্রনদের সঙ্গে যন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া হতে পারে না? এখানেও উত্তরটি মেলে পাউলির নীতি থেকে।



চিত্র নং ২২

বস্তুর প্রত্যেকটি পারস্পরিক ক্রিয়া হল তার শক্তির পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই আমরা ঐ ক্রিয়ার অস্তিত্ব নির্ণয় করি। কোন যন্ত্রের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে শূন্যতার ভিতরকার ইলেকট্রনের শক্তি পরিবর্তিত হতে পারত ও ইলেকট্রনটি চলে যেতে পারত অন্য কোন স্তরে। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে, শূন্যতার সব কটি স্তরই ইলেকট্রন দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ। সহজ কথায় বলতে গেলে, সেখানে স্থানের অভাব।

সেজন্য শূন্যতার ইলেকট্রনগুলির অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় না; শূন্যতার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বা কোন যন্ত্রের সঙ্গে তাদের কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে না। এই সব ইলেকট্রন আমাদের সঙ্গে যতক্ষণই সহবাস করুক, আমরা কখনোই কিছু সন্দেহ করব না, কেননা তাদের গতিবিধি তারা কখনোই কোনভাবে জানায় না।

॥ গর্তের (Hole) জন্ম ॥

ধরা যাক, কোন কারণে (প্রকৃত কারণটি কী, তার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক) শূন্যতার ভিতরকার একটি ইলেকট্রন লাফ দিয়ে বার হওয়ার মত যথেষ্ট শক্তি লাভ করল। এখন যেহেতু ইলেকট্রনটি মুক্ত, এর মোট শক্তি হল ধনাত্মক। শূন্যতায় মধ্যে কী ঘটে?

একটি গর্তের (বা 'হোল্'-এর) সৃষ্টি হয়। শূন্যতার যে স্থানে ইলেক-ট্রনটি ছিল, সেটা যেন আয়নিত হয়ে যায়; যে ধনাত্মক আধান সে লাভ করে, ইলেকট্রনের আধানের সঙ্গে তা পরিমাণে সমান।

এখন, হোল্ হল এমন একটি বস্তু, আধা-পরিবাহীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সূত্রে যার কথা আমাদের মনে পড়ে। সেক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রন লাফ দিয়ে পরিবহন স্তবকে (conduction band) উঠে গেলে পরিপূর্ণ যোজন স্তবকে (valence band) একটি গর্ত (বা হোল্) থেকে যায়। ওখানে ঐ হোলের শক্তি ঋণাত্মক। উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বটে, তবে যাহোক ওখানেই উপমাটির ইতি। আধা-পরিবাহীতে হোল্ হচ্ছে বাস্তবিকই একটি 'শূন্য স্থান'; যোজন ও পরিবহন স্তবকে ইলেকট্রনের নানাজাতীয় গতির বর্ণনার সহজ সুবিধার জন্য এর অবতারণা।

শূন্যতার মধ্যে হোল্ হল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক বস্তু। এখানে এটি কোন-ভাবেই ইলেকট্রনের থেকে পৃথক নয়। এ একটি বাস্তব কণা, ইলেকট্রনের মতই বাস্তব। ইলেকট্রনের মত হোলের m_0c^2 পরিমান স্থিতি-শক্তি আছে। শূন্যতার কূয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি-স্তরের গভীরতার সমান ঐ শক্তি।

অন্যভাবে বলতে গেলে, ইলেকট্রন ও হোল্ শূন্যতায় তাদের 'অস্তিত্ব-হীনতা' থেকে কেবলমাত্র যুগ্মভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে। প্রত্যেকটি কণার উৎপাদনে শক্তি ব্যয় হয় m_0c^2 (কণা দুটির ভর সমান), বা আমরা আগেই যা বলেছি, সর্বসমেত শক্তি ব্যয় $2m_0c^2$।

"উন্মুক্ত জগতে" ঘুরে বেড়িয়ে ইলেকট্রনটি শূন্যতায় ফিরে যেতে পারে। ফিরে যাওয়ার জন্য দরকার একটি হোলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও মিলন। তারপর এটিকে পর্যবেক্ষণ করা আর সম্ভব হবে না। সেইসঙ্গে হোলও অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিন্তু এটাই সব নয়। শূন্যতা থেকে ইলেকট্রনটির নিঃসরণের জন্য যে শক্তির ব্যয় হয়েছে বা অন্যভাবে বলতে গেলে, ইলেকট্রন ও হোলের উৎপাদনে যে শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, শূন্যতায় ফিরে যাওয়ার আগে ইলেকট্রনকে সেই $2m_0c^2$ পরিমাণ শক্তি ত্যাগ করতে হয়। কোন্ আকারে ঐ শক্তি দেখা দেবে? গামা ফোটনের আকারে; ইলেকট্রন ও হোল্ যেখানে মিশে গেছে, ফোটনগুলি সেই স্থান থেকে বেরিয়ে যাবে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ঐ শক্তি।

শেষ প্রশ্ন হল: শক্তি কেন গামা ফোটনে নিয়ে নেয়? এখানে সরল বক্তব্য হল এই যে, অস্তিত্বহীনতায় বিলীন হওয়ার আগে ইলেকট্রন-হোল যুগলটি যে শক্তি ত্যাগ করে, হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গামা রশ্মির উপযোগী সেই শক্তির বিপুলতা। উৎপন্ন গামা ফোটনের সংখ্যা দুয়ের থেকে কম নয় (কদাচিৎ বেশি), কারণ যারা মিলিত হচ্ছে, সেই ইলেকট্রন ও হোলের ঘূর্ণন হল বিপরীত।

এ সমস্তই অত্যন্ত স্বাভাবিক ; শূন্যতার মধ্যে ইলেকট্রন ও হোলের মোট ভরবেগ যেহেতু শূন্য, তারা মিশে গেলে ভরবেগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং বিপরীত ভরবেগ-সমন্বিত একটি সঙ্গীর প্রয়োজন গামা ফোটনের, যাতে তাদের মোট ভরবেগ শূন্য হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে যে সংরক্ষণ বিষয়ক নিয়মগুলির কথা উল্লেখ করেছি, তাদের চাহিদাই হল এইরকম।

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংঘর্ষ স্থলের কাছে কোন তৃতীয় বস্তু (ধরুন, কোন পরমাণু-কেন্দ্রক) থাকলে সংঘর্ষমান কণা দুটির শক্তি ও ভরবেগের কিছুটা সে নিয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ফোটন হবে দুটির স্থলে একটি।

॥ শূন্যতার বহিশ্চিত্র ॥

ডিরাকের বক্তব্য শুনে পদার্থবিজ্ঞানীরা মাথা নাড়লেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সব থেকে ভক্ত অনুরাগীরা পর্যন্ত ডিরাকের তত্ত্বকে পদার্থবিদ্যার একটি চমৎকার রসিকতার থেকে বেশি কিছু বলে স্বীকার করতে রাজী হলেন না। এই 'উদ্ভট' মতবাদকে সমর্থন করতে হলে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন ছিল।

যাহোক এমন দিন আসতে দেরি হল না, যখন অবিশ্বাসী ও বিদ্রূপ-কারীদের লজ্জায় পিছু হটতে হল। দিনটি এমন এক আবিষ্কারের, ডিরাকের তত্ত্বকে যা জয়মাল্যে ভূষিত করল।

১৯৩২ সালে ইংরাজ ব্ল্যাকেট ও ইতালীয় অক্চিয়ালিনি মহাজাগতিক রশ্মির সামনে আলোকচিত্রের একটি ফলক উন্মুক্ত রেখে, দুটি চিহ্নিত পথ দেখতে পেলেন; পথ দুটির একটি ইলেকট্রনের ও ইলেকট্রনের সমান ভরসমন্বিত, কিন্তু বিপরীত আধানযুক্ত অপর একটি অজ্ঞাত কণার। একই বিন্দু থেকে বিভিন্ন দিকে পথ দুটি বেরিয়ে গেছে। আলোকচিত্রটি দেখেই

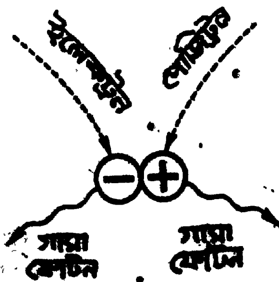
চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে রক্ষিত একটি বিশেষ কক্ষে গৃহীত হয়েছিল, পথেদের বিভিন্ন দিক নিশ্চয় বিপরীত আধানের নির্দেশক।

এইভাবে হোল্‌কে চেনা গেল, তার নাম দেওয়া হল পজিট্রন। যাদের এখন বিপরীত কণা বলা হয়, সেই ক্ষুদ্র কণাগুলির একটি পরম্পরার মধ্যে এটি হল প্রথম। একটু পরে আমরা আবার এদের বিষয় আলোচনা করব।

পজিট্রনের সম্বন্ধে এই একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে ডিরাকের তত্ত্ব যদি থেমে যেত, তাহলেও পদার্থবিদ্যায় এ একটি সম্মানের আসন লাভ করত। কিন্তু এ থামে নি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতের সম্পূর্ণ নতুন সব বিষয়ে ডিরাক পদার্থবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করলেন।

সর্বপ্রথম শূন্যতা সম্পর্কে। ডিরাকের মতে শূন্যতা এমন সব ইলেকট্রনে পরিপূর্ণ, 'শূন্যতার উপরের' জগতের কণার সঙ্গে যাদের কোন পারস্পরিক ক্রিয়া চলে না। শূন্যতা থেকে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে এলে তৎক্ষণাৎ একটি পজিট্রন উৎপন্ন হয়। এই কণাগুলির জন্ম ও মৃত্যু কেবল যুগল অবস্থাতেই হতে পারে।

কিন্তু আমরা তবে হয়তো বলতে পারি, শূন্যতা পজিট্রনে পরিপূর্ণ, শূন্যতা থেকে পজিট্রন বেরলে তখনই কেবল ইলেকট্রন দেখা দেয়। ডিরাকের তত্ত্বের আদি অবস্থার উভয় ঘটনার সম্ভাবনাকেই সমান মনে করা হয়েছিল। যাই হোক, বিপরীত-কণা দিয়ে নয়, কণা দিয়ে পরিপূর্ণ শূন্যতাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কারণ হল, ইলেকট্রনরা আমাদের চতুর্দিকে রয়েছে, অথচ পজিট্রনরা আমাদের জগতে দুর্লভ অতিথি। এ থেকে আমাদের সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে, বিশ্বে ইলেকট্রনের তুলনায় পজিট্রনের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু ডিরাকের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কণা অপরটির সঙ্গেই অর্থাৎ তার বিপরীত কণার সঙ্গেই কেবল উৎপন্ন হতে পারে। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিশ্বে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংখ্যা সমান হওয়া উচিত।



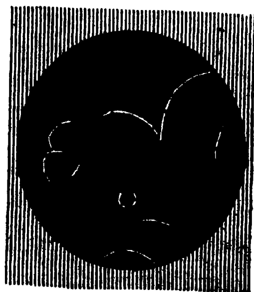
চিত্র নং ২৩

আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই, আমাদের জগতের এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও অস্তিত্ব রয়েছে ; কারণ সমস্ত ইলেকট্রন পজিট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে গামা ফোটনের আকারে একটি বিদেহী চিহ্ন রেখে শূন্যতার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে—সেই ঘটনাকে যে নিবারণ করবে, এমন কোন কিছু নেই।

যাহোক পজিট্রনের সঙ্গে ইলেকট্রনের সচরাচর সাক্ষাৎ হয় না ; প্রকৃতপক্ষে ঐ সাক্ষাৎ বাস্তবিকই বিরল। অতএব বিশ্বের শূন্যতায় পর্যবসিত হওয়ার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পজিট্রনের থেকে ইলেকট্রনের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু কোথায় যায় পজিট্রনরা ?

ভাবা যেতে পারে যে, পজিট্রন ও ইলেকট্রনকে প্রকৃতি যতদূর সম্ভব পৃথক করে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের লেখকদের ও বিশেষ কয়েকজন বিজ্ঞানীর এটি একটি প্রিয় ধারণা। তাঁদের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না কোথাও রয়েছে বিপরীত-কণা দিয়ে তৈরী সব জগৎ, তথাকথিত দর্পণ-জগৎ। সেই সব জগতে পজিট্রন হচ্ছে কর্তা আর ইলেকট্রনরা সাময়িক অতিথি।

পরের প্রশ্ন : ইলেকট্রনের যদি বিপরীত-কণা থাকে, প্রোটনেরও বিপরীত-কণা থাকবে না কেন ? সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক কণার বিপরীত-কণা থাকা উচিত, থাকা উচিত নিজস্ব শূন্যতা। অতঃপর নিউট্রন, নিউট্রিনো ও মেসন দিয়ে শূন্যতার পূর্ণ (সম্যকভাবে পূর্ণ !) হওয়ার কথা। আজব শূন্যতা ! বরং এটা সমস্ত অজাত ও মৃত কণার একটি অপরিসীম আধার (কুয়ো) বলা যেতে পারে।



চিত্র নং ২৪

বেশ হৃদয়গ্রাহী বটে, তবে ব্যবহারের পক্ষে কতকটা একেবারে অযোগ্য। স্বল্পকাল পরে ডিরাকের শূন্যতাকে পরিত্যাগ করে পদার্থবিজ্ঞানীরা তার স্থলাভিষিক্ত করলেন আরো মার্জিত সব ধারণা ; সেগুলির বিষয় আমরা পরে আলোচনা করব।

যথেষ্ট শক্তি লাভ করবার পর কণারা যুগ্মভাবেই কেবল কুয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। প্রথমে যারা বেরিয়ে আসে, সেগুলি অবশ্যই সব থেকে হাল্কা কণা — নিউট্রিনো ও ইলেকট্রন। ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগলের তুলনায় প্রোটন ও বিপরীত-প্রোটনের ক্ষেত্রে এই শক্তিকে অন্ততঃ দু'হাজার গুণ বেশি হতে হবে। কণা যত ভারী ও মন্থর গতি, শূন্যতা থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে তত শক্ত।

॥ সম্পূর্ণ শূন্যতা ? ॥

একটি ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল অদৃশ্য হয়ে গেলে আমরা জানি, গামা রশ্মির শক্তিশালী ফোটনের জন্ম হয়। কিন্তু ঠিক ফোটনই কেন, অন্য কিছু নয়? আমরা এখনো তা জানি না।

একটি বিলিয়ার্ড বল অন্য একটিকে আঘাত করে যখন একদিকে চলে যায় ও অন্যটিও নড়তে সুরু করে, আমরা তখন পারস্পরিক ক্রিয়া লক্ষ্য করি। কিন্তু একটি স্থির বলকে না ছুঁয়ে তার কাছ দিয়ে আর একটি বল পাঠিয়ে তাকে নাড়াবার চেষ্টা করুন। ব্যাপারটা হবে গাড়িতে না জোতা অবস্থায় ঘোড়ার গাড়ি টানার মত প্রায়।

এই উভয় ক্ষেত্রেই বস্তুগুলি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করছে সংস্পর্শের ফলে : একটি বল অন্যটিকে আঘাত করেছে, ঘোড়া গাড়িকে টেনেছে।

এখন, আর এক ধরণের পারস্পরিক ক্রিয়া আছে। আপেল মাটিতে পড়ে। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। বিদ্যুৎসমন্বিত গোলক পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে। 'আকর্ষণ'— এই শব্দটি থেকেই বোঝা যায় যে, বস্তুগুলি দূর থেকে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করতে সুরু করেছে।

এই ক্রিয়ার প্রভাব হয়তো বায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অনেককাল আগেই পরীক্ষা থেকে এর নেতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে। পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য, এই সবগুলির মধ্যে কার্যতঃ শূন্যতা থাকলেও পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, সূর্য আকর্ষণ করে উভয়কেই। পরমাণু-কেন্দ্রক ও ইলেকট্রনের মধ্যে পরম শূন্যতা থাকলেও পরমাণু-কেন্দ্রক ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে। এসব থেকে বোঝা যায়, সংস্পর্শ ছাড়াই বস্তুরা পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল হতে পারে।

যেসব স্থানে দূর থেকে এই রকম ক্রিয়া সংঘটিত হয়, এক শতাব্দী আগে পদার্থবিজ্ঞানীরা সেই সব স্থানের নাম দিয়েছিলেন 'ক্ষেত্র'। কিন্তু মধ্যখানের স্থান যে শূন্য, এটা তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মধ্যবর্তী কোন মাধ্যম ছাড়া ক্রিয়া হতে পারে না। সরল ভাষায় বলতে গেলে মাধ্যম একটি থাকতেই হবে। সুতরাং তাঁরা 'ঈথারে'র কল্পনা করলেন; সমগ্র শূন্যতা ব্যাপী অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে বস্তু, তাই হল ঈথার।

কয়েক বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞানীরা এই ঈথারের ধর্ম বোঝবার চেষ্টা করলেন। এই বইয়ের গোড়ার দিকের আমাদের আলোচনা স্মরণ করলে দেখবেন, ঐ সব ধর্ম সত্যই অদ্ভুত, এমনকি পরস্পর বিরোধী। পরিশেষে গত শতাব্দীর শেষভাগে আলোক সংক্রান্ত পরীক্ষাদির ফলে ঈথারের ধারণার সমাপ্তি ঘটল। ঈথারকে যে কোনরকম আকার বা আকৃতিতেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার একেবারে কোন আশা নেই, আর কয়েক বছরের মধ্যেই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব তা দেখিয়ে দিল।

ঈথারের পতন হল, কিন্তু তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত কিছু রইল না। পদার্থবিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে শূন্যস্থানে দূর থেকে ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু শূন্যতা কী করে যে পারস্পরিক ক্রিয়ার বাহন হতে পারে, তা মনীষীদেরও বুদ্ধির বাইরে রয়ে গেল।

আপনি নিশ্চয় ঠিকই ধরেছেন, সাধারণ জ্ঞানের উপর যত নির্ভর করা যায়, নতুন পথে চলা তত শক্ত হয়ে ওঠে। স্থান যে সব বস্তুর আশ্রয়স্থল, তাতে নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই? সেটা কি স্বপ্রকাশ নয়? পদার্থের দ্বারা অধিকৃত স্থানের অংশকে বলা হয় বস্তু, কণা বা আপনার খুশি মত ঐ ধরণের কিছু একটা। তারপর, এসব স্থান আছে, যা কোন পদার্থের দ্বারাই অধিকৃত নয়। আমরা তাকে বলি শূন্যতা, শূন্য স্থান, পদার্থবিহীনতা। এই দুটি অংশ কোনভাবেই সংযুক্ত নয়। বস্তুর উপর শূন্যতার কোন প্রতিক্রিয়া নেই, বস্তুরও প্রতিক্রিয়া নেই শূন্যতার উপর। সত্য বটে, শূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া চলতে পারে, কিন্তু শূন্যতা সেখানে ধর্তব্য নয়: ঐ ক্রিয়ার মূলে রয়েছে বস্তুরা কেবল নিজেরাই।

॥ শূন্যতা বস্তুর উপর নির্ভরশীল ! ॥

কিন্তু তারপর এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল, যিনি কেবল এই বিষয়েই সন্দিহান হলেন না, সব কিছুকেই আগাগোড়া নতুন করে বিচার করলেন। তিনি হলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং তাঁর তত্ত্বের নাম আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। তাঁর প্রথম তত্ত্বের কথা আমরা আগেই বলেছি — সেটি হল আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব, দ্রুতগামী বস্তুদের বিষয় তাতে আলোচনা করা হয়েছে। এর থেকে অনেক প্রশস্ততর সমস্যা আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বস্তু ও স্থানের মধ্য সম্পর্ক হল এর আলোচ্য বিষয়।

পদার্থের যে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের উপর প্রভাব আছে, এই বক্তব্যের মধ্যে ঐ তত্ত্বের প্রধান ধারণাটি নিহিত রয়েছে। বস্তুর অবর্তমানে স্থান হয় একেবারে সমজাতীয় (এটা অবশ্যই কেবলমাত্র কাল্পনিক স্থান), বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটলে এই সমজাতিকত্ব থাকে না।

কী ভাবে এটা ঘটে, কী করেই বা আমরা ঐ অসাম্যের পরিমান নির্ণয় করতে পারি ? এই কার্যটি করে দেয় জ্যামিতি। শূন্য স্থানের জ্যামিতি হচ্ছে আমাদের স্কুল পাঠ্য সাধারণ জ্যামিতি—ইউক্লিডের জ্যামিতি। এই জ্যামিতিতে দুটি বিন্দুর মধ্যে স্বল্পতম দূরত্ব একটি সরলরেখা, সমান্তরাল সরলরেখারা কখনোই মিলিত হয় না। স্বতঃসিদ্ধ নামে আরো কয়েকটি 'সুস্পষ্ট' বক্তব্য আছে—ঐ সব প্রস্তাব নিজে থেকেই এত পরিষ্কার যে, কোন প্রমাণের দরকার করে না। (প্রসঙ্গক্রমে যাহোক বলে রাখি, কোন প্রমাণ পাওয়া সম্ভবও নয়)।

তবুও গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশ-দেশীয় জ্যামিতিজ্ঞ লোবাচেভ্‌স্কি এই সব স্বতঃসিদ্ধের একটির (সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধ) মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করেন। তিনি দেখালেন যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিতর যেমন কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই, এই স্বতঃসিদ্ধটি ত্যাগ করেও সেইরকম একটি জ্যামিতি গঠন করা সম্ভব, তবে ঐ জ্যামিতি সাধারণ জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। লোবাচেভ্‌স্কির জ্যামিতি এত অসাধারণ ও আপাত অসম্ভব ছিল যে,

কেউই তা বুঝতেন না। অনেক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের তাকে লোবাচেভ্‌স্কির রচনাবলীর উপর কেবল ধুলা জমা হল।

লোবাচেভ্‌স্কির অভিমত শুনে তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিরা ভীত ও বিস্মিত হতেন। তাঁর অভিমত হল — সমস্ত জগতে প্রযোজ্য 'সাধারণ' জ্যামিতি বলে কোন কিছু নেই; যে জ্যামিতিতে যে সব বাস্তব বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেই জ্যামিতির ধারা সেই সব বস্তুর ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়; কোন স্থানে যে সব বস্তু ও পদার্থ আছে, তাদের উপর ও তাদের বহিরাকৃতির উপর নির্ভর করে ঐ স্থানের জ্যামিতি। ধর্মদ্রোহিতা! জগতের ভগবৎ-দত্ত জ্যামিতিকে মানুষের পরিবর্তন করার চেষ্টা!

কিন্তু এই সব ধারণা উপযুক্ত স্থান লাভ করল আইনষ্টাইনের রচনাবলীতে। বস্তু ছাড়া যেমন কোন স্থান নেই, ঠিক সেইরকম একীভূত সমজাতীয় স্থানও নেই কোথাও। বস্তুদের চতুষ্পার্শ্বস্থ শূন্য স্থানে দুটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম রেখা এখন সাধারণভাবে একটি সরলরেখা নয়, জিওডেসিক নামে একটি বক্র রেখা। আমাদের এই রেখার শেষ বিন্দু দুটি বস্তুদের যত কাছে ও বস্তুগুলি যত ভারী, ঐ রেখার বক্রতা তত বেশি।

আমরা কী করে তা জানতে পারি? আলোকরশ্মির আমাদের সাহায্য করার কথা। স্থানের বস্তুজনিত বক্রতা অত্যন্ত অল্প, সাধারণ অবস্থায় তা লক্ষণীয় নয়। আন্তর্নাক্ষত্রিক স্থানে পরীক্ষাটিকে আমাদের পরিচালনা করতে হবে, বক্রকারক বস্তু হিসাবে নির্বাচন করতে হবে সূর্যের মত কোন বিরাট বস্তুকে। যে রেখাকে আমরা সরল বলে মনে করি, তার বক্রতা লক্ষ্য করাই স্বভাবত সর্বথেকে সুবিধাজনক। সনাতনী পদার্থবিদ্যায় বিশ্বাস থাকলে সেটি হল আলোকরশ্মির পথরেখা। এই ধারণাবুই খণ্ডন করতে আইনষ্টাইন সচেষ্ট হলেন।

আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে কোন নক্ষত্রের দিকে ফিরিয়ে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাক। তার আলোকরশ্মি যখন সূর্যের নিকট দিয়ে যাচ্ছে, তখন আবার গ্রহণ করা যাক তার আলোকচিত্র। প্রথম চিত্রটি আমরা গ্রহণ করব রাত্রিতে, দ্বিতীয়টি সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময়।

সনাতনী পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী দুটি চিত্র থেকেই দেখা যাবে, নক্ষত্রটি আলোকচিত্রের ফলকের একই অপরিবর্তিত স্থানে রয়েছে। আলো সূর্যের

কাছ দিয়ে বা দূর দিয়ে যাক, তাতে কোন তফাৎ হওয়া উচিত নয়। যাহোক আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্যের কাছ দিয়ে গেলে আলোর গতিপথের বেঁকে যাওয়ার কথা। আলোকচিত্রের ফলকে এই বক্রতা প্রদর্শিত হবে নক্ষত্রটির প্রথম চিত্রটির থেকে স্থানচ্যুতি রূপে।

১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ লক্ষ করবার জন্য আরব দেশের মরুভূমির উদ্দেশে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হল। এর একটি উদ্দেশ্যে ছিল, আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য নির্ণয় করা। আশ্চর্য সংবাদ! আলোকচিত্র থেকে দেখা গেল, স্থান হচ্ছে বক্র। আরো আশ্চর্য, আইন্স্টাইন যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, প্রায় ঠিক তেমনই হচ্ছে ঐ বক্রতা!

সেই সময় থেকে শূন্য স্থান সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানীদের ধারণা একেবারে পাল্টে গেছে। স্থান শুধু বস্তুর নয় ক্ষেত্রেরও আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

॥ পদার্থ ও ক্ষেত্র ॥

ক্ষেত্র কী? যে স্থানে বস্তুদের পারস্পরিক ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, সেই স্থানকে বোঝাবার জন্য বিজ্ঞানীরা এই শব্দটি ব্যবহার করেন। যাহোক, পারস্পরিক ক্রিয়াবিহীন কোন বস্তু নেই; সব বস্তুই শেষ পর্যন্ত কণা দিয়ে তৈরী, আর কোন কণাই অন্যদের প্রতি 'উদাসীন' নয়।

এই জন্য সর্বত্র ও সর্বদা ক্ষেত্রের অস্তিত্ব আছে। ঐ ক্ষেত্রে শুধু বস্তুদের পরস্পরের মধ্যে নয়, তাদের নিজেদের অন্তরেও, কারণ পদার্থের দ্বারা পূর্ণ নয়, এমন শূন্যতা সেখানে আছে। এইটি হল ক্ষেত্রের সর্বপ্রথম ও সবথেকে মৌল ধর্ম। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্তও এসে পড়ে: পদার্থ যেমন বাস্তব ও বিশ্বজনীন, ক্ষেত্রও সেইরকম।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পদার্থের সঙ্গে ক্ষেত্রের পার্থক্য আছে: স্পর্শ দ্বারা বস্তুকে অনুভব করা যায়, ক্ষেত্রকে (ধরুন, বৈদ্যুতিক, কেন্দ্রীন বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ক্ষেত্রকে) করা যায় না। কিন্তু ক্ষেত্রকে অনুভব করা যে অসম্ভব, তা আমরা বলতে পারি না। মাটিতে একটি আপেল পড়ার কথা ধরা যাক: বস্তুর গতি থেকে ক্ষেত্রের সক্রিয়তা বোঝা যায়।

এ ছাড়া ক্ষেত্র থেকে আর একটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তা হল 'স্বনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ' আলোর অস্তিত্ব। বহুকাল আগে, গত শতাব্দীতেই এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, আলো একটি বিশেষ তথাকথিত বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র।

আইনস্টাইন তাঁর আলোকবিদ্যুতিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বে ফোটনকে এনে উপস্থিত করলেন। এটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম-করণ ঘটল, অর্থাৎ কোয়ান্টামরূপ স্বতন্ত্র কণার আকারে ক্ষেত্রের অস্তিত্ব নির্ধারিত হল। ফোটন হচ্ছে ক্ষেত্রের এই সব কোয়ান্টাম।

ক্ষেত্রের ইতিহাসের বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৭২ সালে স্টোলেটভ দেখলেন যে, ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত করে আলো জড়সুলভ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। ১৯০০ সালে লেবেডেভ বস্তুর উপর আলোর চাপ আবিষ্কার করলেন — ঠিক যেন আলো ভরসমন্বিত 'বাস্তব' কণা দিয়ে গঠিত।

এই দুটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা ও ফোটনের ধারণা থেকে যে অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে আসা গেল, তা হচ্ছে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের জড়সুলভ ধর্ম আছে এবং ক্ষেত্র-কোয়ান্টামে পদার্থকণার বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে পারে।

পদার্থ ও ক্ষেত্রের মধ্যকার সেতুর এটি হল প্রথম খিলান। দ্য ব্রগ্‌লির মতবাদ ইতিমধ্যে অন্যদিক থেকে সেতুবন্ধন সুরু করল। ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ধর্ম থাকতে পারে; অর্থাৎ পদার্থের আচরণ হতে পারে ক্ষেত্রোচিত।

যে ক্ষেত্র সীমাহীন ও যাকে ওজন করা যায় না, সেই ক্ষেত্রের আয়তন ও ভর থাকতে পারে। যে পদার্থ স্থানে সীমাবদ্ধ ও যাকে ওজন করা চলে, সেই পদার্থ আয়তন ও ভর থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

আমরা এখন কি এই সিদ্ধান্তে আসব যে, পদার্থ ও ক্ষেত্রের মধ্যে পূর্বতন প্রগাঢ় পার্থক্যের স্থলে ঐ দুটিকে একটি অবিভেদ্য অস্তিত্বে আমাদের মিশিয়ে দিতে হবে? না! ক্ষেত্রের জড়সুলভ ধর্মগুলি তার কোয়ান্টামদের বৃহৎ শক্তির অবস্থায় কেবল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার পদার্থের ক্ষেত্রোচিত ধর্মগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার কণাগুলির বৃহৎ শক্তিলাভে।

আর স্বল্প শক্তিতে? ক্ষেত্র তখন ক্ষেত্র, ও পদার্থ পদার্থই।

॥ শূন্যতা বলে কিছু নেই ! ॥

আলোকচিত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের যে সমকালীন জন্ম নির্ণয় করা গেছল, তা শুধু শূন্যতার 'উন্মুক্ত হওয়া' নয়, তা হল ক্ষেত্রের পদার্থে রূপান্তরের প্রথম বাস্তব ঘটনা। ডিরাকের তত্ত্বে কথিত বিপরীত ভবিষ্যদ্বাণী-টিরও প্রমাণ শীঘ্র পাওয়া গেল : সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের এক যোগে ধ্বংস এবং (সেই মুহূর্তে) দুটি গামা ফোটনের উৎপত্তি।

একটু অপেক্ষা করুন। ইলেকট্রন ও পজিট্রন তো কোন কিছুতে রূপান্তরিত হয় নি, অপরিবর্তিতভাবে তারা শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছল। তারা যে শক্তিকে মুক্তি দিল, তাই ধারণ করল গামা ফোটনের আকার। ঠিক যেমন ধরুন, পরমাণুর মধ্যে কোন ইলেকট্রন উচ্চতর থেকে নিম্নতর শক্তি-স্তরে লাফ দিয়ে নামলে তার শক্তি ফোটনের আকারে বেরিয়ে যায়, কিন্তু ইলেকট্রনটি অন্ততঃ ইলেকট্রনই থাকে।

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। এখানে ঘটনাটা হচ্ছে এই যে, শূন্যতা দেখা দেয় তার মৌল ক্ষেত্রোচিত রূপ নিয়ে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন শক্তি ত্যাগ করে ঠিকই, কিন্তু শক্তির একটি অংশকেই কেবল ত্যাগ করে। মুক্ত গতিশীল অবস্থায় এ এর গতীয় শক্তির সমস্তটাই হারাতে পারে, সম্পূর্ণ স্থির হতে যেতে পারে এটি। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এর প্রধান শক্তি (যথার্থ শক্তি) কখনো পরিত্যাজ্য নয় — যদি নাকি ইলেকট্রনটি ইলেকট্রন হয়েই থাকতে চায়। কারণ স্থিতি-ভর m_0-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে $E_0 = m_0c^2$ পরিমাণ শক্তি, সেই শক্তিকে ত্যাগ করা স্থিতি-ভরকে হারানোরই সমতুল্য ; সেজন্য কণারূপে অস্তিত্বও সেইসঙ্গে বিলুপ্ত হয়। আমরা আগেই বলেছি যে, বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের কোয়াণ্টামদের সঙ্গে কণাদের পার্থক্য হচ্ছে — কণারা স্থির হয়ে থাকতে পারে ও তাদের ভর শূন্যের সমান নয়।

এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইলেকট্রন যখন শূন্যতায় ঝাঁপ দেয় এবং ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগ্মের যথার্থ শক্তি পরিত্যক্ত হয়, ইলেকট্রন তখন আর ইলেকট্রন থাকে না, পজিট্রনও ঠিক সেরকম আর পজিট্রন থাকে না।

স্বভাবতই তাদের ভর নিশ্চিহ্নভাবে অদৃশ্য হয় না এবং তাদের শক্তিও ঠিক সেইরকম অদৃশ্য হয়ে একেবারে বিলুপ্ত হয় না। ভরের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে ; ভর হয়ে ওঠে আদিভৌতিক, ক্ষেত্রোচিত, আর যথার্থ শক্তি রূপান্তরিত হয় গামা ফোটনরূপ ক্ষেত্রের কোয়াণ্টামদের শক্তিতে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেখা যচ্ছে, শূন্যতায় কোন 'বাস্তব' ইলেকট্রন নেই, সেখানে তাদের অস্তিত্ব কল্পনার ভিত্তিতে — বলতে গেলে যেন সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে।

কারণ হল, শূন্যস্থান বা শূন্যতার সাধারণভাবে কোন অস্তিত্ব নেই। সমস্ত স্থান পূর্ণ করে আছে শুধু পদার্থ ও ক্ষেত্র। ডিরাক যে শূন্যতার কথা ভেবেছিলেন, তা হল — পদার্থকণা ও ক্ষেত্র-কোয়াণ্টামের পারস্পরিক-রূপান্তরের প্রতিক্রিয়াগুলি বর্ণনা করার সুবিধার জন্য একটি চিত্রকল্প।

পাঠককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর কোন চেষ্টা লেখকের ছিল না। তাঁর মনে হয়েছে যে, প্রথমে সাধারণ শূন্যতা নিয়ে সুরু করতে হয়, তারপর আলোচনা করতে হয় অপ্রচলিত শূন্য স্থানের কথা এবং তারপরই কেবল দুটিকেই বর্জন করা যায়। অন্ততঃ বিজ্ঞানের বিকাশের স্বাভাবিক পন্থা ছিল ঐরকম।

একটি পজিট্রনের সঙ্গে একটি ইলেকট্রনের সংঘাতে তারা গামারশ্মির ফোটনে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়া যখন সম্ভব, বিপরীত প্রক্রিয়াটিও তখন নিশ্চয় সম্ভব : ফোটনের কণা-যুগ্মে গামারশ্মির রূপান্তর। ফোটনের যদি যথেষ্ট শক্তি থাকে — অন্ততঃ $2m_0c^2$ পরিমান শক্তি—তাহলে বাস্তবিকই এই রকম ঘটে।

ফোটনদের পর্যবেক্ষণ করা যায় ও লিপিবদ্ধ করা চলে ; ফোটনরা হল সম্পূর্ণরূপে বাস্তব। অপরপক্ষে, শূন্যতা থেকে একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রন নির্গত না হওয়া পর্যন্ত শূন্যতা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব। এই অবস্থার মধ্যে আমরা কেমন করে সামঞ্জস্য আনতে পারি ?

প্রকৃতপক্ষে, কোন কিছুর মধ্যেই সামঞ্জস্য আনতে হবে না। ফোটনদের শক্তি যতক্ষণ না বেশি হচ্ছে, তারা ফোটন হিসাবেই লিপিবদ্ধ হয়। শক্তি যখন ফোটন যুগ্মের কণা-যুগ্মে রূপান্তরের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে, তখনই কেবল আমরা ফোটনের 'শূন্যতা সুলভ' ধর্মগুলি অনুভব করতে পারি।

ফোটনরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, গেলে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় একটি ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগ্ম।

জড়-কণার ক্ষেত্র কোয়ান্টামে ও ক্ষেত্রকোয়ান্টামের জড়-কণায় পারস্পরিক রূপান্তরের সম্ভাবনাকে 'শূন্যতা' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়। সেইটি হচ্ছে এখন মূল বক্তব্য। এই অধ্যায়টির সুরু থেকে আমরা তাই বলে আসছি।

আপাতত সব কিছুই মোটামুটি পরিষ্কার। পদার্থ ও ক্ষেত্রের মধ্যে যেহেতু আমরা সেতুবন্ধন করেছি, যানবাহন চলাচল দুদিকেই সম্ভব: কণা হয়ে ওঠে ক্ষেত্র-কোয়ান্টাম, ক্ষেত্র-কোয়ান্টাম হয়ে যায় কণা। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ঐ সেতুর উপর ওঠা: সেতুটি বেশ উঁচু — শক্তির উচ্চতার পরিমান $2m_0c^2$; ইলেকট্রনের পক্ষে এর অর্থ লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট ও প্রোটনের পক্ষে শত কোটি শত কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট।

তাহলে আমাদের বক্তব্যের সারাংশ হল এই যে, শূন্যতার স্থান অধিকার করেছে ক্ষেত্র। শূন্যতার চিত্রণযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকায় আমরা শূন্যতা শব্দটি ব্যবহার করব। একটি বিশ্বব্যাপী সমুদ্র — যার মধ্যে ডল্‌ফিনের মত কণারা সব ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে আর তারপর লাফ দিয়ে উঠে আসছে — সেরকম একটি সমুদ্র হিসাবে একে চিত্রিত করা সুবিধাজনক।

॥ যার উপর ভর করে খুঁটিগুলি দাঁড়িয়ে আছে ॥

মার্জিত কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যে খুঁটিগুলিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলির মধ্যে একটিকে এখন আমরা পরিশেষে ব্যাখ্যা করব। সবশুদ্ধ তিনটি খুঁটি আছে: প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম প্রকল্প, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কণার তরঙ্গধর্ম সম্পর্কে দ্য ব্রগলির প্রকল্প। এই শেষের প্রকল্প আমরা আলোচনা করব।

আমরা একটু আগে যে কাণ্ডটি করেছি — জ্যোতির্বিদ্যাসুলভ বিরাট সব আয়তনের জগতের জন্য গঠিত আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব থেকে লাফ দিয়ে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর কোয়ান্টাম জগতে চলে এসেছি, সেটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয় বলে মনে হয়েছে কিনা, তাই ভাবছি। বক্তব্য হল, আমরা বারবার জোর দিয়ে বলেছি যে, এক আয়তনের জগতে যে নিয়মগুলি প্রয়োগ করা চলে,

অন্য আয়তনের জগতে সেগুলি, আর কিছু না হোক, ত্রুটিপূর্ণ। পদার্থ ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে আইনস্টাইনের ধারণাগুলিকে ক্ষুদ্রের জগৎ পর্যন্ত প্রসারিত করার আমাদের কী অধিকার ছিল? দ্য ব্রগ্‌লির প্রকল্পের দৌলতে আমরা ঐ অধিকার লাভ করেছি; প্রকল্পটির সত্যতা বিশ্বস্তভাবে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষুদ্র কণার তরঙ্গধর্ম আছে। তাদের দ্বিত্বের অস্তিত্ব সর্বত্র ও সর্বকালে। কিন্তু তরঙ্গ কী? অনির্দেশ্য বিস্তার ও অনন্ত গতি, এর এই ধর্ম দুটিকে বিচার করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। কার্যতঃ সেজন্য দ্য ব্রগলির প্রকল্প অনুযায়ী পদার্থ কণার ক্ষেত্রোচিত ধর্ম আছে। এইদিক থেকে আইনস্টাইনের প্রকল্পের এটি পরিপূরক; আইনস্টাইনের প্রকল্প অনুযায়ী ক্ষেত্র-কোয়ান্টামের (ফোটনের) জড়ধর্ম আছে।

অতিক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রোচিত ধর্মগুলি কেমনভাবে প্রকাশ পায়? তার অসংখ্য উদাহরণ আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি। ঐ ধর্মগুলির মধ্যে সবথেকে লক্ষণযুক্ত হল — ইলেকট্রন ও অন্যান্য কণার স্থানে বিস্তারিত হয়ে থাকা। পদার্থবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলতে গেলে, ওরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত নয়। একটি ইলেকট্রন এখানে আছে, অথচ সেটি এখানে নেই-ও। তার গতিবেগ নিখুঁতভাবে পরিমাপ করার চেষ্টার ফলে তার অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলার ক্ষমতা আমাদের আর থাকে না। ক্ষেত্রের এটি একটি বিশেষ লক্ষণ: ক্ষেত্র সর্বত্রব্যাপী হওয়ায় কোন নির্দিষ্ট স্থানে তাকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব।

ইলেকট্রনের বেগকে বাড়িয়ে আলোর বেগের যত কাছাকাছি তাকে আনা যায়, ইলেকট্রনটি ততই ভারী হয়ে ওঠে। কোথা থেকে সে তার অতিরিক্ত ভর লাভ করে? ইলেকট্রন সাধারণত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। ত্বরণের সময় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যেন ইলেকট্রনের মধ্যে প্রবেশ করে তার শক্তির একটি অংশ ইলেকট্রনকে দিয়ে দেয়। ইলেকট্রনের যেহেতু শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে, আইনস্টাইনের সূত্র (২১৭ নং পৃষ্ঠা দেখুন) অনুযায়ী ইলেকট্রনের বেগ এবং ভরেরও বৃদ্ধি হওয়া উচিত।

কিন্তু ক্ষেত্র থেকে কণায় ভর সঞ্চার করার এই প্রক্রিয়া অন্তহীনভাবে চলতে পারে না। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভর বেড়ে যায় এবং কণাটির গতীয়

শক্তি পরিশেষে তার যথার্থ শক্তির সমান হয়ে ওঠে (কণাটির বেগ আলোর বেগের শতকরা ৮০ ভাগের মত হলে উক্ত ঘটনাটি ঘটে)। এই সময় একটি নতুন প্রক্রিয়া সুরু হয় ; ঐ প্রক্রিয়ায় কণাটির তরঙ্গ বা ক্ষেত্রোচিত ধর্মগুলি প্রাধান্য লাভ করে। পদার্থগুলি এখন এমন অবস্থায় থাকে যে, সঞ্চিত শক্তি ও যথার্থ শক্তি, দুটি থেকেই একসঙ্গে মুক্ত হয়ে তারা ক্ষেত্রের কোয়ান্টামে রূপান্তরিত হতে পারে।

কণাদের বেগের বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের ভরের বৃদ্ধির কারণ হল, প্রকৃতিদত্ত তাদের একধরণের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। কণাগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করতে চায় না, যে কোনরকম শক্তিবৃদ্ধিকে ভীষণভাবে প্রতিরোধ করে ; এবং ক্ষেত্রে তাদের রূপান্তর যত সন্নিকট হয়, এই প্রতিরোধ তত বৃদ্ধি পায়।

কণারা কখনোই ক্ষেত্রের প্রবাহের বেগ লাভ করতে পারে না। ক্ষেত্রের প্রবাহের পক্ষে আবার কখনো পৃথক কোন বেগসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

॥ কণার পরিচ্ছদের পরিবর্তন ॥

এখনো পর্যন্ত ইলেকট্রন (ও অবশ্যই পজিট্রন) সম্পর্কেই শুধু কণার রূপান্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে। নিউট্রনের আবিষ্কারের পর দেখা গেল, তারও রূপান্তর সম্ভব , তবে ইলেকট্রনের মত ক্ষেত্র-কোয়ান্টামে তার রূপান্তর নয়, তার রূপান্তর ঘটে অন্যান্য কণায়।

প্রথমত, (বিটা-ক্ষয় প্রক্রিয়ায়) একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউট্রিনোয় নিউট্রনের রূপান্তর সম্ভব ; এর জন্য নিউট্রনকে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রন একটি প্রোটন ও একটি পাই-মেসনে রূপান্তরিত হয়। পরে দেখা গেল, নিউট্রনের প্রথম রূপান্তরের সঙ্গে দ্বিতীয়টির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বন্ধনমুক্ত পাই-মেসনের ক্ষয়ের ফলে একটি মিউ-মেসন (পাই-মেসনের এক-চতুর্থাংশের সমান ভারী) ও একটি নিউট্রিনোর জন্ম হয়। আবার, মিউ-মেসনের ক্ষয়ের ফলে একটি ইলেকট্রন, একটি নিউট্রিনো ও একটি বিপরীত-নিউট্রিনোর সৃষ্টি হয়। আমরা এইভাবে পাচ্ছি :

বন্ধনমুক্ত নিউট্রনের ক্ষয় :

নিউট্রন→প্রোটন + ইলেকট্রন + নিউট্রিনো

'কেন্দ্রকীয়' নিউট্রনের ক্ষয় :

নিউট্রন→প্রোটন + পাই-মেসন

পাই-মেসন→মিউ-মেসন + নিউট্রিনো

মিউ-মেসন→ইলেকট্রন + নিউট্রিনো + বিপরীত-নিউট্রিনো

ফল : নিউট্রন→প্রোটন + ইলেকট্রন + ২ নিউট্রিনো + বিপরীত-নিউট্রিনো

যাহোক, কেন্দ্রকের মধ্যে পাই-মেসনের ক্ষয় না হওয়ায় রূপান্তর দুটির সাদৃশ্যের এই আঙ্কিক গণনার গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। আমরা আগেই জেনেছি যে, কেন্দ্রকের ভিতরের কণাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে বৈদ্যুতিক বল এবং তার থেকেও আরো অনেক বেশি শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বল; ঐ সব বলের ফলে কেন্দ্রকের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয়।

নতুন কোন ধরণের বল থাকার অর্থ নতুন কোন ক্ষেত্র থাকা। নতুন কোন ক্ষেত্র থাকলে তা থেকে বোঝা যায়, নতুন কোন কোয়ান্টাম অবশ্যই আছে। বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাহক হল ফোটন। সেইরকম, কেন্দ্রকের ভিতরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাহক অবশ্যই পাই-মেসন (আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, কেন্দ্রক ও মিউ-মেসনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া সামান্য হওয়ায় মিউ-মেসন কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম হতে পারে না)।

আমাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার তাহলে দাঁড়াল এই যে, পাই-মেসন হচ্ছে কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম। কিন্তু ফোটনের যেখানে কোন স্থিতি-ভর নেই, এই সব কোয়ান্টামের স্থিতি-ভর আছে এবং অতিক্ষুদ্র বস্তুর জগতে সেটা বেশ অনেকখানি, কারণ ইলেকট্রনের থেকে পাই-মেসন প্রায় তিনশো গুণ বেশি ভারী। এজন্য পাই-মেসন আলোর সমান বেগসম্পন্ন হতে পারে না। দেখুন, কেমন কোয়ান্টাম! কোয়ান্টামের থেকে কণার সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি, অথচ ওটা কোয়ান্টাম-ই। ক্ষেত্র ও পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্কের যে সুসমঞ্জস ও সুবিন্যস্ত চিত্র পদার্থবিজ্ঞানীরা সবে গড়ে তুলছিলেন, তা হঠাৎ ভেঙে পড়ল।

দেখা গেল, পাই-মেসন বিশ্বের একেবারে শেষ সীমা। তার স্থিতি-ভরের

অস্তিত্ব আছে বলে সে হল পদার্থ, আবার তার ঘূর্ণন শূন্য হওয়ায় সে হল ক্ষেত্রের প্রতিমূর্তি।

এই বিষয়ে একটুখানি ভেবে দেখা যাক। বক্তব্য হল, কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার উত্থানের পর বিজ্ঞানীরা পদার্থকণা ও ক্ষেত্র-কোয়াণ্টামের মধ্যে আরো একটি গভীর পার্থক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পার্থক্যটি হল ঘূর্ণন সংক্রান্ত। দেখা গেল, পদার্থের 'বিশুদ্ধ' কণাগুলির ঘূর্ণন প্লাঙ্কের ধ্রুবক h-এর অর্ধেকের সমানই (আরো সঠিকভাবে $h/4\pi$) কেবল হতে পারে; ক্ষেত্র-কোয়াণ্টামগুলির ঘূর্ণনকে হতে হবে শূন্য বা প্লাঙ্কের ধ্রুবকের ($h/2\pi$) কোন পূর্ণ সংখ্যার সমান।

কণা ও কোয়াণ্টামের অস্তিত্বের মধ্যে এই প্রগাঢ় পার্থক্য কেন ঘূর্ণনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, তার যথেষ্ট কারণ আছে। দেখা গেছল, ক্ষুদ্র এককগুলির আচরণের উপর ঘূর্ণনের পরিমাণের একটি মূলগত প্রভাব আছে।

পাউলির নীতি স্মরণ করুন; ঐ নীতি অনুযায়ী কোন সমষ্টির মধ্যে কোন দুটি ইলেকট্রনই একেবারে এক অবস্থায় থাকতে পারে না। এ কেবল ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, প্রোটন, নিউট্রন ও সাধারণভাবে অর্ধ-ঘূর্ণনযুক্ত যে কোন কণার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এখন যে সব কণার ঘূর্ণন শূন্য বা কোন পূর্ণ সংখ্যা, তাদের ক্ষেত্রে এই নীতিটি অচল। উদাহরণস্বরূপ, ফোটনের জগতে (বলতে গেলে সমগ্র বিশ্বে) একই অবস্থায় যে সব ফোটন আছে, অর্থাৎ যে সব ফোটনের স্পন্দনসংখ্যা সমান ও যাদের ঘূর্ণনের দিক্ অবিভিন্ন (ফোটনের ঘূর্ণন হল এক), তাদের সংখ্যা যে কোন কিছু হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ঘূর্ণনের এই বিভাগ থেকে বোঝা গেছল, পদার্থ-বিজ্ঞানীরা প্রথমে যে মিউ-মেসনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের তা কোয়াণ্টাম হতে পারে না। মিউ-মেসন অর্ধ-ঘূর্ণনযুক্ত। কিন্তু সব পাই-মেসনেরই ঘূর্ণন শূন্য, এবং সেজন্য তারা ক্ষেত্র-কোয়াণ্টাম হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে তাদের স্থিতি-ভর যে অস্তিত্ববিহীন নয়!……

॥ দু'মুখো পাই-মেসন ॥

পদার্থবিজ্ঞানীদের নিকট এটি বাস্তবিকই এক বিরাট বিস্ময়। আসুন, একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক।

কেবল হয়তো একটি প্রোটন ও একটি পাই-মেসন সঙ্কুচিত হয়ে একত্র থাকলে তাই হয়ে যায় নিউট্রন। না, সরল পাটীগণিত থেকেই আমরা নিঃসন্দেহ হব যে, তা হয় না : নিউট্রন ও প্রোটনের স্থিতি ভর যথাক্রমে 1839 ও 1836 ইলেকট্রন ভরের সমান, কিন্তু বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত পাই-মেসনের স্থিতি ভর হল 273। অর্থাৎ একটি নিউট্রন থেকে যখন একটি পাই-মেসন বেরিয়ে আসে, তখন নিউট্রনটির উচিত 273 ইলেকট্রন ভর কমে যাওয়া — ওটি যে 3 ইলেকট্রন ভর কমে যায় — সেরকম হওয়ার কথা নয়।

একটি মুক্ত নিউট্রন যখন ভেঙে যায়, এ সমস্যা তখন দেখা দেয় না। নিউট্রনটি একটা ইলেকট্রন — এক ইলেকট্রন-ভর — হারায়। তাছাড়া ইলেকট্রনের যথার্থ শক্তির দ্বিগুণ শক্তি সে ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোকে দিয়ে দেয় ; তারপর তার ভর হয় প্রোটনের ভরের সমান। এখন একটি পাই-মেসন বেরিয়ে গেলে নিউট্রনটি প্রায় একশো গুণ বেশি ভর হারিয়ে ফেলে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ আমরা তা লক্ষ্য করি না। পাই-মেসনের জন্মের পর নিউট্রন ক্ষয়ে গিয়ে হ্রাস পেয়েছে, এটা কেউ কখনো পর্যবেক্ষণ করেন নি। তা কী করে হতে পারে ?

কিন্তু নিম্নলিখিত চিত্রটি কল্পনা করুন। একটি নিউট্রন তার নিজের মধ্য থেকে ঋণাত্মক আধানযুক্ত একটা মেসনকে টেনে নিয়ে একটি প্রোটনের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ; প্রোটন সেটিকে লুফে নিয়ে তৎক্ষণাৎ নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। যে নিউট্রন মেসনকে ছুঁড়ে দিল, সে একটি হাল্কা প্রোটন হয়ে গেল, আর যে প্রোটন মেসনকে ধরে ফেলল, সে হয়ে গেল একটি ভারী নিউট্রন। সঙ্গে সঙ্গেই ভারী নিউট্রনটি মেসনকে বার করে দিয়ে আবার স্বাভাবিক প্রোটনে পর্যবসিত হয়, আর হাল্কা প্রোটনটি এই মেসনকে তুলে নিয়ে পরিণত হয় স্বাভাবিক নিউট্রনে। এই বল খেলাটির দুটি অসমান

পর্যায় — পদার্থবিদ্যার সমস্ত জ্ঞাত নিয়ম অনুযায়ী প্রথম পর্যায়টি নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ, দ্বিতীয়টির সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে।

নিষেধের কারণ হচ্ছে, কোন কণার ভর তার স্থিতি-ভরের থেকে কম হতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিকের থেকে অল্পতর ওজনের একটি প্রোটনকে আমরা পাচ্ছি। অন্যভাবে বলা চলে : 3 ইলেকট্রন ভরের থেকে বেশি ভারী বলকে নিউট্রন ছুঁড়ে বার করে দিতে পারে না। একটি মেসনকে বার করে দিতে হলে নিউট্রনকে তার নিজের মধ্যে কোথাও 270 ইলেকট্রন ভরের সমতুল্য — অর্থাৎ বেশ অনেকখানি — ভরকে খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু শক্তি সংরক্ষণের নিয়মকে এতে সোজাসুজি লঙ্ঘন করা হয়। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, বল খেলাটিতে শক্তি সংরক্ষণের নিয়মকে অবজ্ঞা করা হয় না ; কিন্তু খেলাটির প্রথম পর্যায়ে মনে হয় ঐ অবজ্ঞা রয়েছে।

যখন এটি ঘটতে দেখা গেল, তখন পদার্থবিজ্ঞানীরা যে ধারণা গ্রহণ করতে উৎসুক হলেন, তা বাস্তবিকই একটি মন্দ ধারণা ; সে ধারণা হল, শক্তি সংরক্ষণের নিয়ম ক্ষুদ্রের জগতে কেবল গড়পড়তা হিসাবে প্রযোজ্য, স্বতন্ত্র ঘটনার ক্ষেত্রে নিয়মটি ভেঙে পড়তে পারে। যাহোক, বিজ্ঞানের পরবর্তী ক্রমবিকাশ থেকে দেখা গেল, ঐ নিয়ম শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। বল খেলাটির গোপন তত্ত্ব সনাতনী পদার্থবিদ্যার কাছে রহস্য হয়ে রয়ে গেছে।

যাই হোক, আমরা যে মুহূর্তে স্মরণ করি যে, কণার কোয়াণ্টাম ধর্ম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি, তখনই কুয়াশার অবগুণ্ঠন খুলে যায়। সনাতনী পদার্থবিদ্যার বিধি অনুযায়ী যে সব প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ, পদার্থবিজ্ঞানীরা তাদের নামকরণ করেছেন অলীক (virtual) প্রক্রিয়া।

কণার কোন সমষ্টি বা কোন একটি কণা অন্য সমষ্টি বা অন্য কণায় নানা-পথে রূপান্তরিত হতে পারে। এই সব পথ হয়তো আমরা জানি না (বাস্তবক্ষেত্রে প্রায়ই তা ঘটে), কিন্তু যে মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াগুলি আজ হিসাবের গণ্ডীর মধ্যে রয়েছে, তাদের সাহায্যে ঐ রূপান্তরকে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যদি আমরা বর্ণনা করি, তাহলে সেটা অন্যায় হবে না। এখনকার মত অলীক প্রক্রিয়াগুলি হল সুবিধাজনক চিত্রণযোগ্য সব ধারণা।

আর একটি প্রশ্ন : হাইড্রোজেন অণুতে যে ভাবে ইলেকট্রনের বিনিময়

হয়, প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে সেইভাবে কি মেসনের বিনিময় চলতে পারে? এ ধরণের বিনিময় অনেকখানি সরল, কারণ ইলেকট্রনের কোনরকম রূপান্তর না হলেও পরমাণুদের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। একটি ঋণাত্মক পাই-মেসন হয়তো দুটি প্রোটনের চতুর্দিকে আবর্তন করে।

না, এতে মোটেই চলবে না; কেন চলবে না, এখন বলছি। পারমাণবিক পুঞ্জের মধ্যে একটি ইলেকট্রনের স্থলে একটি মিউ-মেসনকে সংলগ্ন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি সাফল্য লাভ করেছেন; মিউ-মেসনটি ইলেকট্রনের মতই সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করল। একটা ফল হল এই: হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুকে যোগ করে (ঠিক ইলেকট্রনের মতই) মিউ-মেসন গড়ে তুলল একটি অণু — হাইড্রোজেনের তথাকথিত মেসন-অণু (mesomolecule), মিউ-মেসন ইলেকট্রনের থেকে প্রায় দু'শো গুণ বেশি ভারী বলে এর সম্ভাব্যতার পুঞ্জ রইল ঠিক ঐ পরিমাণে কেন্দ্রকের সন্নিকটে, অর্থাৎ দুটি পরমাণুকে একত্র ধরে রেখে মিউ-মেসন যে অণুর সৃষ্টি করল, আকারে তা 200 গুণ ছোট।

যাহোক, এটা কিন্তু পাই-মেসন নয়, মিউ-মেসন। আবার মেসন-অণুর মধ্যে যে সব বল কার্যকর, সেগুলি কেন্দ্রকীয় বল নয়, বৈদ্যুতিক বল।

পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের মত পাই-মেসন তার স্থান অধিকার করে রাখতে পারে না, কারণ কেন্দ্রকে এবং তার মধ্যে শক্তিশালী ও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। এখানে বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পাই-মেসন নিউট্রনকে প্রোটনে ও প্রোটনকে নিউট্রনে রূপান্তরিত করতে পারে।

॥ মেসন বিনিময় রহস্যের একটি চাবিকাঠি ॥

পাই-মেসন যে কেন্দ্রকীয় কণাদের মধ্যে বিচরণ করে, সেটা আমরা ধরে নিতে পারি। তবে এই বিচরণ কণাদের চতুর্দিকে নয়, তাদের ভিতরে — কোন কণা কর্তৃক মেসনের নিঃসারণ ও অন্য একটি কণা কর্তৃক সেটিকে গ্রহণ, এইভাবে ঐ বিচরণ ঘটে থাকে। কিন্তু নিঃসারণ ও গ্রহণের এ সব প্রক্রিয়া আমাদের সদ্য বর্ণিত নিয়মগুলির বিরোধী। তবুও ঐসব প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে। ওগুলি অলীকভাবে সম্পন্ন হতে থাকে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অলীক প্রক্রিয়া নতুন নয়। ক্ষুদ্র কণা কীভাবে বিভবের বাধা ভেদ করে, তা স্মরণ করুন। সনাতনী তত্ত্ব অনুযায়ী কোন বাধার বাইরের দিকে কণার উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে, কণাটি বাধার উপর দিয়ে পার হয়েছে। অথচ, আদৌ কোন শক্তি লাভ না করেই কুয়ার ভিতরের কণা যে বাইরে যেতে পারে, তার সম্ভাব্যতা শ্রোয়েডিংগারের সূত্র থেকে দেখা গেল। এ ঘটনাটিকেও শক্তি সংরক্ষণের নিয়মের বিরোধী বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বাধাটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিক্রম করতে হলে কণাকে তার নিজের মধ্য থেকে শক্তি আহরণ করতে হবে এবং পরে সেই শক্তিকে হতে হবে অদৃশ্য।

ক্ষুদ্র কণার তরঙ্গধর্মের আবাহন করে আমরা ইতিপূর্বে ঐ আপাতঃ অসম্ভব ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করেছিলাম। সেটা আবার সংক্ষেপে স্মরণ করা যাক।

হাইসেনবার্গের সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক কণার গতীয় শক্তি ও স্থৈতিক শক্তি, উভয়েরই পরিমানের পরিমাপের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা আছে। কোন কণাকে বাধা ভেদ করার সময় ধরে ফেলার অর্থাৎ বাধার মধ্যে তাকে দেখার কোনরকম চেষ্টা করলে সেই কণার শক্তি অনির্দেশ্য হয়ে যায়। ফলে সেই শক্তি এমন হয়ে ওঠে যে, কণাটি সনাতনী নিয়ম মতেই বাধার উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে।

সঠিকভাবে বলতে গেলে, সনাতনী মতে শক্তি সংরক্ষণের নিয়ম এখানে ভঙ্গ হচ্ছে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দেখায় যে, নিয়মটির কোন লঙ্ঘন হয়নি।

ঠিক সেইভাবেই কেন্দ্রকীয় কণা কর্তৃক পাই-মেসনের নিঃসারণ ও শোষণকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। বক্তব্য হল, হাইসেনবার্গ সূত্র (শক্তি ও সময় সংক্রান্ত সূত্রটি) কণার যথার্থ শক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাহলে, যে নিউট্রন থেকে একটি ঋণাত্মক পাই-মেসন নির্গত হয়েছে, তার হ্রাসপ্রাপ্তি অথবা ধনাত্মক একটি পাই-মেসন ত্যাগ করায় প্রোটনের ক্ষতি, মেসন-শোষনকারী কণাসমূহের 'স্থূলতা', এ সমস্তকে ঐ সব কণার যথার্থ শক্তির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনিশ্চয়তা হিসাবে মনে করা যেতে পারে; এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কণাদের ভরেরও একটি নির্দিষ্ট অনিশ্চয়তা।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই অনিশ্চয়তা পাই-মেসনের যথার্থ শক্তির থেকে পরিমাণে কম নয় ; সেই শক্তি হচ্ছে $\Delta E = m_\pi c^2$ যেখানে m_π পাই-মেসনের স্থিতি ভর। শক্তির মধ্যে এই অনিশ্চয়তা কতক্ষণ থাকতে পারে বা অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে 'বল খেলার' সম্পূর্ণ চক্রটি কতক্ষণব্যাপী, সূত্রটি থেকে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক।

হাইসেনবার্গের সূত্রটি

$$\Delta E \times \Delta t \backsim h,$$

তা থেকে আমরা পাই

$$\Delta t \backsim h/m_\pi c^2$$

পাই-মেসনের ভর m_π, প্লাঙ্কের ধ্রুবক h ও আলোর বেগ c-কে এই সূত্রে বসিয়ে দিলে আমরা পাই $\Delta t \backsim 10^{-23}$ সেকেণ্ড।

বেশ সংক্ষিপ্ত সময়! এই সময়ে পাই-মেসন কতটা দূরত্বে যেতে পারে? স্পষ্টতই একটা সীমা আছে : আলোর বেগের থেকে কেবল কমই হতে পারে পাই-মেসনের বেগ। সুতরাং যে কেন্দ্রকীয় কণা থেকে পাই-মেসন নির্গত হয়, তার দূরত্বের সীমা হচ্ছে $R = c \times \Delta t \backsim 10^{-13}$ সেন্টিমিটার। কিন্তু পরিমানের ক্রম হিসাবে এটা কেন্দ্রকীয় বলের দূরত্ব সীমার সঙ্গে মিলে যায়। আশ্চর্য! আমাদের যুক্তি এতে সমর্থিত হল।

অতএব, বিভবের বাধার নিচে দিয়ে ইলেকট্রনের যাত্রার সময় যে কারণে তাকে আমরা ধরতে পারি না, সেই একই কারণে কেন্দ্রকীয় কণা থেকে পাই-মেসনের 'নিয়মবিহীন' নির্গমন ও অন্য কণা কর্তৃক ঐরকম 'নিয়মবিহীন' শোষণের সময় তাকে ধরতে পারা সম্ভব নয়। যে মুহূর্তে আমরা আমাদের মানসিক পরিমাপক যন্ত্রকে সক্রিয় করি, তৎক্ষণাৎ তা (পাই-মেসনের বিনিময়ে অংশগ্রহণকারী) প্রোটন ও নিউট্রনের শক্তিকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেয় যে, বিনিময় সনাতনী পদ্ধতিতেই সম্ভব হয়ে ওঠে।

আবার অলীক প্রক্রিয়ার পিছনে রয়েছে ক্ষুদ্র কণাদের তরঙ্গধর্ম। কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের কোয়াণ্টামের (পাই-মেসনের) স্থিতি-ভর শূন্য নয় বলেই কেন্দ্রকীয় বলের কর্মক্ষেত্রের পরিসর সীমিত।

কেন্দ্রকের ভিতর কর্তব্যরত অবস্থাতেই কেবল পাই-মেসনের স্থায়িত্ব দেখতে পাওয়া যায়। মুক্ত অবস্থায় এই কণাটির আচরণ সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। একবার কেন্দ্রকের বাইরে এলে পাই-মেসন অত্যল্প সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ঐ সময় এক সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগের মত। ধনাত্মক পাই-মেসন ধনাত্মক মিউ-মেসনে রূপান্তরিত হয়, ঋণাত্মক পাই-মেসন রূপান্তরিত হয় একই চিহ্নের আধানযুক্ত মিউ-মেসনে। ক্ষয়কালে একটি নিউট্রিনো নির্গত হয়।

কিছুকাল পরে একটি তৃতীয় পাই-মেসন আবিষ্কৃত হল — কণাটি বৈদ্যুতিক-ভাবে নিরপেক্ষ। এর আধানযুক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের তুলনায় এই মেসনটির ক্ষয়প্রাপ্তি একশো কোটি গুণ দ্রুততর। এর মৃত্যুতে গামা-রশ্মির দুটি ফোটনের জন্ম হয়; ইলেকট্রন-পজিট্রন সংঘর্ষে যে ফোটনের সৃষ্টি হয়, তাদের থেকে এদের শক্তি কিন্তু বহুগুণে বেশি।

পাই-মেসনের এই স্থায়িত্বহীনতার জন্যেই ফোটনের থেকে এরা এত পৃথক। ফোটনের শক্তির পরিবর্তন হতে পারে এবং কণাকে তার শক্তি দান করে সে কণার মধ্যে একেবারে বিলীনও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের কখনো ক্ষয় হয় না। ফোটন ভেঙে গিয়ে ক্ষুদ্রতর 'ফোটন-কণা'র সৃষ্টি হয়েছে, যাদের শক্তি পূর্বতনদের শক্তির থেকে স্বল্প — এমন ঘটনা কেউ কখনো পর্যবেক্ষণ করেন নি।

ক্ষেত্র ও পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্কের যে সুন্দর চিত্রটি পদার্থবিজ্ঞানীরা অঙ্কন করছিলেন, এই পাই-মেসন তাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। কণা ও কোয়ান্টামের সবথেকে বড় দু'মুখো সঙ্কর এখনো পর্যন্ত নিশ্চয়ই পাই-মেসন।

॥ পারস্পরিক ক্রিয়ার গোপন তত্ত্ব ॥

বিজ্ঞানের আজ যতগুলি ক্ষেত্র জানা আছে, তাদের মধ্যে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রকেই সবথেকে বেশি অধ্যয়ন করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের বিষয় আমরা অনেক কিছু জানি। স্থিতিশীল ও গতিশীল, দু'প্রকার আধানের দ্বারাই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, চৌম্বক ক্ষেত্রের

সৃষ্টি হয় কেবল গতিশীল আধানের দ্বারা। যেহেতু আধানযুক্ত কণার প্রত্যেকটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গতির সঙ্গে জড়িত ও গতির মধ্যে প্রকাশিত, সেজন্য সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত হয়েছে মিশ্রিত বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র।

সারল্য বিধানের জন্য চুম্বকক্ষেত্রকে যৎসামান্য কাল অগ্রাহ্য করে বৈদ্যুতিক (আরো সঠিকভাবে, স্থির-বৈদ্যুতিক) ক্ষেত্রে অধিকতর মনোনিবেশ করা যাক। স্কুলে পড়বার সময় থেকে আমাদের স্মরণ আছে, সম আধানরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিষম আধানরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পাঠ্যপুস্তকে রহস্যটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল: বৈদ্যুতিক আধান তার চতুর্দিকে একটি ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে; ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে কোন সম আধান এলে ক্ষেত্রটি তাকে বিকর্ষণ করে, কোন বিষম আধান এলে তাকে আকর্ষণ করে।

এটা কোন ব্যাখ্যাই নয়। একজন লোক মরে গেল কেননা কোন একটা জীবনী শক্তি তাকে ত্যাগ করল, একথা বললে যা দাঁড়ায়, এই ব্যাখ্যাটা তার চেয়ে ভাল কিছু নয়।

স্কুলে 'বল' শব্দটি 'ক্ষেত্র' শব্দটিতে পরিবর্তিত হয়। নতুন শব্দটিকে উপস্থিত করা হয়, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয় না। ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও (তীব্রতা, বলরেখা ইত্যাদি) জানানো হয়, কিন্তু আর কিছু বলা হয় না।

বস্তুতঃ, সনাতনী পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্রের ধারণাকে উপস্থিত করলেও তার কোন বিশেষ, সঠিক অর্থ করতে সমর্থ হয় নি। ক্ষেত্রকে এত জটিল হতে দেখা গেল যে, আজও এর অনেকখানি পদার্থবিজ্ঞানীদের নাগালের বাইরে।

কিন্তু কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এখানে বেশ লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হয়েছে। ঠিক কী এ করেছে, সেটা দেখা যাক।

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক — এই দু'ধরণের বৈদ্যুতিক আধান পদার্থবিদ্যার জানা আছে। প্রোটনের আধান ধনাত্মক, ইলেকট্রনের ঋণাত্মক। শুধু এইগুলি (ও এদের বিপরীত কণাদ্বয়) আধানের একেবারে স্থায়ী বাহক। আমরা এখন ইলেকট্রনের বিষয় আলোচনা করব। প্রোটনকে আরো জটিল বলে মনে হয়; এর কথা পরে আলোচনা করা হবে।

বোঝা যাচ্ছে, সমস্ত ঋণাত্মক আধান ইলেকট্রনের। দুটি ইলেকট্রনকে

নিয়ে তারা কীভাবে লড়াই করে দেখা যাক। প্রথমত, পরস্পর কোথায় আছে, সেটা তাদের 'জেনে' নিতে হবে।

প্রথমে যে চিন্তার উদয় হয়, তা হল : সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে — তা তারা যতই বড় বা ছোট হোক — আইনস্টাইনের যে মত, সেই মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি ইলেকট্রন তার চতুর্দিকের স্থানকে বক্রাকৃতি করে তুলবে। তখন ইলেকট্রন দুটির যে কোনটি অপরটির নিকট বক্র রেখার গতি লাভ করবে — একটি কাগজখণ্ডের উপর একটা বল স্থির হয়ে থাকলে সেই টোল-খাওয়া কাগজের উপর দিয়ে ঠিক যেভাবে আর একটি বল গড়িয়ে যায়।

যাহোক, এ বক্রতা ভরের জন্য, আধানের জন্য নয়। সুতরাং একটি পৃথক ক্ষেত্র — মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র — পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় চিন্তা : ইলেকট্রন তার নিকটস্থ শূন্যতার সমজাতিকত্বকে নষ্ট করে দেয়, কারণ যে সব ইলেকট্রন এখনো উৎপন্ন হয় নি, সেইগুলি দিয়ে পূর্ণ শূন্যতার কথা মনে করলে আমাদের 'শূন্যতার' উপরের ইলেকট্রন শূন্যতার ইলেকট্রনগুলিকে বিকর্ষণ করবে। আমাদের ইলেকট্রন যখন একটি সঙ্গী লাভ করে, তখন সেও একই ভাবে শূন্যতার উপর ক্রিয়াশীল হবে।

কিন্তু বাস্তব ইলেকট্রন ও শূন্যতার ইলেকট্রনগুলির বিকর্ষণ পারস্পরিক। দ্বিতীয় ইলেকট্রনটির সম্বন্ধে শূন্যতার ইলেকট্রনগুলির আচরণ একই ধরণের হবে। আমাদের ইলেকট্রন দুটির পারস্পরিক বিকর্ষণের মধ্যে এই আচরণ প্রকাশ পাবে।

যাহোক, এ বিষয়ে যদি আমরা ভেবে দেখি, এ যুক্তিকে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। আমরা বিকর্ষণকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি, অথচ বাস্তব ইলেকট্রন ও শূন্যতার ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই আমরা তাকে উপস্থিত করেছি। ঘোড়ার বদল হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা এখনো দাঁড়িয়েই আছি।

এটা ঠিক বটে, তবে শূন্যতার মাধ্যমে কণার পারস্পরিক ক্রিয়ার ধারণাটি ফলবন্ত। আমাদের কেবল যা স্বীকার করে নিতে হবে, তা হল — ইলেকট্রন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফোটনের নিঃসরণ ঘটাতে পারে।

ইলেকট্রন থেকে ফোটনের নিঃসরণ হতে পারে। পারমাণবিক পুঞ্জে ইলেকট্রনের লাফানোর মধ্যে আমরা তা দেখেছি। তবে ঐ প্রক্রিয়ায়

ইলেকট্রনের শক্তির অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল। ঠিকই, কিন্তু মুক্ত ও স্থির কোন ইলেকট্রন যদি একটি ফোটনকে ত্যাগ করে ও সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাকে শোষণ করে নেয়, তাহলে কেমন হয়? তখন ইলেকট্রনের শক্তি একই থাকবে। সনাতনী পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী ঐ প্রক্রিয়াই নিষিদ্ধ। কিন্তু আমরা দেখেছি, কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী ঐরকম সব প্রক্রিয়া ঘটতে পারে, তবে একটি সর্তে: অনিশ্চয়তা সূত্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে।

যে দ্রুততার সঙ্গে ইলেকট্রন ফোটনকে ত্যাগ করে ও তাকে আবার শোষণ করে নেয়, ফোটনের শক্তির উপরই কেবল তার নির্ভর করার কথা। ফোটনের শক্তি যত বেশি, ইলেকট্রন তত দ্রুততর বেগে কার্যটি সম্পন্ন করে।

যাহোক, ফোটন যতক্ষণ ইলেকট্রনের বাইরে থাকে, তার মধ্যে তার জন্মদাতার কাছাকাছি একটু উঁকিঝুঁকি দেওয়ার সময় সে পেয়ে যায়। কাছাকাছি বলতে কতদূর পর্যন্ত বোঝায়? অনন্ত পর্যন্ত। স্মরণ রাখবেন, যে কোন শক্তির ফোটন, এমনকি সবথেকে কম শক্তির ফোটনও ইলেকট্রন থেকে নিঃসারিত হতে পারে, এবং যত দূর কল্পনা করা যায়, তাদের জন্মদাতার নিকট হতে তত দূর পর্যন্তই তারা চলে যেতে পারে। যাহোক, অত্যন্ত নির্দিষ্ট স্পন্দনসংখ্যার ফোটনের কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব ফোটনটির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমপর্যায়ভুক্ত। দৃশ্য আলোর ফোটনের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব এক মাইক্রনের (10^{-3} মিলিমিটার) কোন এক ভগ্নাংশের সমপর্যায়ে পড়ে।

ফোটনরা স্বভাবতই পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় আবদ্ধ থাকে না। অন্য ইলেকট্রন থেকে নিঃসারিত ফোটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ফলে কয়েকটি ফোটন হয়তো তাদের জন্মদাতার কাছে কখনোই ফিরবে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোন সঙ্গী কর্তৃক তারা শোষিত হয়ে যেতে পারে।

এখন মনে হবে যে, এটা শক্তি সংরক্ষণের নিয়মের অলীক লঙ্ঘন নয়, একটি নিশ্চিত লঙ্ঘন। কিন্তু না, তা নয়। ফেরৎ-না-আসা ইলেকট্রনগুলির মধ্যে যে পরিমান শক্তি আছে, ইলেকট্রনের শক্তি সেই পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, এবং ইলেকট্রন ছুটি দূরে সরে যায়। ইলেকট্রনরা পরস্পরের থেকে যত দূরে থাকে, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার শক্তি তত হ্রাস পায়।

এ প্রক্রিয়ায় ফোটন ও ইলেকট্রনের মোট শক্তি অপরিবর্তিত থাকে ; সুরুতে যা ছিল, ঠিক তাই থেকে যায়। কিন্তু দুটি ইলেকট্রনের পারস্পরিক ক্রিয়ার কোন সুরু বা শেষ কখনো অবশ্য থাকে না। পারস্পরিক ক্রিয়াকে চালু করা বা বন্ধ করা বলে কিছু নেই। ইলেকট্রনরা পরস্পরের থেকে যতই দূরে থাক, তাদের মধ্যে সব সময় কোন এক ধরণের পারস্পরিক প্রভাব থেকে যায়।

এ সব সত্ত্বেও উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়। ক্ষেত্র কোন এক ভাবে তার স্রষ্টার সঙ্গে সংলগ্ন, কিন্তু আমরা জানি যে, ফোটনরা অত্যন্ত রকম স্বাধীন কর্মী।

অবশ্য, আমরা অধিকতর সন্তোষ বিধানের জন্য আর একটি অলীক প্রক্রিয়াকে উপস্থিত করতে পারি। এই প্রক্রিয়ার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ; বাস্তবক্ষেত্রে এর সাক্ষাৎ মেলে। ইলেকট্রন থেকে নিঃসারিত যথেষ্ট শক্তিশালী ফোটন তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অনুমোদিত জীবনকালের মধ্যে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগ্মে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

এইভাবে একটি ইলেকট্রনের স্থলে মুহূর্তের জন্য দুটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনকে পাওয়া যাবে। পরমুহূর্তে ইলেকট্রনটি আবার স্বমূর্তি ধারণ করবে। কিন্তু ইলেকট্রন দুটির মধ্যে কোন্‌টি পজিট্রনের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিলুপ্ত হবে ? সেটা বলা অসম্ভব, কারণ ইলেকট্রন দুটি একেবারে একরকম।

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনা, তবে অতিশয় দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, একটি মাত্র ইলেকট্রন থেকে এই কণা 'গুচ্ছে'র নিঃসরণ আমরা দেখতে পাই না : অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সব কিছু ঘটে যায়।

কিন্তু যাহোক, মিলিয়ে নেওয়া যাক। হাইসেনবার্গের সূত্রের সাহায্যে একটি সরল হিসাব করলে দেখা যায় যে, আমাদের মুহূর্তটির পরমাণু 10^{-21} সেকেণ্ড। এই সময়ের মধ্যে ফোটনটি প্রথম ইলেকট্রন থেকে 10^{-11} সেন্টিমিটার দূরে একটি দ্বিতীয় ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনের এক যুগ্মকে জন্মদান করতে সমর্থ হয়েছে।

এটি হচ্ছে ইলেকট্রনের স্থানে বিস্তারিত হওয়ার ক্ষুদ্রতম দূরত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সঠিক পরিমাণ ; 10^{-11} সেন্টিমিটার হল প্রায় আলোর সমান বেগসম্পন্ন দ্য ব্রগ্‌লি ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য।

একটি সত্যকারের আশ্চর্য ঘটনা। এতে দেখা যায়, ইলেকট্রনের (এবং স্বভাবতই অন্যান্য কণারও) তরঙ্গধর্মের মূলে রয়েছে পারস্পরিক ক্রিয়া — ইলেকট্রনের ক্ষেত্র। ইলেকট্রনের বিস্তারের কারণ — প্রতি সেকেণ্ডে অসংখ্য বার একই স্থানের নিকট সে শূন্যতার মধ্যে বিলীন হয় ও সেখান থেকে নির্গত হয়ে আসে।

এই বিস্ময়কর আচরণের জন্য পদার্থবিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের নামকরণ করেছেন 'কম্পমান ইলেকট্রন'। এ চিত্রকল্পটি অত্যন্ত বাস্তবানুগ। এই প্রক্রিয়ায় কোন ইলেকট্রনের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে যে কোন স্থানে অবস্থিত হয়ে ইলেকট্রনটি দোলায়মান হতে পারে। যে সব ফোটন ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগ্ম সৃষ্টি করতে পারে, তাদের শক্তি ও সেজন্য তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দ্বারা ঐ অঞ্চল নির্ধারিত হয়।

॥ অলীকতার রাজত্ব ॥

অতএব ইলেকট্রন অলীকভাবে ফোটনের নিঃসরণ ঘটায়। ফোটনগুলি আবার অলীকভাবে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগ্মে রূপান্তরিত হয়। যুগ্মগুলি মিশে গিয়ে ফোটনের জন্ম দেয়। এবং ফোটনগুলি ইলেকট্রন কর্তৃক শোষিত হয়। রূপান্তরগুলির বর্ণবৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ আলেখ্যটি অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয় — প্রতি সেকেণ্ডে বহু কোটি কোটি বার।

কোন ইলেকট্রন থেকে নিঃসারিত ফোটনকে অন্য ইলেকট্রন ধরে নিতে পারে। কিন্তু ইলেকট্রনগুলি সবই একরকম, কোন্‌টি যে ঐ ফোটনটিকে আত্মসাৎ করেছে, তা নির্ধারণ করার কোন উপায় নেই।

এখন এই বিনিময়ের ফল অলীক নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। ইলেকট্রনগুলি যতদূর সম্ভব পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে দূরত্ব তাদের 'শূন্যতায় বিস্তারে'র পরিমানের বহুগুণ হলেও ফোটনরা তাদের ধরে ফেলে ও আরো দূরে সরিয়ে দেয়। তবে এই দূরত্ব যত বেশি, তত কম শক্তিশালী ফোটন তাকে অতিক্রম করতে পারে, অর্থাৎ ফোটন বিনিময়ে তত কম শক্তি ইলেকট্রনরা লাভ করে ও ইলেকট্রনের বিকর্ষণ তত দুর্বল হয়ে পড়ে। কুলমের নিয়ম (Coulomb's law) ঠিক এই কথাই বলে।

ইলেকট্রনের পারস্পরিক প্রভাব সর্বব্যাপী। সারল্যের জন্ত আমরা শুধু দুটি ইলেকট্রনের অংশগ্রহণ ধরে নিয়েছিলাম, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের সব ইলেকট্রনই অংশগ্রহণ করে। আমরা বলতে পারি যে, সীমাহীন বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র অনন্ত জগতের সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়।

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের, ইলেকট্রন ও প্রোটনের এবং সাধারণভাবে সব পৃথক আধানযুক্ত কণার পারস্পরিক ক্রিয়া একই অলীক প্রকৃতির। কিন্তু এক্ষেত্রে বিনিময়ের ফল কণাদের পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়, পরস্পরের নিকট এগিয়ে আসা।

প্রকৃতির দুই রূপ। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বিপরীতের ঐক্য এবং ঐক্যবন্ধের বৈপরীত্য, ঐক্যবন্ধের বৈষম্য। বিপরীত আধান ও সমভরযুক্ত দুটি কণা — যাদের দর্পণ-প্রতিবিম্ব বলা হয় — দর্পণ থেকে নির্গত হলে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে, বিলুপ্ত হয় তাদের আধান, রূপান্তরিত হয়ে যায় তারা ক্ষেত্র-কোয়াণ্টামে ; ঐ ক্ষেত্র পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত করে।

॥ অলীক হয়ে যায় বাস্তব ॥

নামকরণের জন্য বিজ্ঞানীরা সকল ক্ষেত্রেই যে সর্বোৎকৃষ্ট শব্দ উদ্ভাবন করেন, তা নয়। 'অলীক' শব্দের অর্থ যা, তথ্যগতভাবে নয়, মর্মগতভাবে, ঠিক বাস্তব নয়। তবু অলীক শূন্যতা হঠাৎ সত্যসত্যই অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।

পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের যে পরিবর্তনের ফলে বর্ণালী উৎপন্ন হয়, তা স্মরণ করুন। আমরা বলেছি, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে এ সব পরিবর্তন তখনই কেবল সম্ভব, যখন ঐ স্তরগুলির ইলেকট্রনদের সম্ভাব্যতার পুঞ্জ কোন স্থানে পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকে।

হাইড্রোজেন পরমাণুতে এরূপ দুটি স্তর আছে, যাদের পুঞ্জ সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত। স্তর দুটিই হল দ্বিতীয় খোল (shell)-এর, লিথিয়ামের ক্ষেত্রেই কেবল সেগুলি পূর্ণ হতে সুরু হয়। তারপর, প্রথম খোলকের জন্য একটি স্তর আছে, সব থেকে নিচের ও সবথেকে স্থায়ী শক্তি-স্তর — হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনকে আমরা সাধারণত সেখানে দেখতে পাই।

(পারমাণবিক গৃহের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার) উভয় স্তরেই আছে গোলাকৃতি পুঞ্জ; তারা কখনই মিশে যায় না। আমরা যে তৃতীয় তলার কথা চিন্তা করছি, তা হল প্রথম ও দ্বিতীয় তলার সংযোগকারী ঐ তলাদের মধ্যবর্তী একটি অসুবিধাজনক ফ্ল্যাট।

কিন্তু লিথিয়ামের ক্ষেত্রে কেবল তলাদের মধ্যবর্তী হিসাবে দেখা দেয়, হাইড্রোজেন পরমাণুতে দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাটের সঙ্গে তা এক হয়ে যায়। লিথিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের যে পরিবর্তন দেখা যাবে, হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তা দেখা দেওয়ার কথা নয়। পারমাণবিক বাসিন্দারা সাধারণত এক তলা থেকে আরেক তলায় সোজাসুজি না গিয়ে প্রথমে তলাদের মধ্যবর্তী ফ্ল্যাটে প্রবেশ করাই পছন্দ করে।

বস্তুতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুতে এ ধরণের পরিবর্তন কেউ কখনো দেখে নি। যদি কোন কারণে প্রথম তলার অধিবাসীকে দ্বিতীয় তলায় তুলে দেওয়া হয়, তাহলে যতক্ষণ না কোন 'আইনবিরুদ্ধ' ব্যবস্থা তাকে ফেরৎ পাঠাচ্ছে (এরূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে নগণ্য), ততক্ষণ সে একেবারে একাই সেখানে থাকবে।

কিন্তু প্রায় পনের বছর আগে পদার্থবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে, এই অত্যন্ত কঠিন নিষেধকে ইলেকট্রন এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে এবং অনেকটা সহজেই দ্বিতীয় তলা থেকে প্রথম তলায় ফিরে এসেছে। প্রায় লিফটে চেপে নিচে নেমে আসার মত।

এই লঙ্ঘনকে শীঘ্রই ব্যাখ্যা করা হল। যার প্রয়োজন ছিল, তা হল শুধু উর্বর কল্পনাশক্তি। আর পদার্থবিজ্ঞানীদের নিশ্চয় কল্পনাশক্তি আছে। যে অলীক প্রক্রিয়ায় বাস্তব ইলেকট্রন শূন্যতার 'অজাত' ইলেকট্রনগুলিকে বিকর্ষণ করে, সেই প্রক্রিয়ার কথা স্মরণ করুন। তখন মনে হয়েছিল যে, ইলেকট্রন তার ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

যা ঘটে, তা হচ্ছে এই। ইলেকট্রন ও শূন্যতার পারস্পরিক ক্রিয়ায় ইলেকট্রনের যে 'কম্পন', তা ইলেকট্রনকে অল্প হলেও অত্যন্ত বাস্তব অতিরিক্ত শক্তি দান করে। হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে দুটি মিশ্রিত স্তরের পৃথকীকরণের পক্ষে এই নগণ্যতম স্বল্প শক্তিই (পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের শক্তির থেকে এ অনেক কম) যথেষ্ট। এর ফলে ইলেকট্রন চলে যায় একটি

স্তর থেকে অন্য স্তরে, দ্বিতীয় তলা থেকে এখনকার বাস্তব মধ্যবর্তী ফ্ল্যাটে ও সেখান থেকে প্রথম তলায়।

সত্য বটে, দ্বিতীয় তলা থেকে মধ্যবর্তী ফ্ল্যাটে পরিবর্তনকেই কেবল বাস্তবক্ষেত্রে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাই যথেষ্ট, কারণ বাকিটা আপনা থেকেই এসে পড়ে।

হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনের শক্তিতে শূন্যতা কী যোগ করল? আমরা যদি প্লাঙ্কের সূত্র ব্যবহার করে তাকে কম্পাঙ্কে রূপান্তরিত করি, তাহলে তা গামা রশ্মি বা দৃশ্য আলোর রশ্মির মধ্যে পড়বে না, পড়বে উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গের স্তবকে।

সেইজন্য এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি প্রচলিত বর্ণালী পদ্ধতিতে আবিষ্কার করতে পারা যায় নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার দোলক যখন প্রস্তুত হল ও হাইড্রোজেন পরমাণুর উপর নিক্ষিপ্ত হল উচ্চ কম্পাঙ্কের কিরণ, তখন শূন্যতার অবদানের উপযোগী কম্পাঙ্কে পরমাণুগুলি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল। হাইড্রোজেনের বেতার বর্ণালীতে এই কম্পাঙ্কস্থলে একটি গভীর অবনমন দেখা দিল — হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন ঐ কম্পাঙ্কের কোয়াণ্টামকে সক্রিয়ভাবে শোষণ করছিল।

অল্প কিছুকাল পরে শূন্যতার একটি দ্বিতীয় ফল আবিষ্কৃত হল। দুটি ইলেকট্রন-চুম্বকের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। তাদের মধ্যে একটির মূলে পরমাণু-কেন্দ্রকের চতুর্দিকে ইলেকট্রনের গতি, অন্যটি ইলেকট্রনের ঘূর্ণন গতি থেকে উদ্ভূত। চুম্বকক্ষেত্রের উপস্থিতিতে এই দুটি চুম্বকের সংযোগে নির্দিষ্ট পরিমাণের এক প্রকারের একটি একীভূত চুম্বক গঠিত হয়।

পদার্থবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এই প্রাথমিক চুম্বকের বলকে পরিমাপ করলেন। দেখা গেল, দুটির একত্র যোগফলের থেকে তা সামান্য একটুখানি বেশি। আবার সেই 'সামান্য একটুখানি'। পদার্থবিজ্ঞানীদের তখন কেবল যা করার ছিল, তা হল এটা স্বীকার করা যে, চুম্বকের পরিমানের বাড়তিটুকুর মূলে ইলেকট্রন ও শূন্যতার পারস্পরিক ক্রিয়া।

আমরা ইতিপূর্বে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, সেইরকমই আবার ব্যাখ্যা। পরমাণুর মধ্যে গতিশীল ইলেকট্রন তার সমস্ত পথ জুড়ে যেন শূন্যতার ইলেকট্রনগুলিকে বিকর্ষণ করে। নিশ্চল জাহাজ যেমন জলকে স্থানান্তরিত

করে, কিন্তু গতিশীল জাহাজ জলকে গতিসম্পন্নও করে দেয়। ইলেকট্রন থেকে শূন্যতায় গতি সঞ্চারের ফলে শূন্যতার মধ্যে তার ইলেকট্রনদের একটি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। বাস্তব ইলেকট্রনের গতি অনুযায়ী যে চৌম্বকত্ব, অলীক বিদ্যুৎ-প্রবাহের চৌম্বকত্ব তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

অলীকতা-পূর্ণ কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এ সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেবল ব্যাখ্যা করতেই নয়, তাদের হিসাব করতেও সমর্থ হল; এবং ফলাফলগুলি পরীক্ষার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে গেল।

অতএব দেখুন, পদার্থবিজ্ঞানীর কেমন কল্পনাশক্তি! সব সত্ত্বেও অলীক প্রক্রিয়াগুলি মান্য করবার মত বিষয়।

॥ নতুন কণার সন্ধানে ॥

ক্ষুদ্র কণার জগতের অস্বাভাবিক চরিত্র এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ও ক্ষেত্রের সঙ্গে তাদের আন্তঃসম্পর্কগুলি পদার্থবিজ্ঞানীরা যখনই স্বীকার করে নিলেন, তখনই নতুন কণার জন্য প্রকৃত অনুসন্ধান সুরু হল। প্রতিটি নতুন কণা ক্ষুদ্রের জগতের এক একটি নতুন দিক, ঐ জগতের বৈশিষ্ট্যসমূহের নতুন আবিষ্কার, জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া।

জটিল সাজসজ্জা, উপকরণ ও যন্ত্রাদির সাহায্যে পূর্ণ অভিযান সব সুরু হল। অনেকদিন পর্যন্ত নতুন কণার একমাত্র যোগানদার ছিল মহাজাগতিক রশ্মি — মহাকাশের গভীর থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছানো কণার ধারা। নতুন যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হল, পুরণো যন্ত্রাদি মার্জিত করা হল, নতুন অভিযান চলল পাহাড়ের চূড়ায় — আকাশের আরো কাছাকাছি পরিষ্কার বায়ুর মধ্যে অভিযান। অন্যান্য অভিযান চালানো হল সাগরের বুকে। আবার এমনও অভিযান ছিল, যাতে রকেটকে নতুন উচ্চতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফলপ্রাপ্তি ঘটল সহস্রধারায়, প্রতি বছরই বহু নতুন কণার আবিষ্কার হতে লাগল।

প্রথম প্রতিক্রিয়া ঘটল তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের উপর। তাঁরা সত্য সত্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন, কারণ তাঁরা বললেন, এতগুলি বিভিন্ন কণা হতেই পারে না। পরীক্ষকগণ অতিরিক্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁদের ফলাফলের

পুনর্বিচার করলেন। তখন 'নতুন' কণাগুলি এক এক করে অন্তর্হিত হতে লাগল—রঙ্গমঞ্চে যেমন তারা আবির্ভূত হয়েছিল, তার থেকেও দ্রুততর হল তাদের অন্তর্ধান।

• তবু যা লাভ করা গেল, তা মনকে নাড়া দেওয়ার মত। পাই-মেসন এসেছিল সর্বপ্রথম। পঞ্চাশের দশকের সুরুতে এমন সব কণা আবিষ্কৃত হল, প্রোটন ও নিউট্রনের থেকেও যারা ভারী; তাদের বলা হয় হাইপেরন। মহাজাগতিক রশ্মি পদার্থবিজ্ঞানীদের উপহার দিল অত্যন্ত মূল্যবান এক সম্পদ — কে-মেসনের একটি গোষ্ঠী (এটা এত মূল্যবান কেন, আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারব)।

যখন বিশালকায় ত্বরণ-সৃষ্টিকারক যন্ত্র সব একের পর এক সক্রিয় হয়ে প্রোটনকে প্রায় আলোর সমান গতিসম্পন্ন করে তুলল, তখন এমন দুটি নতুন কণা আবিষ্কৃত হল, যাদের মধ্যে ডিরাকের তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন পাওয়া গেল। কণা দুটি হচ্ছে বিপরীত প্রোটন ও বিপরীত-নিউট্রন।

আজ ক্ষুদ্র কণাদের সম্পূর্ণ তালিকা সত্যই চিত্তগ্রাহী। প্রায় ত্রিশ (বিভিন্ন) প্রকারের কণা তাছে —,২৫ বছর আগে ছিল মাত্র চার প্রকার। এগুলি সবই অত্যন্ত বাস্তব কণা।

কণার শ্রেণী	নাম	নির্দেশক	ভর (ইলেকট্রন-ভরের হিসাবে)	আধান	ঘূর্ণন (প্লাঙ্কের একক $h/2\pi$-এর হিসাবে)	পরমায়ু (সেকেণ্ডের হিসাবে)	ক্ষয়প্রাপ্তির ধারা
লেপ্‌টন (হাল্‌কা কণা)	ফোটন	γ	0	0	1	স্থায়ী	
	ইলেকট্রন	e^-	1	−1	$\frac{1}{2}$	,,	
	পজিট্রন	e^+	1	+1	$\frac{1}{2}$	,,	
	নিউট্রিনো 1 এবং 2	ν	0	0	$\frac{1}{2}$	,,	
	বিপরীত নিউট্রিনো 1 এবং 2	$\bar{\nu}$	0	0	$\frac{1}{2}$	,,	
	মিউ-ঋণাত্মক-মেসন	μ^-	206·7	−1	$\frac{1}{2}$	$2{\cdot}2 \times 10^{-6}$	$\mu^- \rightarrow e^- + \nu + \bar{\nu}$
	মিউ-ধনাত্মক-মেসন	μ^+	206·7	+1	$\frac{1}{2}$	$2{\cdot}2 \times 10^{-6}$	$\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu + \bar{\nu}$
মেসন (মাঝারি কণা)	পাই-ঋণাত্মক	π^-	273·2	−1	0	$2{\cdot}6 \times 10^{-8}$	$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}$
	পাই-ধনাত্মক	π^+	273·2	+1	0	$2{\cdot}6 \times 10^{-8}$	$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu$
	পাই-শূন্য	π^0	264·2	0	0	$2{\cdot}2 \times 10^{-16}$	$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$
	কে-ঋণাত্মক	K^-	966·5	−1	0	$1{\cdot}2 \times 10^{-8}$	$K^- \rightarrow 2\pi^- + \pi^+$ বা $2\pi^0 + \pi^-$
	কে-ধনাত্মক	K^+	966·5	+1	0	$1{\cdot}2 \times 10^{-8}$	$K^+ \rightarrow 2\pi^+ + \pi^-$ বা $2\pi^0 + \pi^+$
	কে-শূন্য	K^0	974·2	0	0 K_1^0 0 K_2^0	$1{\cdot}0 \times 10^{-10}$ $6{\cdot}1 \times 10^{-8}$	$K_1^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ বা $2\pi^0$ $K_2^0 \rightarrow 3\pi^0$
	বিপরীত-কে-শূন্য	$\bar{K}^0$	974·2	0			

কণার শ্রেণী	নাম	নির্দেশক	(ইলেকট্রন-ভরের হিসাবে)	আধান	(প্লাঙ্কের একক $h/2\pi$-এর হিসাবে)	(সেকেণ্ডের হিসাব)	ক্ষয়প্রাপ্তির ধারা
নিউক্লিয়ন (কেন্দ্রীন কণা)	প্রোটন	p	1,836·12	+1	$\frac{1}{2}$	স্থায়ী	
	বিপরীত-প্রোটন	$\bar{p}$	1,836·12	−1	$\frac{1}{2}$	,,	
	নিউট্রন	n	1,838·5	0	$\frac{1}{2}$	$1·0 \times 10^{3}$	$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}$
	বিপরীত-নিউট্রন	$\bar{n}$	1,838·5	0	$\frac{1}{2}$	$1·0 \times 10^{3}$	$\bar{n} \rightarrow \bar{p} + e^{+} + \nu$
হাইপেরণ (বড় কণা)	ল্যাম্‌ডা-শূন্য	Λ^{0}	2,182·8	0	$\frac{1}{2}$	$2·5 \times 10^{-10}$	$\Lambda^{0} \rightarrow p + \pi^{-}$ বা $n + \pi^{0}$
	বিপরীত-ল্যাম্‌ডা-শূন্য	$\bar{\Lambda}^{0}$	2,182·8	0	$\frac{1}{2}$	$2·5 \times 10^{-10}$	$\bar{\Lambda} \rightarrow \bar{p} + \pi^{+}$ বা $\bar{n} + \pi^{0}$
	সিগ্‌মা-ধনাত্মক	Σ^{+}	2,327·7	+1	$\frac{1}{2}$	$8·1 \times 10^{-11}$	$\Sigma^{+} \rightarrow n + \pi^{+}$ বা $p + \pi^{0}$
	বিপরীত-সিগ্‌মা-ধনাত্মক	$\bar{\Sigma}^{+}$	2,327·7	−1	$\frac{1}{2}$	$8·1 \times 10^{-11}$	$\bar{\Sigma}^{+} \rightarrow \bar{n} + \pi^{-}$ বা $\bar{p} + \pi^{0}$
	সিগ্‌মা-শূন্য	Σ^{0}	2,331·8	0	$\frac{1}{2}$	$<10^{-11}$	$\Sigma^{0} \rightarrow \Lambda^{0} + \gamma$
	বিপরীত-সিগ্‌মা-শূন্য	$\bar{\Sigma}^{0}$	2,331·8	0	$\frac{1}{2}$	$<10^{-11}$	$\bar{\Sigma}^{0} \rightarrow \bar{\Lambda}^{0} + \gamma$
	সিগ্‌মা-ঋনাত্মক	Σ^{-}	2,340·6	−1	$\frac{1}{2}$	$1·6 \times 10^{-10}$	$\Sigma^{-} \rightarrow n + \pi^{-}$
	বিপরীত-সিগ্‌মা-ঋণাত্মক	$\bar{\Sigma}^{-}$	2,340·6	+1	$\frac{1}{2}$	$1·6 \times 10^{-10}$	$\bar{\Sigma}^{-} \rightarrow \bar{n} + \pi^{+}$
	জাই-শূন্য	Ξ^{0}	2,565	0	$\frac{1}{2}$	$1·5 \times 10^{-10}$	$\Xi^{0} \rightarrow \Lambda^{0} + \pi^{0}$
	বিপরীত-জাই-শূন্য	$\bar{\Xi}^{0}$	2,565	0	$\frac{1}{2}$	$1·5 \times 10^{-10}$	$\bar{\Xi}^{0} \rightarrow \bar{\Lambda}^{0} + \pi^{0}$
	জাই-ঋণাত্মক	Ξ^{-}	2,580·2	−1	$\frac{1}{2}$	$1·2 \times 10^{-10}$	$\Xi^{-} \rightarrow \Lambda^{0} + \pi^{-}$
	বিপরীত-জাই-ঋণাত্মক	$\bar{\Xi}^{-}$	2,580·2	+1	$\frac{1}{2}$	$1·2 \times 10^{-10}$	$\bar{\Xi}^{-} \rightarrow \bar{\Lambda}^{0} + \pi^{+}$

← বেরিয়ন (ভারী কণা) →

তালিকার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রথম যা চোখে পড়ে, তা হল ভরের প্রশস্ত পরিসর: ইলেকট্রনের ভর থেকে সুরু করে জাই-হাইপেরনের ভর, যা নাকি ইলেকট্রন-ভরের আড়াই হাজার গুণ। ভর হিসাবে কণাদের বণ্টন কিছুটা অসমান। একই ধরণের ভরের দুই ও তিনটির গোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত।

এখন, আধান ও ঘূর্ণনের মধ্যে বৈচিত্র্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কণার আধানের তিনটি মান সম্ভব (+1, 0, −1, যেখানে ইলেকট্রনের আধান হচ্ছে −1); ঘূর্ণনেরও মান তিনটি (প্লাঙ্কের একক $h/2\pi$-এর হিসাবে 1, ½, 0)। পরিশেষে এই তালিকার অধিকাংশ কণাই অস্থায়ী; তাদের পরমাণু গড়ে সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ (মিউ-মেসন) থেকে সুরু করে সেকেণ্ডের একশো কোটি গুণ ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ (পাই-শূন্য-মেসন) পর্যন্ত। এ দুটি হল পরমায়ুর চরম সীমা। ঐ পরিসরের মধ্যে এমন সব অস্থায়ী কণা আছে, যাদের পরমায়ু সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের একভাগ থেকে হাজার কোটি ভাগের একভাগ পর্যন্ত।

কোন কণার পরমায়ুকে আমাদের জগতে তার অস্তিত্বকালের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলার ভুলটি করবেন না। উদাহরণ হিসাবে পজিট্রনের কথা ধরা যাক। এটা এই অর্থে স্থায়ী যে, এর ক্ষয় হয়ে অন্যান্য কণার সৃষ্টি হয় না। তবু আমাদের জগতে এ বেশিক্ষণ থাকে না — ইলেকট্রনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এটি সাধারণত বিলুপ্ত হয়। অপরপক্ষে পাই-মেসন মুক্ত অবস্থায় অস্থায়ী হলেও কেন্দ্রকের মধ্যে কখনো তার ক্ষয় হয় না।

তালিকাটির শেষ স্তম্ভের দিকে তাকান। কোন্ কণাগুলি তাদের অস্থায়ী সহোদরদের ক্ষয়প্রাপ্তির ফল হিসাবে সবথেকে বেশি দেখা দেয়? মেসন ও নিউট্রনের ক্ষেত্রে এগুলি হল ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো। আর হাই-পেরনের ক্ষয়জনিত ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমরা সবসময় দেখতে পাই নিউ-ক্লিয়ন এবং পাই-মেসনকে।

॥ লব্ধ বস্তুর বিন্যাস ॥

ক্ষুদ্রের জগতের বাসিন্দাদের সংখ্যাগণনা থেকে আমরা উপরি-উক্ত প্রথম প্রারম্ভিক মন্তব্যগুলি করতে পারি। এখন ঐ জগতে কণাদের বাস করার পক্ষে অবস্থা কেমন, সেইটা নির্ণয় করা হচ্ছে সমস্যা।

কণাদের ভরের মধ্যে বিরাট বৈচিত্র্য কেন? সবথেকে বেশি ভর কোন্‌টির? সেটা কি ভাই ঋণাত্মক-হাইপেরন? কণাদের মধ্যে কেন দুই, তিন ও চারিটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ভরের গোষ্ঠী দেখতে পাওয়া যায়? কণাদের আধানের মাত্রা কেন কেবলমাত্র তিনটি ও ঘূর্ণনের দুটি (ফোটনের কথা না ধরে)? অধিকাংশ কণা কেন অস্থায়ী? কেনই বা তাহলে স্থায়ী কণা রয়েছে? ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাব্য অনেকগুলি বিচিত্র ধরার মধ্যে কণারা কেন একটি বা দুটিকে নির্বাচন করে?

আরো এগনোর আগে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এ সব প্রশ্নের অধিকাংশেরই কোন উত্তর দিতে পারে নি। উত্তর যখন পাওয়াও যায়, তাদের বেশির ভাগই 'কেমন করে' তা বর্ণনা করে, কিন্তু 'কেন' তা বলে না। যাহোক, সেটা অন্ততঃ কিছুটা।

ভর হিসাবে গোষ্ঠীর বিভাগ তালিকায় পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোন গোষ্ঠী ও তার পরবর্তী গোষ্ঠীর মধ্যে ভরের যে প্রশস্ত ব্যবধান, তার তুলনায় একই গোষ্ঠীর কণাদের ভর পরস্পরের অত্যন্ত সন্নিকট। এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে চিত্তাকর্ষক উপায়ে: কণার কোন গোষ্ঠী হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটিই কণা — বিভিন্ন ছদ্মবেশে সেটি দেখা দেয়।

উদাহরণ হিসাবে পাই-মেসনের কথা ধরা যাক। পাই-ঋণাত্মক ও পাই-ধনাত্মক মেসনের ভর হচ্ছে সমান এবং তৃতীয়, বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ, পাই-শূন্য মেসনের ভরের থেকে পৃথক। আধানযুক্ত কণা দুটির বৃহত্তর ভর হয়তো তাদের আধান থাকার জন্য।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, কোন কণার ভরের অংশবিশেষের কারণ হল ক্ষেত্র। পাই-মেসন যেহেতু কেন্দ্রীন ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম ও এই ক্ষেত্র বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, সেজন্য এটা মনে করা

যুক্তিসঙ্গত হবে যে, পাই-মেসনের ভরের অধিকাংশই কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের জন্য ; (আধানের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত) বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র এতে যা কিছু যোগ করে, তার কেবল সামান্য অবদান থাকবে। এই কারণে আধানযুক্ত পাই-মেসন নিরপেক্ষ কণাটির থেকে বেশি ভারী ; ঐ নিরপেক্ষ কণার উৎপত্তি স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীন ক্ষেত্র থেকে হওয়া উচিত।

সেইরকম হালকা কণাদের যে ত্রিতয় গঠিত হয় না, তার ব্যাখ্যাও মনে হয় এই থেকে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের পার্থক্য হচ্ছে — এর কোয়ান্টামের স্থিতি-ভর শূন্য নয় ; বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম স্থিতি-ভরবিহীন ফোটন। ইলেকট্রন, পজিট্রন ও উভয় মিউ-মেসনের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র থেকে নয়, বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র থেকে। সেজন্য ওগুলির কোন নিরপেক্ষ কণা নেই। তাহলে দুটি সম্ভাবনা থাকছে : একটি ধনাত্মক ও একটি ঋনাত্মক কণা, একটি দ্বিতয়।

কে-মেসনের ক্ষেত্রে তা কার্যকর নয়। নিরপেক্ষ কে-মেসন আধানযুক্ত কণাদের থেকে বেশি ভারী। এখানে বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রকে কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র থেকে যেন 'বিয়োগ' করা হয়েছে।

সেজন্য পদার্থবিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যাকে শুধু একটি কল্পনা হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। মনে হয়, কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রজাত ও ত্রিতয়বিহীন হাইপেরন-গুলি থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানেও আমরা এখনো কোন ব্যাখ্যা পাই নি।

॥ সক্রিয় বিপরীত-কণা ॥

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত নিউক্লিয়ন গোষ্ঠীতে ছিল শুধু প্রোটন ও নিউট্রন। বেশ একটি জুড়ি হয়েছিল এটি : আধানযুক্ত এক কণা ও এক নিরপেক্ষ কণা দিয়ে গঠিত একটি দ্বিতয়! ঋণাত্মক আধানযুক্ত বিপরীত-প্রোটন আবিষ্কৃত হতে মনে করা গেল যে, সমস্যার সমাধান হয়েছে, কারণ পাই-মেসনের গোষ্ঠীর মত এখানেও এখন একটি স্বাভাবিক ত্রিতয় হল।

এটা ঠিক যে, একটি অসুবিধা রয়ে গেল : নিরপেক্ষ নিউট্রন প্রোটন ও তার বিপরীত-কণার থেকে হালকা নয়, ভারী। কেন্দ্রকের ক্ষেত্র থেকে

বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে আবার 'বিয়োগ' করা হয়েছে বলে মনে হয়। যাহোক, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এই ঘটনা যে, প্রোটন ও নিউট্রনকে একটাই কণার দুটি আকার হিসাবে দেখা গেল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, যখন পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছল, কণা দুটি কেন্দ্রকের মধ্যে সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন পদার্থবিজ্ঞানীরা ঐরকমই আন্দাজ করেছিলেন।

বিপরীত-প্রোটনের আবিষ্কারের এক বছর পরে বিপরীত-নিউট্রনের সন্ধান পাওয়া গেল। এক গোষ্ঠীতে একটি চতুর্থ কণা। বিপরীত-নিউট্রন গোষ্ঠীর ধারার মধ্যে মানিয়ে যেতে চাইল না। তখনো একটা পথ ছিল — নিউক্লিয়ন গোষ্ঠী দুটি যুগ্ম দিয়ে গঠিত বলে ভাবা যেতে পারত: বিপরীত কণাসমেত প্রোটন ও বিপরীত কণাসমেত নিউট্রন; কিন্তু তাহলে প্রোটন ও নিউট্রন হবে একেবারে পৃথক দুটি কণা। এটি একটা দুরূহ সমস্যা এবং আজো এর কোন সমাধান হয়নি — নিউক্লিয়নের চতুষ্টয়ের গোপনীয়তা রহস্যই থেকে গেছে।

এই গোষ্ঠীর মতন রয়েছে চারটি কে-মেসন। সেটা এক বিশেষ আলোচনার বিষয় হবে। পরিশেষে লক্ষণীয় যে, হাইপেরনরা কেবল যুগ্মরূপেই আবির্ভূত হয়।

কণাদের এ গোষ্ঠী গঠনের পিছনে কি কোন নিয়ম আছে? অত্যন্ত সহজেই তা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা তা জানি না। ক্ষুদ্রের জগতের বাসিন্দাদের গণনা করা হয়েছে এবং সে গণনার কাজ শেষ হয়ে গেছে, পেশা হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, কিন্তু কোন চরম মন্তব্যে এখনো পৌঁছনো যায়নি।

এখন, কোন কণা ও তার বিপরীত কণার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। আমরা জানি, ডিরাকের তত্ত্বের মূল আকারে বলা হয়েছিল যে, পার্থক্য হল বৈদ্যুতিক আধানের চিহ্নের মধ্যে; ইলেকট্রন ও পজিট্রন, প্রোটন ও বিপরীত-প্রোটন, মিউ-মেসন দুটি এবং সাধারণভাবে সমস্ত আধানযুক্ত কণার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট সত্য।

কিন্তু নিউট্রন ও বিপরীত-নিউট্রনের ক্ষেত্রে কেমন হবে? এদের কোন বৈদ্যুতিক আধান নেই এবং কণা ও বিপরীত কণার যুগ্মের মত এদের ভরও সমান। এখানে পার্থক্য মনে হয় চুম্বকীয় ভ্রামকের (moment) চরিত্রের মধ্যে।

তাহলে এটাও একটা 'বিপরীত-ধর্ম' হতে পারে? বেশ আমাদের জানা আছে যে, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন দুয়ের জুড়িতে শক্তি-স্তরগুলি অধিকার করতে পারে, অর্থাৎ ঐ দুটির ঘূর্ণন হল বিপরীত, তবু কণাগুলি ইলেকট্রনই থেকে যায়, ওদের একটিও পজিট্রনে পরিবর্তিত হয় না। তাছাড়া, কেন্দ্রকের খোলস-রূপ থেকে আমাদের স্মরণে আসে যে, দুটি করে কেন্দ্রীয় নিউট্রন শক্তি-স্তরগুলি অধিকার করতে পারে, কোন বিপরীত নিউট্রনের জন্ম হয় না।

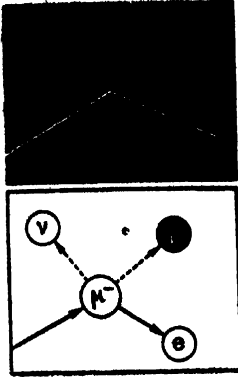
পারমাণবিক ইলেকট্রনদের যুগ্মের মধ্যে ঘূর্ণনের দিক যে বিপরীত, তার কেবল অর্থ হল — ইলেকট্রনরা নিজেরাই বিপরীত দিকে চলমান। 'সম্ভাব্যতার পুঞ্জ' হিসাবে ইলেকট্রনদের চিত্রিত করলে দুটি বিপরীত দিক কল্পনা করা অবশ্য শক্ত। মুক্ত পরমাণুর ক্ষেত্রে তাদের শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক তার গতির দিকের সঙ্গে নিঃসন্দেহে সম্পর্কিত। উদাহরণ হিসাবে, যদি কোন ইলেকট্রন ডান দিকে চলে, আমরা বলতে পারি যে, তার ঘূর্ণন, ধরা যাক, উপরের দিকে কোনো কোণ করে রয়েছে; গতি যদি বাঁ দিকে হয়, কোণ হবে নিচের দিকে। দেখানো যেতে পারে, ইলেকট্রনের বেগ আলোর বেগের সমীপবর্তী হলে তার (angle) ঘূর্ণনের দিক ক্রমশ তার গতির দিকের সন্নিকট হয়ে আসে। পজিট্রনের ক্ষেত্রে অবস্থা একেবারে বিপরীত। অত্যন্ত দ্রুত পজিট্রনের ক্ষেত্রে ঘূর্ণন থাকে গতির দিকের প্রায় বিপরীত দিকে। নিউট্রন ও বিপরীত-নিউট্রনের ক্ষেত্রে চুম্বকীয় ভ্রামকের মধ্যে পার্থক্য বলতে আমরা ঐরকমই বুঝি।

এই ধরণের পার্থক্যে পাঠক হয়তো হতাশ হবেন, কিন্তু কণা ও বিপরীত-কণার সংঘর্ষের ফলে ক্ষেত্র-কোয়াণ্টামে তাদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পক্ষে ঐ পার্থক্যকে যথেষ্ট বলে মনে হয়।

॥ কণার ভগ্নাবস্থা ॥

কণাদের কীভাবে উৎপত্তি ও বিলুপ্তি ঘটে? ক্ষুদ্রের জগতের এই সব ঘটনার প্রথম দর্শক হচ্ছে আলোকচিত্রের ফলক; বিজ্ঞানীদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান ঐ ঘটনাগুলি।

এখানে ফলকের কোণে মিউ-ঋণাত্মক-মেসনের চিহ্নিত একটি প্রশস্ত পথ রয়েছে। ফলকের মাঝখানে পৌঁছনোরও আগে এটা 'ভেঙে গিয়ে' চলে যায় একটি ড্যাশ্‌ চিহ্নিত রেখা ধরে। পথের এই অংশটি একটি ইলেকট্রনের ভেঙে যাওয়ার বিন্দুতে দুটি কণার জন্ম হয়েছিল; মিউ-মেসনের যে শক্তি ও ভরবেগ ইলেকট্রনকে দিয়ে দেওয়া হয়নি, কণাগুলি তা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এই দুটি কণা হল নিউট্রিনো ও বিপরীত-নিউট্রিনো।



চিত্র নং ২৫

পাই-মেসনের ক্ষয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত ইলেকট্রন গঠিত হয় না। তার থেকে প্রথমে উৎপন্ন হয় মিউ-মেসন। এখানেও আমরা দেখি যে, কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র ও বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে পৃথক নয়। কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রজাত একটি কণা বিদ্যুৎচৌম্বক চরিত্রের একটি কণায় রূপান্তরিত হয়।

• পাই-মেসন ভেঙে গিয়ে কেন দুটি কণার ও মিউ-মেসন ভেঙে গিয়ে তিনটি কণার সৃষ্টি হয়? উত্তরটা সহজ: এ সবেরই মূলে ঘূর্ণন। সন্তান কণাদের ঘূর্ণনের যোগফলকে জন্মদাতা কণার ঘূর্ণনের সমান হতে হবে।

মিউ-মেসনের রয়েছে অর্ধ-ঘূর্ণন, ইলেকট্রনেরও তাই। কিন্তু ইলেকট্রন যেহেতু মিউ-মেসনের সম্পূর্ণ ভরকে নিয়ে যেতে পারে না, সেজন্য একটি নিউট্রিনোর প্রয়োজন আছে; ঐ নিউট্রিনো গতিশক্তির আকারে অবশিষ্ট ভরকে গ্রহণ করে। কিন্তু নিউট্রিনোর ঘূর্ণন অর্ধেক হওয়ায় নবজাত কণাদের সর্বসমেত ঘূর্ণন জন্মদাতার ঘূর্ণনের থেকে বেশি। নিউট্রিনোকে তার অতিরিক্ত ঘূর্ণন থেকে মুক্ত হতে হবে। এরি জন্য বিপরীত ঘূর্ণনযুক্ত বিপরীত-নিউট্রিনো। ফলাফল: তিনটি কণা।

পাই-মেসনের ক্ষয়প্রাপ্তিতে জন্মদাতা মিউ-মেসনের ঘূর্ণনের বিপরীত ঘূর্ণনযুক্ত একটি নিউট্রিনো (বা বিপরীত-নিউট্রিনো) যথেষ্ট। এই ঘূর্ণনগুলি

পরস্পরকে বাতিল করে দিলে ঘূর্ণন হয়ে যায় শূন্য — মূল পাই-মেসনের ঘূর্ণনের তা সমান।

হাইপেরনের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষয়ের সর্বশেষ স্থায়ী ফল হয় প্রায়শই প্রোটন। তাছাড়া হাইপেরন থেকে পাই-মেসন নিঃসারিত হয়। দুই জগৎ রূপান্তরের দুই চরম ধরণ : হাল্‌কা কণাদের মধ্যে প্রোটন। দুই জগৎ ও ক্ষয়ের দুই অবশ্যম্ভাবী উপগ্রহ : হাল্‌কা কণার ক্ষেত্রে নিউট্রিনো, ভারী কণার ক্ষেত্রে পাই-মেসন।

এখন, ক্ষয়প্রাপ্তির কয়েকটা ধারার মধ্যে কোন্‌টি (বা বড় জোর কোন্‌ দুটি) ব্যবহার করতে হবে, তা স্থির করে দেবে, এমন কি কোন নিয়ম আছে ?

এ ধরণের নির্বাচনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। সনাতনী পদার্থবিদ্যার সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে তাদের নাম দেওয়া যাক, সংরক্ষণের নিয়ম। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ক্ষয় প্রক্রিয়ায় কোন কণার মোট আধান ও মোট ঘূর্ণন সংরক্ষিত হয়। কিন্তু তাহলেও ক্ষয়ের ধারার নির্বাচনে এই সব আইনের মধ্যে সামান্য শিথিলতা রয়ে গেছে।

অস্থায়ী কণারা যে সব পথ ধরে প্রোটন ও ইলেকট্রনরূপ পদার্থ গঠনের স্থায়ী উপাদানে রূপান্তরিত হতে পারে, সেই পথগুলিকে সঙ্কীর্ণ করবার জন্য ক্ষয় প্রক্রিয়ার অন্যান্য কয়েকটি নিয়ম থাকা উচিত।

॥ পদার্থবিজ্ঞানীদের দ্বারা পারস্পরিক ক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ ॥

একটি উপমা দিয়েই সুরু করা যাক। পাহাড়কে ধ্বংস করার বিভিন্ন উপায় আছে। একটি উপায় হচ্ছে বিস্ফোরণ, যেমন ধরুন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদিগরণ। অন্য একটি, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ধীর, উপায় হল ভূমিকম্পন। পরিশেষে সবথেকে মন্থর উপায় আবহাওয়ার আনুকূল্য — জল, বায়ু, উষ্ণতা ও শৈত্যের সক্রিয়তা। কার্যটি সমাধা করতে বিস্ফোরণের লাগে কয়েক সেকেণ্ড, ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা এবং জল ও বায়ুর কয়েক হাজার বছর।

ক্ষুদ্র কণাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন করে তিন ধরণের প্রক্রিয়া দেখা গেল ; ঐ সব প্রক্রিয়ায় শক্তি বিভিন্ন, গতির হার বিভিন্ন।

প্রথম ও সর্বাধিক শক্তিশালী প্রক্রিয়া হল কেন্দ্রকীয় কণাদের সংঘর্ষ, কেন্দ্রকের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। পদার্থবিজ্ঞানীরা এই সব ঘটনার নামকরণ করলেন সবল পারস্পরিক ক্রিয়া। এদের বৈশিষ্ট্য হল, পাই-মেসনেরই মত রা আয়ো বিকট শক্তি এবং সেই হেতু (অনিশ্চয়তা সুত্র অনুযায়ী) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরমায়ু। আমরা আগেই জেনেছি, এখানে সময়ের পরিমান 10^{-23} সেকেণ্ডের মত।

শক্তি ও স্থায়িত্বে পরবর্তী স্থান বিদ্যুৎচৌম্বক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার। এই প্রক্রিয়াতেই ইলেকট্রন-পজিট্রনের সংঘর্ষে দুটি গামা ফোটনের সৃষ্টি হয়। নিরপেক্ষ পাই-শূন্য মেসনের ক্ষয় হয়ে গামা ফোটনের যে সৃষ্টির কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তাও এই শ্রেণীভুক্ত। প্রক্রিয়াটির স্থায়িত্ব 10^{-17} সেকেণ্ডের মত।

এখন, পরিশেষে, সবথেকে দুর্বল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কথা। পদার্থবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া। ক্ষুদ্র কণাদের তালিকায় যে ক্ষয়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের অধিকতম অংশের জন্যই এই প্রক্রিয়া। মিউ, পাই এবং কে-মেসন, নিউট্রন এবং হাইপেরনের ক্ষয়ের ব্যাখা পাওয়া যায় দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে। তালিকা থেকে দেখা যেতে পারে যে, সব কটি গোষ্ঠীরই কণাগুলির উপর প্রভাবশালী এই 'বিশ্বজনীন' ধ্বংসমূলক পারস্পরিক ক্রিয়াটির স্থায়িত্ব 10^{-10} সেকেণ্ড বা আরো বেশি।

কণাদের গোষ্ঠীগুলির এই সব অধ্যয়নের মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। কে-মেসন ও হাইপেরন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে অন্যান্য কণাদের থেকে পৃথক এক প্রথায়।

এই গোষ্ঠী দুটি অন্যান্য কণাদের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে মানিয়ে যেতে চাইল না। বিজ্ঞানীরা বললেন, "অদ্ভুত," আর বিরক্ত হয়ে এই অবাধ্য বস্তুগুলির তাঁরা নাম দিলেন 'অদ্ভুত কণা'। ঐ কণাদের যে ধর্ম থাকা উচিত ছিল, তাই থেকে তাদের বিচ্যুতির মাত্রাকে পরিমানগতভাবে বর্ণনা করবার জন্য তাঁরা একটি বিশেষ রাশিকে পর্যন্ত উপস্থিত করলেন। এই রাশিটি 'অদ্ভুতত্ব' নামে পরিচিত।

দেখা গেল, মন্থর দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে অদ্ভুত কণারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ কণায় পর্যবসিত হতে পারে না। সাধারণ

কণাদের সংঘর্ষে অদ্ভুত কণারা জন্মলাভ করে কেবল যুগ্মরূপে এবং এমন সব যুগ্মরূপে যে, তাদের অদ্ভুতত্বের যোগফল মূল সাধারণ কণাগুলির মতই শূন্যের সমান।

অন্যভাবে বলতে গেলে, সবল ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অদ্ভুতত্বের পরিবর্তন হয় না। অদ্ভুতত্বের সংরক্ষণের নিয়ম হিসাবে এটি পরিচিত। কিন্তু দুর্বল ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হয় না।

বড় বেশি নিয়ম? সেই একটি মাত্র সাধারণ নিয়ম কোথায়? তাছাড়া, আমরা সবগুলির ব্যাখ্যা করিই বা কীভাবে?

আমরা যে সব নিয়মানুবর্তিতার কথা বলছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের এখনো কোন সুনিশ্চিত ব্যাখ্যা নেই। বিজ্ঞানীরা নানাভাবে এই নিয়মগুলির যোগ-সাধন করেন, কিন্তু গভীর অন্তর্নিহিত সত্যটি এখনো কুহেলিকাচ্ছন্ন। অবশ্য আমরা যে সমস্যা নিয়ে সুরু করেছিলাম, সংরক্ষণ নিয়মগুলির গণিতের সাহায্যে আমরা তার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছি। সব নিয়মগুলি একত্র করলে কণাদের প্রকৃতপক্ষে শুধু একটি — বড় জোর দুটি — ক্ষয়ের ধারা থাকতে পারে।

ক্ষুদ্র কণার পদার্থবিদ্যায় শূন্যতার ফলাফল নির্ণয়ের পর একটি অন্যতম বিরাট আবিষ্কার সম্ভব হল কে-মেসনের ক্ষয়ের অধ্যয়ন থেকে। যে শব্দ কটি বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজে আলোড়ন আনল, সেগুলি হল 'সমতার সংরক্ষণের অভাব'।

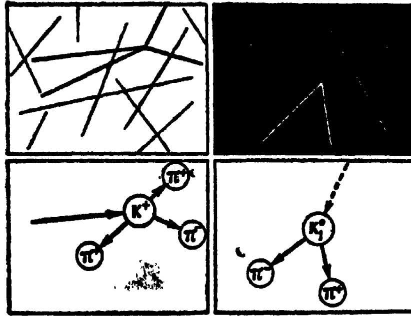
॥ কে-মেসনের রহস্য ॥

প্রায় দশ বছর আগে মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে কে-মেসন আবিষ্কৃত হয়। মহাজাগতিক কণারা আলোকচিত্রের ফলকের উপর যে স্তূপীকৃত অদ্ভুত সব পথরেখার স্বাক্ষর রেখে যায়, তাদের মধ্য থেকে ইলেকট্রন-ভরের প্রায় হাজার গুণ ভর সমন্বিত নতুন কয়েকটি কণার চিহ্ন বিজ্ঞানীদের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ল।

তিন ধরণের কে-মেসন দেখতে পাওয়া গেল: ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও নিরপেক্ষ। ঘূর্ণন নির্ধারিত হল; দেখা গেল, তা শূন্যের সমান। প্রথমে

পাই-মেসনের অপেক্ষাকৃত লঘু পরিবারের থেকে কে-মেসনের পরিবারের (ভর ব্যতীত) বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হল না : একই শূন্য পরিমাণ ঘূর্ণন, কণাসমূহের একই ত্রিত্তয়, নিরপেক্ষ কে-মেসন কেবল তাদের লঘু জাতিদের থেকে অপেক্ষাকৃত ভারী।

কে-মেসনরা আলোকচিত্রের ফলকের উপর যে সব পথরেখা চিহ্নিত করেছিল, বিজ্ঞানীরা সেগুলির সম্যক অনুসন্ধান করলেন। আধানযুক্ত কণারা সাধারণ পথরেখার সৃষ্টি করেছিল ; ঐ রেখাগুলির প্রায়ই ছেদ হয়ে সরু রেখার সূত্রপাত হত। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, কে-মেসন ক্ষয়প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা কণায় পর্যবসিত হয়েছে। গৌণ পথরেখাগুলির অধ্যয়ন থেকে দেখা গেল, সেগুলি পাই-মেসনের।



চিত্র নং ২৬

নিরপেক্ষ কে-মেসনের ক্ষয়প্রাপ্তির ব্যাপারটা আরো কঠিন। কে-মেসনের গতিপথের শেষ বিন্দু থেকে কখনো দুটি ও কখনো তিনটি রেখাকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হলেন। আগের মতই সমস্ত রেখাগুলি পাই-মেসনের।

সুতরাং নিরপেক্ষ কে-মেসন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কখনো তিনটি ও কখনো দুটি পাই-মেসনে পর্যবসিত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য সব কণা সব সময় একই ভাবে ভগ্ন হয়ে একই সন্তান কণার জন্ম দেয়।

পরীক্ষকগণ নিশ্চিত ছিলেন যে, ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারে না ; সেজন্য তাঁরা দুটি বিভিন্ন নিরপেক্ষ কে-মেসনের উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত করলেন।

একটির নাম দেওয়া হল টাও-মেসন, অন্যটির নাম থিটা-মেসন। দুটি পৃথক ক্ষয়ধারার জন্য দুটি স্বতন্ত্র মেসন। ব্যাপারটা যথেষ্ট পরিষ্কার মনে হল।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হলেন না। সর্বাধিক সযত্নে যে সব পরিমাপ করা হল, তা থেকে অনিবার্যভাবে দেখা গেল, টাও-মেসন ও থিটা-মেসনের ভর অভিন্ন। কণার তালিকায় সর্বত্র এর অর্থ সর্বদা একটাই: অভিন্ন কণা। কিন্তু একই কণা নিশ্চয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রথমে দুটি ও পরে তিনটি অভিন্ন সন্তান কণায় পর্যবসিত হতে পারে না।

ঐটি ছিল পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকের রহস্যজনক কণা। সুবিখ্যাত 'টাও-থিটা' প্রহেলিকা।

কিন্তু সব সত্ত্বেও এতে এমন কী বিস্ময়কর আছে? যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কেন সেভাবে কে-মেসনের ক্ষয় হতে পারে না? শক্তি সংরক্ষণের নিয়মে তা নিষিদ্ধ নয়, ভরবেগ ও ঘূর্ণন সংরক্ষণের নিয়মগুলিরও তার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই।

তবু একটি নিয়ম অনুযায়ী তা নিষিদ্ধ; ঐ নিয়মের কথা এখনো আমরা বলি নি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় নিষেধটি প্রমাণিত হয়েছিল; সমতা সংরক্ষণের নিয়ম, এই নামে সেটি পরিচিত।

॥ বাম ও দক্ষিণের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ॥

উত্তেজিত পরমাণু কর্তৃক ফোটনের নিঃসারণ স্মরণ করুন। ইলেকট্রন প্রথমে এক স্তরে ছিল, পরে লাফ দিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির আর একটি স্তরে চলে গেল। সে সময় আমাদের আগ্রহ ছিল শুধু শক্তির বিষয়ে এবং ইলেকট্রনের প্রথম ও শেষ স্তরের 'সম্ভাব্যতার পুঞ্জ' কোথাও মিশে যায় কিনা সেই ঘটনায়।

এই মিশে যাওয়া অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে সমতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। পরমাণুর ভিতরের ফ্ল্যাটগুলিকে যদি আমরা আবার সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করতে পারতাম, তাহলে আমরা দেখতাম যে, বাসিন্দারা কেবল সম থেকে অসম ফ্ল্যাটে ও অসম থেকে সম ফ্ল্যাটে যাতায়াত করতে পারে। অষ্টম ফ্ল্যাট থেকে, ধরুন, এক লাফে দশম ফ্ল্যাটে চলে যাওয়াটা অসম্ভব।

বহুকাল আগে — ১৯২৪ সালে — এই নিয়মটি পরীক্ষাগতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল ; কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী পরে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা তরঙ্গ-অপেক্ষকের সমতার ধারণাটিকে উপস্থিত করলেন। তরঙ্গ-অপেক্ষকে যে অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাইতে অতঃপর সমতার ধারণাকে প্রসারিত করা হল।

আমরা যে তরঙ্গ-অপেক্ষককে জানি, তা শ্রোয়েডিংগার সূত্রের সমাধান। সমতা এখন আরো একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

কত লোকই তো তাদের আলোকচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলে, "আচ্ছা, ওটা কিন্তু মোটেই আমার মত দেখাচ্ছে না।" এবং সেজন্য আলোক-চিত্রকরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু প্রায়ই তাকে প্রকৃতপক্ষে দোষ দেওয়া উচিত নয়।

আয়নার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। যা দেখতে পাচ্ছেন, তা কোন নিখুঁত প্রতিরূপ নয়। আপনার নাক যদি ডান দিকে সামান্য বাঁকা থাকে, আয়নায় তা দেখাবে বাঁ দিকে বাঁকানো। আয়নায় বাম ও দক্ষিণ স্থান পরিবর্তন করে।

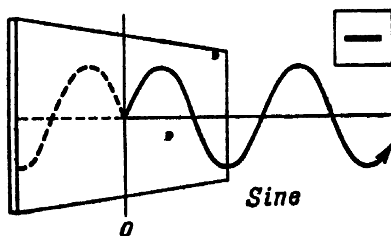
যখন আপনি আপনার ছবি তোলান, ফিল্মের সামনের দিকে আপনার দর্পণ-প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই সব নয়। ফিল্মটি ডেভেলপ করে নেগেটিভ থেকে ছবি তৈরী করা হয় — ওটা প্রকৃতপক্ষে আয়নায় আপনার আর একবার প্রতিফলন। কখনো কখনো ছবি তৈরীর সময় নেগেটিভটি উল্টে যায় ; ফলে তিনবার আয়না থেকে প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ছবি তোলার সময় নেগেটিভটি যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই থেকে যায় এবং তখন শুধু দুবার ঐরূপ প্রতিফলন ঘটে থাকে।

কোন লোককে আয়নায় যে রকম মনে হয়, সে এমনিতেও সবসময় সেই রকম দেখতে। কিন্তু লোকেরা কীভাবে আপনাকে দেখে, তা নয়, আপনি সত্যকারের যে রকম, আলোকচিত্রে আপনাকে সেইরকমই দেখাতে পারে।

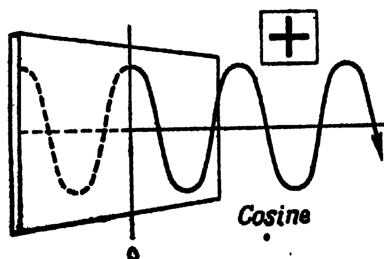
যে লোকের মুখের দুদিকই একেবারে একরকম, শুধু সেই আদর্শ ক্ষেত্রে আলোকচিত্রের ও দর্পণের প্রতিবিম্ব মিলে যাবে। কিন্তু সেটা বাস্তবিকই বিরল। নিখুঁত নীরস প্রতিসাম্য প্রকৃতির পছন্দ হলেও কিছুটা বৈচিত্রে সে কখনো আপত্তি করে না।

এখানে সারবস্তু হল এই যে, কোন বস্তুর প্রতিসাম্য থাকুক বা নাই থাকুক, দুবার প্রতিফলনের ফলে তার মূল আকার সর্বদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দুটি ঋণাত্মক চিহ্নে একটি ধনাত্মক চিহ্ন এবং দুটি ধনাত্মক চিহ্নেও একটি ধনাত্মক চিহ্ন তৈরী হওয়ার মত যেন কতকটা। আয়নার দুবার প্রতিফলনের ফলে আপনার মুখে 'ঋণাত্মক চিহ্নগুলি' (অসামঞ্জস্য) প্রতিবিম্বকে বিকৃত করে না।

তরঙ্গ-অপেক্ষকের একই বৈশিষ্ট্য আছে। এই অপেক্ষকগুলি সাধারণ গাণিতিক অপেক্ষক ; তাদের মধ্যে প্রায়ই সাইন্ (sine) ও কোসাইনকে (cosine) দেখা যায়। কাগজের উপর তাদের এঁকে আয়নার সামনে তুলে ধরুন। আয়নায় সাইনের ছবি উল্টে গেছে। এটা নতুন কিছু নয় ; স্কুলের ত্রিকোণমিতি থেকে আমরা জানি যে, ঋণাত্মক কোণের সাইন্ ধনাত্মক কোণের সাইনের সঙ্গে সমান, কিন্তু তার চিহ্নটি পরিবর্তিত। আমাদের আয়না যেন কোণের অক্ষরেখাকে ঋণাত্মক মানের দিকে প্রসারিত করে



চিত্র নং ২৭



চিত্র নং ২৮

দেয়। এখন, কোসাইন্ আয়নায় পরিবর্তিত হবে না। ত্রিকোণমিতি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

গণিতজ্ঞরা কোসাইন্‌কে বললেন সম অপেক্ষক, সাইন্‌কে বিষম অপেক্ষক। দর্পণ প্রতিফলনকেও একটি নাম দেওয়া হল: স্থান বিবর্তন। বিষম অপেক্ষক থেকে সম অপেক্ষকের পার্থক্য বিধানের জন্য তাদের চিহ্ন দেওয়া হল: সম-র ক্ষেত্রে ধনাত্মক, বিষম-র ক্ষেত্রে ঋণাত্মক।

কোন আয়নায় প্রতিফলিত সাইন্‌কে দ্বিতীয় একটি আয়নায় দেখলে মূল আকারটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ ঋণাত্মক চিহ্নকে ঋণাত্মক চিহ্ন দিয়ে গুণ করলে ধনাত্মক চিহ্ন পাওয়া যায়। কোসাইন্ অবশ্যই অপরিবর্তিত থাকবে।

শ্রোয়েডিংগারের সূত্রের সমাধানগুলি অনুসন্ধান করে দেখা গেল, পারমাণবিক ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে নতুন স্তরে যাওয়ার জন্য সমতার কখনোই পরিবর্তন হয় না। কোন ইলেকট্রনের তরঙ্গ-অপেক্ষক যদি প্রথমে সম থাকে এবং অন্য স্তরে যাওয়ার পরে তখন বিষম হয়ে যায়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় কেবল একটাই — ঐ পরিবর্তনে উৎপন্ন ফোটনের তরঙ্গ-অপেক্ষক হচ্ছে বিষম।

এর পরে সমতার ধারণা পারমাণবিক স্তর থেকে পৃথক কণার ক্ষেত্রে প্রসারিত হল। ফোটন এল প্রথম; অতঃপর অন্যান্য কণার উপরও 'লেবেল' দেখা গেল। উদাহরণ হিসাবে, ইলেকট্রন একটি বিষম কণা বলে প্রমাণিত হল।

ইলেকট্রনের গতির দিকের সঙ্গে তার ঘূর্ণন অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত, এ কথা বলার আমাদের উপলক্ষ আছে। ইলেকট্রন যদি ডানদিকে চলে, তার ঘূর্ণন, ধরা যাক, উপর দিকে; যদি বাঁদিকে চলে, তাহলে ঘূর্ণন নিচের দিকে। মনে মনে কোন আয়নায় একটি ইলেকট্রনকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করা যাক। আমরা দেখি যে, ইলেকট্রন যখন ডানদিকে যায় (আয়নায় বাঁদিকে), আয়নায় তার ঘূর্ণন উপরের দিকে থাকে কারণ আয়না কেবল দক্ষিণ ও বামের বিনিময় ঘটায়, কিন্তু প্রতিবিম্বকে উপর থেকে নিচে ঘুরিয়ে দেয় না। দর্পণস্থ ইলেকট্রনে ঘূর্ণনের যে দিক, স্বাভাবিক ইলেকট্রনে তার অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ইলেকট্রন নিঃসন্দেহে একটি বিষম কণা। যদি সে সম হত, তাহলে দর্পণ প্রতিবিম্ব প্রকৃত ইলেকট্রনের থেকে পৃথক হত না।

পাই-মেসন একটি বিষম কণা।

পদার্থবিজ্ঞানীরা সমতার শ্রেণীবিভাগকে অস্থায়ী কণাদের ক্ষেত্রে প্রসারিত করলেন; ইলেকট্রন থেকে ফোটন নিঃসরণের সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, প্রাথমিক কোন কণার সমতা ক্ষয়জনিত কণাগুলির সমতার গুণফলের অবশ্যই সমান হবে। এ পর্যন্ত, সমতা সংরক্ষণের নিয়ম নামে এই যে নির্দেশ, তাকে কণারা কখনো লঙ্ঘন করে নি।

অতঃপর নিরপেক্ষ কে-মেসনকে পাওয়া গেল। ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এ যে দুটি পাই-মেসনে পর্যবসিত হয়, তাই থেকে বিচার করলে এটি একটি সম কণা (দুটি ঋণাত্মক চিহ্নে একটি ধনাত্মক চিহ্নের সৃষ্টি), কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তিনটি পাই-মেসনে এর পরিণতি থেকে মনে হয় যে, কণাটি বিষম (ঋণাত্মক চিহ্ন গুণ, ঋণাত্মক চিহ্ন গুণ, ঋণাত্মক চিহ্ন — ফল দাঁড়ায় একটি ঋণাত্মক চিহ্ন)। প্রকৃতপক্ষে তাহলে এটা কী — সম, না বিষম?

এটা পরিষ্কার যে, দুটি নয়, একটি কণা নিয়েই আমরা কাজ করছি: টাও ও থিটা-মেসনের ভর খুব কাছাকাছি রকম মিলে যায়। কিন্তু তাহলে কে-মেসন দ্বিসমতাসমন্বিত কণা! না, সেটা মনে করা বড় বেশি হবে। এই কে-মেসন কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে সত্যিই বেশ অসুবিধায় ফেলেছে।

॥ একটি উপায় পাওয়া গেল ॥

করবার কী আছে? যদি বলা যায়, নিরপেক্ষ কে-মেসনের ক্ষয়-প্রক্রিয়ায় সমতা রক্ষিত হয় না, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির ব্যবহৃত দর্পণ ত্রুটিপূর্ণ; ঐ দর্পণে দক্ষিণ থেকে বাম পৃথক এবং স্থানের নিজের মধ্যেও প্রতিসাম্য নেই। এটা হবে একটা ভয়াবহ সিদ্ধান্ত।

স্থান যে সবদিকেই অভিন্ন, পদার্থবিদ্যা তার অস্তিত্বের বহু দীর্ঘ বছর ধরে এই ঘটনায় অভ্যস্ত। অবস্থা একেবারে সমান হলে বাঁদিকে গতি ডানদিকে গতির থেকে কোনভাবে পৃথক নয়। ঠিক কথা। স্থানের দিক-নিরপেক্ষতা নামে পরিচিত সব দিকের সমানত্বের নির্দেশ দেয় পদার্থবিদ্যার সমস্ত নিয়ম।

একে ত্যাগ করার অর্থ হবে, পদার্থবিদ্যার সবথেকে ভিত্তিগত ও মৌলিক সমস্ত নিয়মগুলির বর্জন। সেটা চিন্তা করাও ভয়াবহ।

তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী লি এবং ইয়ং এই অচল অবস্থা থেকে বার হবার একটি উল্লেখযোগ্য উপায়ের সন্ধান পেলেন। তাঁরা সাহসের সঙ্গে বললেন: হ্যাঁ, কে-মেসনের ক্ষয়-প্রক্রিয়ায় এবং সাধারণভাবে সব দুর্বল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই (যা থেকে মেসনের ক্ষয় ও কেন্দ্রকীয় নিউট্রনের বিটা-ক্ষয় ঘটে থাকে) সমতা ভেঙে পড়তে পারে।

যে পরীক্ষাগুলিতে এই আশ্চর্য ঘটনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করবে, লি এবং ইয়ং সেগুলির নির্দেশ দিলেন। সেই সব পরীক্ষা বর্ণনা করবার মত।

হিসাব করে দেখা গেল যে, সমতা যদি ভেঙেই যায়, কেন্দ্রকের বিটা-ক্ষয় প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রকীয় ঘূর্ণনের বিপরীত দিকে অধিকাংশ ইলেকট্রন ছুটে বেরবে। সাধারণ অবস্থায় কেন্দ্রকরা যথেচ্ছভাবে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক নির্দিষ্ট করে এবং ইলেকট্রনরা বেরিয়ে আসে সমস্ত দিকে।

সুতরাং প্রথমে যা করার ছিল, তা হল — কেন্দ্রকগুলিকে এমনভাবে সারিবদ্ধ করা যাতে তাদের ঘূর্ণন একই দিকে থাকে এবং পরীক্ষার সময় তাদের ঐ ভাবে সারিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এটি করার জন্য একখণ্ড বিটা-তেজস্ক্রিয় পদার্থকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হল; ঐ ক্ষেত্র কেন্দ্রকদের ঘূর্ণন-চুম্বকগুলিকে সারিবদ্ধ করে রাখল। তারপর কেন্দ্রকদের তাপজনিত গতির বিকৃতিকর ফলকে অপসারিত করার জন্য তাপমাত্রাকে দারুণভাবে (চরম শূন্যের উপর এক ডিগ্রীর পাঁচশত ভাগের এক ভাগ মাত্র) হ্রাস করে ফেলা হল।

অতঃপর এই আয়োজনের চতুর্দিকে পর পর অনেকগুলি ইলেকট্রন গণককে সাজানো হল — কেন্দ্রকীয় ঘূর্ণনের দিকের সঙ্গে সামান্য কোণাকুণি করে এবং তার প্রতিবিম্বের যে দিক, সেই দিকটিতে। গণকগুলিকে চালিয়ে দেওয়া হল; শীঘ্রই দেখা গেল, 'প্রতিবিম্বে'র দিকের তুলনায় সামনের দিকে ইলেকট্রনের সংখ্যা বহুতর। লি-ইয়ং-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হল।

এর অর্থ কি এই দাঁড়াল যে, স্থান প্রকৃতির একটি বিকৃত দর্পণ? পদার্থবিদ্যার সব মৌলিক নিয়মগুলি বিপর্যস্ত হয়ে গেল? এখানে লি এবং ইয়ং এবং স্বাধীনভাবে সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী এল. ল্যানডাও একটি গুরুত্বপূর্ণ

বক্তব্য রাখলেন: এতে স্থানের করবার কিছু নেই, ত্রুটিটি কণাদের নিজেদের।

আয়নায় ইলেকট্রনকে প্রতিফলন করে বিপরীত ঘূর্ণনযুক্ত একটি অস্তিত্বহীন ইলেকট্রনকে আমরা কীভাবে পেয়েছিলাম, আপনাদের স্মরণ আছে। এখন দেখা যাচ্ছে, বস্তুতঃ এই কণার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এর বৈদ্যুতিক আধানেরও প্রতিফলন (বৈপরীত্য) ঘটাতে হবে। ইলেকট্রনের নিখুঁত প্রতিফলন তখন আমরা পাই — আমাদের পরিচিত পজিট্রন!

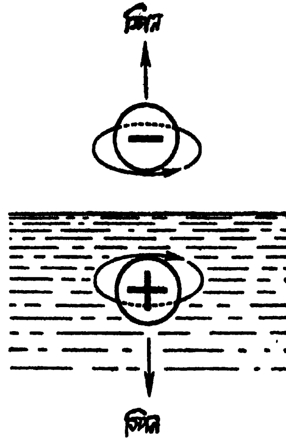
তাহলে যাহোক, প্রকৃতির আয়না ঠিক আছে। কিন্তু এটা দুটি আয়নার এক ধরণের সমন্বয়। কোন কণা এতে প্রতিফলিত হলে আমরা তার বিপরীত কণা পাই! ইলেকট্রন থেকে পজিট্রন দেখা দেয়, নিরপেক্ষ কে-মেসন থেকে জন্মগ্রহণ করে নিরপেক্ষ কিন্তু বিপরীত কে-মেসন।

নিরপেক্ষ যে কে-মেসনগুলিকে পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা গেছল, কে-শূন্য-মেসন ও তার বিপরীত-কণা, এই দু'ধরণের কণার মিশ্রন বলে তারা প্রমাণিত হল। কিন্তু কে-শূন্য-মেসন বিষম আর তার বিপরীত-কণা সম। এই হল 'টাও-থিটা' রহস্যের উদ্‌ঘাটন।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'সংযুক্ত বিবর্তন' নামে এই দ্বিতীয় ধরণের প্রতিফলনের কৃতিত্ব লি এবং ইয়ং-এর। ল্যান্‌ডাও স্বাধীনভাবে ঐ একই আবিষ্কার করেছিলেন।

এইভাবে এটা নিশ্চিত করে প্রমাণিত হল যে, কোন কণার গতির দিকের তুলনায় তার ঘূর্ণনের দিক বিশেষ কোন ধারাতেই নির্দিষ্ট হতে পারে এবং সেটা অবশ্যই তার বিপরীত-কণার ঘূর্ণনের দিকের বিপরীত হবে। আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিই যে, ঘূর্ণন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কণাটির নিজের আবর্তন, তাহলে ছবিটি দাঁড়ায় এইরকম। ইলেকট্রনের গায়ে একটি চিরকুট এঁটে মনে মনে দ্রুতগতিসম্পন্ন সিনেমার যন্ত্রের সাহায্যে কণাটির চলমান অবস্থায় তাকে অনুসরণ করুন। আমরা দেখব, চিরকুটটি একটি প্যাঁচানো (spiral) পথ সৃষ্টি করে চলেছে; ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্যাঁচ হবে বাঁদিকে, পজিট্রনের ক্ষেত্রে ডানদিকে।

প্রকৃতপক্ষে, এই 'প্যাঁচানোর ভাব' বা প্যাঁচের দিকের পার্থক্যই কণাকে তার বিপরীত কণা থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। যাহোক, মনে রাখবেন, ডান



চিত্র নং ২৯

ও বাঁ-এর ধারণা ধনাত্মক ও ঋণাত্মকের ধারণার মতই আপেক্ষিক। কণাকে বাঁ-হাতি প্যাঁচ ও বিপরীত-কণাকে ডান-হাতি প্যাঁচ দিতে আমরা সম্মত হয়েছি মাত্র।

॥ জগৎ ও বিপরীৎ-জগৎ ॥

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, আমাদের জগতে পজিট্রন হচ্ছে বিরল অতিথি। এ থেকে মনে হবে — কণার জগতে প্রতিসাম্য নেই, ডান-হাতি প্যাঁচের থেকে বাঁ-হাতি প্যাঁচ অনেক বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বৃহৎ বস্তুদের জগতের দিকে আরো একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। শামুকের প্যাঁচ বেশির ভাগ সময় বাঁ-হাতি, শামুকের খোলা বাঁদিকে পেঁচিয়ে চলে। রসায়নবিদ্যায় স্টিরিও-আইসোমার জাতীয় অণু রয়েছে, সেগুলি পরস্পরের দর্পণ-প্রতিবিম্ব। তত্ত্বের জগতেও হয় বাঁ-হাতি, নয় ডান-হাতি, আইসোমার বেশি দেখতে পাওয়া যায়। পরিশেষে মানুষের মধ্যে হৃদযন্ত্রটি হল বাঁদিকে; অবশ্য কদাচিৎ আমরা 'দর্পণ'-মানব দেখতে পাই, যাদের দেহের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অঙ্গের

স্থান পরিবর্তিত। ন্যাটারা মোটামুটি সুলভ হলেও অধিকাংশ লোক ডান-হাত-প্রধান।

স্থানের বৃহত্তর জগতে যে আমরা বিপরীত-জগৎ দেখতে পারি, সব কিছুই যেখানে বিপরীত — তাতে তাহলে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কথা নয়। সেখানে বিপরীত-পরমাণুর রয়েছে বিপরীত-কেন্দ্রক; সেগুলি আবার বিপরীত-প্রোটন ও বিপরীত-নিউট্রন দিয়ে গঠিত এবং পজিট্রনের দ্বারা বেষ্টিত। যদি কোন জৈব পদার্থ সেখানে থাকে, তাহলে আমাদের পৃথিবীর জীবের তা দর্পণ-প্রতিবিম্ব হবে।

যদি উভয় জগৎই এক অবস্থার মধ্যে থাকে, বিপরীত জগতের নিয়মগুলি আমাদের নিজেদের জগতের নিয়মগুলির থেকে কোন অংশে পৃথক হবে না। কিন্তু চিহ্নটি প্রতি ক্ষেত্রে বিপরীত হবে। সেজন্য কোন বিপরীত-জগৎ আমাদের একেবারে পাশে থাকলেও আমরা কখনো তার অস্তিত্বের কথা জানতে পারব না।

আমরা শুধু যা নির্ণয় করতে পারব, তা হল সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের মধ্যকার সীমারেখা। এখানে দুটির সাক্ষাৎ ঘটে, এর থেকে বেশি যুদ্ধাত্মক সাক্ষাৎ আর কখনো হবে না; কারণ কণারা অদৃশ্য হয়ে শক্তিশালী ফোটনে পরিণত হয় ও ফোটনগুলি সংঘর্ষস্থল থেকে আলোর গতিতে চতুর্দিকে ছুটে বেরিয়ে যায়, অথবা কণারা রূপান্তরিত হয় পাই-মেসনে। ফোটন ও পাই-মেসন দুই জগতের মধ্যে যেন একটি মেখলার সৃষ্টি করবে; কোন কণা যদি সবেগে বিপরীত জগতের দিকে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তার পক্ষে বিপদের এলাকার সঙ্কেতসূচক হবে ঐ মেখলা। আমাদের সৌরজগতে বা বলতে কি, বহুগুণে বিশালতর নাক্ষত্রিক ব্যবস্থাতে এমন কোন সীমারেখার চিহ্ন বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত পান নি।

॥ কণার মধ্যে কী ঘটে ॥

যে প্রশ্নের কখনো উত্তর দেওয়া হয় নি, আমরা তাই নিয়ে সুরু করব: ক্ষুদ্র কণাদের নিখুঁত আয়তন কী? এই সব কণার কি আদৌ নিখুঁত আয়তন আছে?

কী প্রশ্ন! প্রত্যেক পদার্থেরই নিশ্চয় কোন ধরণের আকৃতি আছে। বটে, অত নিশ্চিতভাবে বলা যায় না — বিশেষ করে আমরা যা আলোচনা করেছি, তারপর।

অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে পদার্থবিজ্ঞানীরা ঠিকভাবে এই সমস্যাটির মোকাবিলা করতে পারছিলেন না। তার আংশিক কারণ হল, কণাকে কোন আয়তন দান করলেই কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার গাণিতিক যন্ত্রটি বিফল হয়ে যেত। অপরপক্ষে আমরা দেখেছি, কণার আকৃতির প্রকৃত পরিমাপের কোন উপায় নেই। এর কারণ তরঙ্গধর্ম — যে ধর্ম কণাটিকে স্থানে বিস্তারিত করে দেয়।

এই সব তরঙ্গ-ধর্ম কণা ও তার ক্ষেত্রের আন্তঃসম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। অন্য কথায় বলতে গেলে, ইলেকট্রন যে বিস্তারিত হয়ে পড়ে, তার কারণ ইলেকট্রন সমেত অন্যান্য কণার সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়া।

এই পারস্পরিক ক্রিয়ার আধুনিক আলেখ্য কী, তা আমরা জানি। ইলেকট্রন অলীকভাবে ফোটনের নিঃসরণ ঘটায় এবং অন্যান্য কণা থেকে নিঃসৃত ফোটনের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। ফল দাঁড়ায় — কণাগুলির পারস্পরিক বিকর্ষণ বা আকর্ষণ। যে সব অলীক ফোটনকে ইলেকট্রন নিঃসারিত করছে ও শোষণ করে নিচ্ছে, তাদের পুঞ্জের মধ্যে ইলেকট্রন যেন জড়িয়ে আছে। এই পুঞ্জ সীমাহীন : সবসময়ই অল্পশক্তিসম্পন্ন এমন সব ফোটন থাকবে, যারা হাইসেনবার্গের সূত্র অনুযায়ী তাদের নিঃসারণকারী ইলেকট্রন থেকে যে কোন দূরত্বে যেতে পারে। এই ফোটনের পুঞ্জ ইলেকট্রনকে স্থানে বিস্তারিত করে দেয় এবং আমাদের নিখুঁত আয়তনের কথা বলতে দেয় না।

এ সত্ত্বেও, ঐ পুঞ্জ অন্তস্তলের যত নিকটবর্তী হয়, তত দ্রুত তা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যে সব দূরত্বে (10^{-11} সেন্টিমিটারের মত) ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগ্ম গঠন করার উপযোগী যথেষ্ট শক্তি অলীক ফোটনদের থাকে, সেখানে আমরা যা পাই, তাকে 'কম্পমান' ইলেকট্রন বলা চলে। ইলেকট্রনটি এখনো বিস্তারিত, তবে স্থানের স্বল্পতর অঞ্চলে তার বিস্তার। এখানে নিখুঁত কোন আয়তন নেই।

ফোটন ও ইলেকট্রন-পজিট্রন পুঞ্জ থেকে মুক্ত করে 'নগ্ন' ইলেকট্রনের

আকৃতি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা হয়তো সম্ভব হবে। না, তা অসম্ভব, কারণ প্রকৃতিতে নিষ্ক্রিয় ইলেকট্রন বলে কোন কিছু নেই। সহজভাবে বলতে গেলে, এর অস্তিত্ব নেই, থাকতেও পারে না। কণা ও তার পারস্পরিক ক্রিয়া, এই দুটি মিলে গড়ে ওঠে একটা ঐক্য, একটা অচ্ছেদ্য ঐক্য।

আমাদের পক্ষে মনে করার কেবল যা রইল, তা হল — পদার্থবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন 'অন্তঃকরণ', সেই ধরণের কিছু একটা এই সব পুঞ্জের ভিতর আছে। কিন্তু এই অন্তঃকরণ দেখতে কেমন ও তার মধ্যে কী ঘটে, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত কিছুই জানি না।

প্রোটন নামে অন্য একটি যে মৌল কণা, তার গঠন বর্ণনার জন্য বিজ্ঞানীরা একই ধরণের কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। প্রোটন (অলীক-ভাবে) পাই-মেসনকে নিঃসৃত করে; পাই-মেসনগুলির শক্তি স্বভাবতই তাদের স্থিতি শক্তির থেকে স্বল্পতর নয়। সেজন্য পাই-মেসনের পরমায়ু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ তাদের জন্মদাতা প্রোটনের থেকে তারা বেশি দূরে যেতে পারে না।

বস্তুতঃ আমাদের স্মরণ আছে যে, প্রোটনের চতুর্দিকে পাই-মেসন পুঞ্জের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, 10^{-13} সেন্টিমিটারের মত। প্রোটন ইলেকট্রনের মতন নয়, পাই-মেসনের দ্বারা অত্যন্ত সামান্যই কেবল বিস্তারিত হয়। কিন্তু আমরা জানি, কে-মেসনের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে প্রোটনের বেশ খানিকটা উদ্যম আছে। সেজন্য এই পারস্পরিক ক্রিয়া অনুযায়ীও একটি অলীক পুঞ্জ — একটি কে-মেসন পুঞ্জ — থাকতে পারে। কে-মেসনের স্থিতি শক্তি পাই-মেসনের স্থিতি শক্তির প্রায় তিনগুণ হওয়ায় কে-মেসন পুঞ্জ অতগুণই ঠিক ক্ষুদ্রতর হবে এবং অবস্থিত হবে পাই-মেসন পুঞ্জের মধ্যে। অন্তস্তলের আরো গভীরে আমরা কেন্দ্রীভূত 'কম্পমান' প্রোটনকে দেখতে পাব; ঐ প্রোটন অলীকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রোটন ও বিপরীত-প্রোটনের যুগ্মে পর্যবসিত হচ্ছে।

পদার্থবিদ্যা এইভাবে চমকপ্রদ ও অনিবার্য সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয় যে, ক্ষুদ্রের জগতের কণাগুলির গঠন অন্যান্য কণাদের সঙ্গে তাদের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। ক্ষুদ্র কণাদের সারভাগ অত্যন্ত তরল ও চঞ্চল বলে দেখা যাচ্ছে।

পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যতীত কণার যে অস্তিত্ব নেই, এই ধারণাটি যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত আর অসাধারণ বলে মনে হবে না। পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা সব ক্ষুদ্র কণাই পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কণাদের পারস্পরিক ক্রিয়া এমন কিছু নয়, যাকে বাইরে থেকে উপস্থিত করা হয়েছে; এটি তাদের গঠনের একটি অখণ্ড ও স্বাভাবিক অংশ।

হ্যাঁ, যে কোন সময় কণার গঠন তার সব পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। অপরপক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়ার চরিত্র ও মাত্রা নির্দিষ্ট হয় কণাটির গঠনের দ্বারা। এটা হল — পদার্থ ও ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কণা ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যথার্থ ধর্মগুলি এবং ক্ষুদ্র কণার অচ্ছেদ্য পরিবার ও সমগ্র বিশ্বের অবিভেদ্য সাধারণত্ব, এ সবের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী (ডায়ালেকটিক) সার তথ্য।

যাহোক, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, বিজ্ঞানে প্রচলিত যুক্তিধারার বর্তমান রীতিগুলি ডায়ালেকটিক যুক্তিবাদের থেকে বহু দিক দিয়ে এখনো স্বতন্ত্র। কণাসমূহের গঠন ও তাদের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে যাকে আমরা একটা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী (ডায়ালেকটিক) সম্পর্ক বলেছি, বলেছি বস্তু ও ক্ষেত্রের মধ্যে একটা যোগসূত্র, তাকেই পদার্থবিজ্ঞানীরা একটি বিশ্রী গোলক ধাঁধার মত বলে দুঃখের সঙ্গে বর্ণনা করেন।

এ সব সত্ত্বেও আজ হোক বা কাল হোক, এই অচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার একটা পথ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। এ পর্যন্ত পরীক্ষা-বিদরা একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রের সন্ধান পেয়েছেন আর তত্ত্ববিদরা — যাঁরা সবসময়ে অকুস্থলে ঠিক হাজির, তাঁরা অমনি কৌতূহলী হয়ে সেখানে তাঁদের নাক গলিয়ে দিয়েছেন।

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে ফয়সালা হয়ে গেছে। 'কণাজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় শেষ পর্যন্ত কোন এক ধরণের শৃঙ্খলা আনবার আশায় কণাসন্ধানীরা অত্যন্ত সচেষ্ট আছেন।

॥ রহস্যময় অনুনাদ ॥

প্রথমকার জিনিস প্রথমে। ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে পদার্থবিজ্ঞানীদের যে বহুল আবিষ্কার, তার মধ্যে অদ্ভুত গঠনের পাঁচমিশেলি কিছু ছিল। এগুলিকে

কথা বলতে পারলে হত, কিন্তু সেটা বলতে বিজ্ঞানীদের কেমন জানি কিছুতেই মন সরলো না।

আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন। ত্বরণযন্ত্র ব্যবহার করে গবেষক পেয়ে যান বিপুল পরিমাণ অতি-শক্তিশালী প্রোটন। অতঃপর তিনি প্রোটন-সমন্বিত কোন লক্ষ্যবস্তুর ওপর সেগুলিকে নিক্ষেপ করেন। একরাশ নতুন সদ্যোজাত কণা লক্ষ্যবস্তু থেকে বিরিয়ে আসে। তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক পাই-মেসন থাকে।

পাই-মেসনগুলিকে একটি পৃথক গুচ্ছে সংগৃহীত করে এরপর পরীক্ষক প্রোটন-সমন্বিত একটি দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তুর উপর নিক্ষেপ করেন। পাই-মেসন ও প্রোটনের সংঘর্ষের ফল কী দাঁড়াবে ?

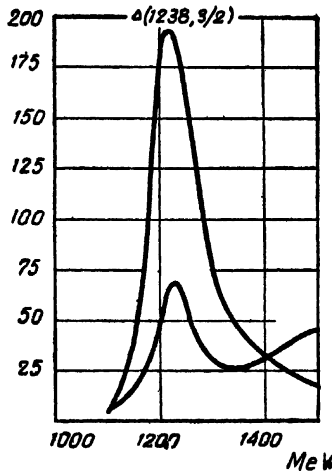
সেটা তো আগেই আমরা জানি। সংঘর্ষের অবিশ্বাস্যরকম সংক্ষিপ্ত সময়ে পাই-মেসন ও প্রোটন একসার নতুন কণার জন্ম দেয় ; অপেক্ষাকৃত ভারী কে-মেসন ও হাইপেরনও তাদের অন্তর্ভুক্ত। যাহোক, গুচ্ছের বেশির ভাগ অংশ বিচ্ছুরিত হয়ে যায়।

এই বিচ্ছুরণে পদার্থবিজ্ঞানীরা আকৃষ্ট হলেন, কারণ পাই-মেসন ও প্রোটনের মধ্যে যে কার্যকর বল, তার প্রকৃতি এর থেকে বুঝা যাবে বলে আশা করা গেল। আগেই বলা হয়েছে, এইগুলি কেন্দ্রীন বল।

প্রচলিত তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে বিচ্ছুরণ ব্যাপারটা বেশ মানিয়ে যাচ্ছে বলে প্রথমে মনে হল। কিন্তু শীঘ্রই পদার্থবিজ্ঞানীদের একটা বিস্ময়ের কারণ ঘটল। একটি নির্দিষ্ট শক্তিতে বিচ্ছুরিত পাই-মেসনের অংশ হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে গেল। মেসনের শক্তি এর পরও বাড়তে থাকলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে দেখা গেল। বিচ্ছুরণ প্রস্থচ্ছেদ বনাম মেসন-শক্তির রেখাচিত্রে একটি ছোট কুঁজের মত রয়ে গেল। ঐ সব রেখাচিত্রের একটিকে পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

১৯৫২ সালে এনরিকো ফ্যার্মিই এই ধরণের প্রথম কুঁজ লক্ষ্য করেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্বরকে উৎপন্ন পাই-মেসন গুচ্ছকে প্রোটন লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পাঠিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রায় $1\frac{1}{4}$ জিগা ($1\frac{1}{4} \times 10^9$) ইলেকট্রন ভোল্টে মেসনগুলি হঠাৎ প্রোটন কর্তৃক দারুণভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এটা অনেকটা যেন অনুনাদের মত। (চিত্র নং ৩০)

এইজন্য পাই-মেসন বিচ্ছুরণের রেখাচিত্রের কুব্জটির নাম দেওয়া হল — অনুনাদ। সেই সময় মনে হয়েছিল উপমাটি একেবারে বাস্তিক। রহস্যময়ও বটে। সত্যাই তো, বিচ্ছুরণ রেখাচিত্রের উপর এই কুব্জটির ঠিক অর্থ কী?



চিত্র নং ৩০

যদি কোন কণার বিচ্ছুরণের মাত্রা বেশি হয়, তা হলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কণাটি প্রোটনের সন্নিকটে বেশি সময় কাটিয়েছে। তার পুরণো ভারিক্কি বন্ধু প্রোটনকে ভালভাবে দেখবার জন্যে প্রায় আলোর সমান গতি থেকে সে যেন তার গতি কমিয়ে ফেলে।

ঠিক কতক্ষণ মেসনটি প্রোটনের কাছাকাছি থাকবে? রেখাচিত্রের কুব্জ থেকে তার পরিমাণ করা চলে। কিন্তু এটা কেবল একটা মোটামুটি পরিমাণ: কোন ঘড়ি দিয়েই একে কখনো মাপতে পারা যায় না। প্রোটন আকারে 10^{-13} সেন্টিমিটার এবং পাই-মেসনের গতি সেকেণ্ডে 10^{10} সেন্টিমিটারের মত। সেইজন্য পাই-মেসন প্রায় 10^{-23} সেকেণ্ডে প্রোটনের পাশ দিয়ে চলে যায়।

এই সংখ্যাটি আমাদের পরিচিত: পারস্পরিক জোরালো ক্রিয়ার যে সময়, এ তারই সমগোত্রীয়। সুতরাং সব কিছুর যেমন হওয়া উচিত, তেমনি

আছে। প্রোটন ও কেন্দ্রীন বলের কোয়ান্টামের (পাই-মেসন) পারস্পরিক ক্রিয়াই হল ঐ জোয়ালো ক্রিয়া।

ব্যাপারটা এইরকম। "অনুনাদ" পাই-মেসন একই রকম সময় অর্থাৎ প্রায় 10^{-23} সেকেণ্ড প্রোটনের সঙ্গে থাকে ; তার পাশের "অনুনাদ" শক্তির মেসনের থেকে হয়তো সামান্য একটু বেশিক্ষণ। এই সময়কে পরিমাপ করবার কোন উপায় এখনো পর্যন্ত জানা নেই। এর পরিমাণের মাত্রাটুকুই কেবল আমরা জানি।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, এক ধরণের বিলম্ব অবশ্যই ঘটছে। পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রশ্ন : এই অত্যল্প সময় কণা দুটি কী করে ? তারা কি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায় ? তারা কি সংযুক্ত হয়ে থাকে ?

তত্ত্ববিদরা বলেন যে, ব্যাপারটা একেবারেই অস্পষ্ট, তবে কোন কারণ-বশতঃ নতুন পাই-মেসনের আবির্ভাব ঘটে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, কেন্দ্রীন বলের শক্তি হয়তো এক্ষেত্রে নতুন বল-কোয়ান্টামের আকারে প্রকাশ পায়। একটি অলীক প্রক্রিয়া কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব তার ফল !

॥ যবনিকার উত্তোলন ॥

কিছুকাল পরে 'অনুনাদগুলি' সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল। বলা হতে লাগলো যে, অনুনাদ-কণাগুলি অন্য যে কোন বাস্তব কণার থেকে প্রকৃতপক্ষে হয়তো কোন অংশে মন্দ নয়।

সত্যই তো, এখন কণা কাকে বলা হয় ? এটা এমন একটা বস্তু যার অত্যন্ত নির্দিষ্ট আয়তন না থাকলেও এমন কয়েকটি ধর্ম আছে যা অন্যান্য কণা থেকে একে পৃথক করে রাখে : ভর, আধান, ঘূর্ণন ও জীবনকাল। *

* জীবনকাল শব্দটির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, প্রোটন একেবারে স্থায়ী, এর জীবনকাল অনির্দিষ্টরকম বৃহৎ। এখন, আধানযুক্ত পাই-মেসন হচ্ছে একেবারে অন্য জিনিষ, কারণ এক সেকেণ্ডের কোটি-ভাগের কয়েক শতাংশ মাত্র এর জীবনকাল ; এর নিরপেক্ষ ভাইটির জীবন-কাল আরো একশো কোটিগুণ সংক্ষিপ্ত। এই জীবনকাল অকল্পনীয়রকম সংক্ষিপ্ত হলেও আমরা ঐগুলিকে কণা হিসাবে ধরতে পারি।

ভর ? অনুনাদ সত্তাটির ভর আছে। ভর ও শক্তি সংক্রান্ত আইনস্টাইনের

সুত্র থেকে এই ভরের হিসাব করা চলে। ক্ষণিকের জন্যে "সংযুক্ত" কণাগুলি দিয়ে গঠিত ব্যবস্থার যে অনুনাদ বস্তু, তার আধান ও ঘূর্ণনের কথা আমরা একইভাবে বলতে পারি। অথবা অনুনাদ কণা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে সেই মুহূর্তে যে সব কণা ছুটে বেরিয়ে যায়, তাদের এই ধর্মগুলিও আমরা নির্ণয় করতে পারি।

অন্যভাবে বলতে গেলে "বাস্তব" কণায় যে সব ধর্ম আছে, অনুনাদেও আমরা সেই ধর্মগুলি আরোপ করতে পারি। এটা অবশ্য ঠিক যে, নতুন কণাগুলি অত্যন্ত অসাধারণ। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা অসাধারণ বস্তুতে অভ্যস্ত। কোন্ কিছুতেই আর তাঁদের বিস্মিত করতে পারে না। প্রকৃত-পক্ষে যে কোন ব্যবস্থাকেই হয় তার ভৌত ধর্মের ভাষায় বা তার বলীয় ধর্মের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাই এটা সম্ভব করেছে।

বস্তুতঃ বর্ণনা দুটি অভিন্ন। সুতরাং নতুন পথে এগনোয় নতুন কিছু যে লাভ হয়, প্রাথমিক দৃষ্টিতে তা মনে হয় না। তবে "অনুনাদ"কে ব্যবহার করে যদি আমরা এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি পরীক্ষা করে যা মেলানো যাবে, তবে সেটা হবে একটা আলাদা ব্যাপার। অন্যভাবে বলতে গেলে "অনুনাদ"কে আপনি যে কোন নামে অভিহিত করতে পারেন, ক্ষণিকের জন্যে সংযুক্ত কণাসমূহের একটা গুচ্ছ বা একটি নতুন কণা হিসাবে একে ভাবতে পারেন, আপনার খুশিমত এতে যে কোন ধরণের ধর্ম আরোপ করতে পারেন — যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন ধারণা সফল হচ্ছে ও তা থেকে নতুন আবিষ্কারের পথ খুলে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সবই চলতে পারে।

ঘটনাবলী থেকে দেখা গেল যে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর এটাই হল সবচেয়ে মূল্যবান ধর্ম ; ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে অনুনাদ বস্তুগুলি কণাজগতে নাগরিকত্বের অধিকার লাভ করলো। প্রোটন থেকে পাই-মেসন ও পরে কে-মেসনের বিচ্ছুরণের রেখাচিত্রকে পরীক্ষা করে পদার্থবিজ্ঞানীদের মনে হল যে, এই ধরণের রেখাচিত্র আগেও পাওয়া গেছে : পরমাণু-কেন্দ্রক থেকে প্রোটনের বিচ্ছুরণের সময়।

আমরা আগেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। প্রোটন যদি কোন কেন্দ্রককে আঘাত করে, কেন্দ্রকটি প্রোটনকে ও তার সঙ্গে তার শক্তির

একটা বড় অংশকেও শোষণ করে নেয়। কেন্দ্রকটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তখন বিভিন্ন উপায়ে এই অবস্থা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে; উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রোটন ও একটি গামা কোয়ান্টামকে বা অন্য কয়েকটি কণাকে বার করে দিয়ে সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। প্রোটনের শক্তি যখন "একেবারে ঠিক মাপের" হয়, তখন কেন্দ্রক কর্তৃক প্রোটন বিচ্ছুরণের রেখাচিত্রটিতে শিখর দেখতে পাওয়া যায় — আমরা যে কুঁজের কথা বলছিলাম, ঐ শিখর অনেকটা সেইরকম।

এইভাবে অনুনাদকে বাস্তব কণা হিসাবে মনে করা হতে লাগলো— যদিও অবশ্য অত্যন্ত বিশেষ ধরণের বাস্তব কণা। তারা যেন ক্ষুদে জগতের অন্যান্য অধিকতর স্থায়ী কণা অর্থাৎ মেসন, প্রোটন ও হাইপেরনের উত্তেজিত অবস্থা।

এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে ১৯৬০-এর গোড়ার দিকে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সেগুলি খুব শীঘ্রই চমৎকারভাবে সমর্থিত হল।

॥ অনুনাদের নাগরিকতা লাভ ॥

ক্ষুদে জগতের বাসিন্দাদের শ্রেণীবিভাগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলো। ক্ষুদে কণাগুলির বর্তমান গণনায় গতানুগতিক বস্তুগুলির সঙ্গে অনুনাদ সত্তাগুলিকেও ধরা হয়।

তাদের ক্ষয়ের ফল? সেখানেও নতুনত্ব। অনুনাদ কণাগুলিকে বহু বিভিন্ন উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দেখা গেল। পদার্থবিজ্ঞানীরা বললেন, বেশ, এতো ভালই হল, সদ্যোজাত কণাগুলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জন্মদাতাদের সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় আমরা জানতে পারবো।

কিন্তু পরীক্ষকগণ তাঁদের জন্যে সব কিছু একবারে খুলে ধরবেন, তত্ত্ববিদরা তার অপেক্ষায় রইলেন না। তাঁরা এগিয়ে চললেন: ভুল করলেন, অন্ধ গলিপথে আটকে গেলেন, দুর্গম অঞ্চল পেরিয়ে চললেন, আর প্রায়ই তাঁরা পরীক্ষকদের পেছনে ফেলে আগে আগে চলতে লাগলেন।

আইসোটপিক ঘূর্ণনের কথা স্মরণ করুন? এরই সাহায্যে কাছাকাছি ভরের কণাগুলিকে একই কণার বিভিন্ন প্রকাশরূপে গোষ্ঠীভুক্ত করা সম্ভব

হয়েছিল। ক্ষুদে জগতের বহুসংখ্যক বাসিন্দাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনার সেই প্রথম পদক্ষেপ।

পরবর্তী কাজ হল, এই সব "আইসোটপিক বহুতয়ের" (multiplets) মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে "অতি-বহুতয়ের" বৃহৎতর শ্রেণী গঠন করা। কণাগুলির মধ্যে পরিচিত সম্পর্কসমূহ এখনো অস্পষ্ট, এইটাই যে একমাত্র অসুবিধা ছিল তা নয়, "পরিবারের" সভ্যসংখ্যা সম্বন্ধেও কোন তথ্য ছিল না। কিন্তু একেবারে গোড়া থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছলো যে অন্ততঃ তিনটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট ধরণের পরিবার আছে: লেপ্‌টন, মেসন ও বেরিয়ন।

আজ পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানীরা লেপ্‌টন পরিবারগুলি সম্পর্কে বাস্তবিকই কিছু জানেন না। সমগ্রভাবেও লেপ্‌টন গোষ্ঠীটি মেসন ও বেরিয়নের বিরাট বংশের মত মোটেই অত বিপুল সংখ্যক নয়। জিনিষগুলি বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আপাতঃ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা সহজ হল না। গোষ্ঠীটির অস্তিত্ব আদৌ রয়েছে কেন, পদার্থবিজ্ঞানীরা এখনো তাই নির্ণয় করবার চেষ্টা করছেন। ক্ষুদে জগতের যত নিয়ম জানা আছে, তাদের কোনটি দিয়েই এর অস্তিত্বকে সমর্থন পর্যন্ত করা যায় না।

অপরপক্ষে বহুসভ্যসমন্বিত অন্য দুইটি গোষ্ঠীর থেকে আজ অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, এঁদের বিপুল সভ্যসংখ্যার জন্যে— অনুনাদ কণাগুলির অন্তর্ভুক্তিতে তা আরো বেড়েছে — তত্ত্ববিদদের কাজ মোটেই সরল হয়নি।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন যে নতুন খেলায় মেতেছেন, তাইতে আশা আছে। এটা হচ্ছে, কণারূপ সভ্যগুলিকে কায়দা করে নতুন নতুন গোষ্ঠী গঠন করা। কণার শ্রেণীবিভাগের নতুন পদ্ধতিটির জন্যে — আটদফা ব্যবস্থা, এই অচেনা নামটি প্রচলিত হয়েছে।

একটি একটি, দুটি দুটি ও তিনটি তিনটি কণার যে সমষ্টি — আইসোটপিক ঘূর্ণন শূন্য, অর্ধেক ও এক অনুযায়ী, কণাগুলির যথাক্রমে একতয়, দ্বিতয় ও ত্রিতয়রূপ যে সব গোষ্ঠী — সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের আগেই জানা আছে। অষ্টতয় — আটটি কণার সমষ্টি — একটি বিশেষ বক্তব্যের বিষয় হবে।

এখন পর্যন্ত আমরা ভর, বৈদ্যুতিক আধান এবং সাধারণ ও আই-সোটপিক ঘূর্ণন অনুযায়ী কণার শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছি। কয়েক বছর ধরে এই শ্রেণীবিভাগ বিফল হচ্ছিল, কারণ সবসময়ই এমন একটা না একটা কণা ছিল, যা কোন গর্ততেই ঠিক মানানসই হচ্ছিল না, তত্ত্ববিদদের আশাও এইভাবে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

সেইজন্য ১৯৬১ সালে প্রস্তাব করা হল যে, কণার শ্রেণীবিভাগের জন্যে এইগুলি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রের গেলমান্ ও ইস্রায়েলের নেম্যানের মন্তব্য ছিল এইরকম: আইসোটপিক ঘূর্ণন ও অদ্ভুতত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য বাতিল করে দেওয়ার তাঁরা প্রস্তাব করলেন। তাহলে চারটি রাশি থেকে যায়। ব্যাপারটা এখানে এই যে, আইসোটপিক ঘূর্ণন হচ্ছে তিনটি রাশি দিয়ে গঠিত একটি জটিল সত্ত্বা। এটাকে একটা আর্ষবাক্য হিসাবেই পাঠককে মেনে নিতে হবে কারণ আইসোটপিক ঘূর্ণনের জটিলতা এইরকম একটি বইয়ের বিষয়সূচীর বাইরে।

সুতরাং চারটি রাশি আছে তত্ত্ববিদদের হাতে। প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলি নিয়ে কী করা হবে?

আরো চারটি যোগ করো!

বাস্তবিকই, এটা একটা সাহসিকতার কাজ হয়েছে। চারটেকেই সামলানো যথেষ্ট শক্ত, তার ওপর আবার আরো চারটে। সাধারণ ও আইসোটপিক ঘূর্ণনের মত একই ভাবে এরা অর্থপূর্ণ কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই অর্থ সম্পূর্ণভাবে রহস্যাবৃত। চতুষ্টয়ের রাশিগুলির এখনো নামকরণ হয়নি।

আটটি রাশি! তত্ত্ববিদরা যে কী করছেন, তা মনে হয় তাঁরা জানেন, কারণ এই আটটিকে তো তাঁরা আকস্মিকভাবে বেছে নেন নি।

॥ ত্রিতয়, অষ্টতয় ॥

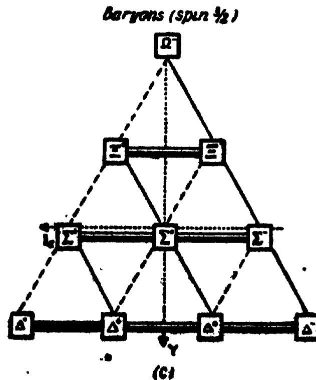
এই আটটি রাশি নিয়ে হলো একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক গোষ্ঠী; অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞরা একে ৪ × ৪ আয়তনের বিন্যাসের জন্যে একটি বিশেষ একাত্মক গোষ্ঠী বলে থাকেন।

এই গূঢ় ভাষার পিছনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম লুকিয়ে আছে : যে রাশিগুলি নিয়ে গোষ্ঠীটি গঠিত, তাদের একটি অন্যটিতে পর্যবসিত হতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে গোষ্ঠীটির প্রত্যেকটি রাশি যদি একটা নির্দিষ্ট কণার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে সবকটি কণাই পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে। দেখা যাবে যে, একই মূল থেকে তাদের উদ্ভব।

সমস্ত কাজটাই ছিল এই বিষয় সংক্রান্ত ; পদার্থবিদ্যার সামান্যতম অংশও নয়, কেবল বিশুদ্ধ জটিল গণিত।

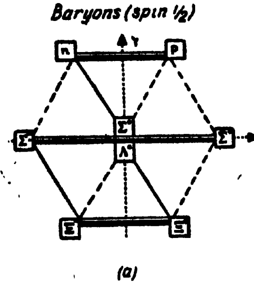
এখন অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞরা সংখ্যা-গোষ্ঠীর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত ; তাদের মধ্যে একাত্মক প্রতিসাম্যের (unitary symmetry) বিশেষ একাত্মক গোষ্ঠীটিও আছে।

সুতরাং এখানে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীতে আমরা পাচ্ছি আটটি রাশি বা আটটি কণা। ঐগুলি কোন কণা ? অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে তা নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মেসন গোষ্ঠীর কথা ধরা যাক। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এতে ছিল তিনটি পাই-মেসন ও চারটি কে-মেসন অর্থাৎ সর্বসমেত সাতটি মেসন। কিন্তু মেসন অষ্টতয়ের জন্যে একটি অষ্টম কণা দরকার। এই অষ্টম মেসনটির ধর্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হল : এই গোষ্ঠীর অন্য সব মেসনের মতই সাধারণ ঘূর্ণন হল শূন্য, বৈদ্যুতিক আধান নেই, কণাটি যাতে

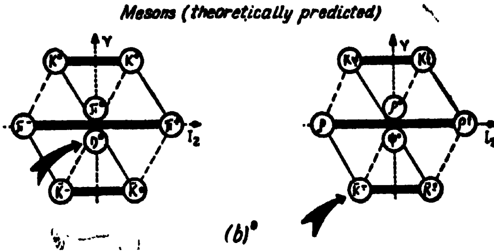


(C)

চিত্র নং ৩১



(a)



(b)

একবারে একা হতে পারে, সেজন্যে আইসোটপিক ঘূর্ণন স্বভাবতঃই আবার শূন্য এবং ভর মোটামুটিভাবে 1100 ইলেক্ট্রন ভর।

যে ১৯৬১ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করা হল, সেই বছরই পরীক্ষকরা না পাওয়া মেসনটির সন্ধান পেলেন। তত্ত্ববিদরা বলেছিলেন, এর ভর হবে 1080, আবিষ্কৃত কণার ভর হল 1100।

তাত্ত্বিক কর্মীরা নতুন ধারণাটি সম্বন্ধে প্রথমে অত্যন্ত উদাসীন থাকলেও এখন প্রত্যেকেই এর সম্বন্ধে গর্ব করে বেড়াতে লাগলেন। দু'বছরের মধ্যে অনুনাদ কণা দিয়ে মেসনের দ্বিতীয় অষ্টতয় গঠিত হল। ছবি থেকে দেখা যাবে যে, পরিচিত বেরিয়নরা কোনরকম আবদার অনুরোধ ছাড়াই তাদের অষ্টতয়ের মধ্যে সুন্দরভাবে মানিয়ে গেল।

অতঃপর এল অনুনাদ হাইপেরনদের পালা; ইলেকট্রন ভরের প্রায় তিন হাজার গুণ বেশী এদের ভর। এখানে তত্ত্ববিদরা দেখলেন যে, গোষ্ঠীটিতে

আটটি নয়, দশটি কণার স্থান হওয়া উচিত এবং তাদের প্রত্যেকেরই সাধারণ ঘূর্ণন হওয়া উচিত $\frac{3}{2}$। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, সাধারণ ঘূর্ণন একের থেকে বেশি, এমন বৈশিষ্ট্যের যে সব কণা, এই হাইপেরনগুলিই তাদের প্রথম দৃষ্টান্ত।

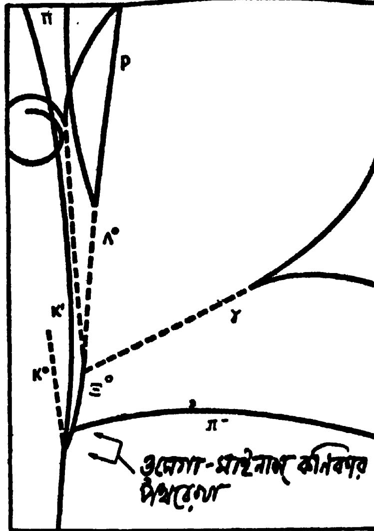
এই গোষ্ঠীটির একটা ত্রিভুজ গঠন করে থাকার কথা : তার প্রথম তলায় থাকবে চারটি ডেল্‌টা হাইপেরন, দ্বিতীয় তলায় তিনটি অনুনাদ $\bar{\Sigma}$ -হাইপেরন (Σ-হাইপেরনদের ভরের থেকে এদের ভর বেশি হলেও এরা একই গোত্রের বলে মনে হয় : একই অক্ষর দিয়ে এদের চিহ্নিত করা হয় তবে গোলমাল এড়াবার জন্যে এদের মাথায় একটা রেখা (bar) এঁকে দেওয়া হয়), তৃতীয় তলায় দুটি অনুনাদ $\bar{\Xi}$-হাইপেরন এবং ছাদে — ছাদ বলে তো কিছু নেই! অনুনাদ হাইপেরনদের গৃহ অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

যখন গেলমান দশতয়টির (দশকণাবিশিষ্ট) সম্বন্ধে অনুসন্ধান সুরু করেন, গোড়া থেকেই এই অদ্ভুত ব্যাপারটায় তাঁর কেমন খটকা লাগে। অন্যান্য বাসিন্দাদের মত "ছাদটিরও" সাধারণ ঘূর্ণন $\frac{3}{2}$ হবে, এটা ধরে নিয়ে তিনি তার ধর্মাবলী নিরূপণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এটাও মনে হল যে, ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক আধান, শূন্য আইসোটোপিক ঘূর্ণন এবং পূর্বে আবিষ্কৃত ইটা-মেসনের মত 1080 ভর, এই ধর্মগুলিও "ছাদটির" থাকা উচিত।

এখন গেলমান্ যে নতুন হাইপেরনটিকে ওমেগা-মাইনাস নাম দিলেন, তার ভর 1080 না হয়ে 3,300 ইলেকট্রন ভর হওয়া উচিত বলে দেখা গেল। আরো আশ্চর্যের কথা — নতুন কণাটি একটা বাস্তব কণা, কোন অনুনাদ সত্তা নয়। তবু কিন্তু সাধারণ হাইপেরনদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেইরকমই তার জীবনকাল — মোটামুটিভাবে এক সেকেণ্ডের হাজার কোটি ভাগের এক ভাগের মত।

যাহোক এর মানে দাঁড়াল এই যে, ওমেগা-মাইনাসের জন্যে সন্ধান চালানো যেতে পারে। বুদ্‌বুদ-প্রকোষ্ঠে তার জন্মস্থানের কাছাকাছি কোন জায়গায় বা ঐ ধরণের কোথাও হয়তো একটা চিহ্ন সে তার জীবনকালে রেখে যাবে।

ওমেগা-মাইনাসকে ধরবার পরীক্ষা প্রায় এক বছর ধরে চললো। ১৯৬৪ সালের বসন্তকালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকহাভেন জাতীয় গবেষণাগারের ত্বরণযন্ত্রে গৃহীত প্রায় এক লক্ষ আলোকচিত্র পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে পারা গেল। এগুলির একটিতে সেই বহু-প্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষাৎ মিললো।



চিত্র নং ৩২

ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখুন ; আলোকচিত্রের ফলকের উপর কণাসমূহের পদচিহ্নরেখার যে বিভ্রান্তিকর গোলক ধাঁধাঁ দেখা যায়, তার থেকে কিঞ্চিৎ অর্থ বোধহয় তাহলে উদ্ধার করতে পাবেন।

॥ কোয়ার্ক ॥

গোষ্ঠীগুলির সভ্যদের নিয়ে নাড়াচাড়া করে যে বিরাট সাফল্যলাভ করা যায়, তা প্রমাণিত হল। পেন্সিলের ডগায় যে ওমেগা-হাইপেরনের আবিষ্কার, কণা-পদার্থবিদ্যায় তা একটা সম্পূর্ণ যুগ রচনা করলো।

এই প্রথম, নতুন কণাদের একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা পাওয়া যাচ্ছে ;

কণা গণনাও, এই প্রথম সার্থক হতে সুরু করেছে। এর যা গুরুত্ব, তা মেণ্ডেলিয়েভ কর্তৃক রাসায়নিক উপাদান সংক্রান্ত পর্যায়বৃত্ত নিয়মের আবিষ্কারের গুরুত্বের থেকে কোন অংশে কম হবে না।

কণা-পদার্থবিদ্যায় আজ অনেকটা সেইরকম ব্যাপারই ঘটছে। আইসোটপিক বহুতয়ের প্রথমতঃ একতয়, দ্বিতয় ও ত্রিতয়, তারপর অতিবহুতয়ের সম্বলিত অষ্টতয়। কিম্ অতঃপরম্?

এই সংখ্যাগুলি কোনো ম্যাজিকের ব্যাপার নয় এবং তাতে ঐন্দ্রজালিক কোন বিশেষ অর্থ আরোপ করবার প্রয়োজন নেই। রাসায়নিক উপাদানের পর্যায়বৃত্ত ব্যবস্থায় আট যে একটি মূল সংখ্যা (আট ধরণের যোজ্যতা), তার অর্থ আদৌ এই দাঁড়ায় না যে, কণা জগতেও আট ঠিক ঐরকমই একটা "ঐন্দ্রজালিক" সংখ্যা।

'আট'-এর রাসায়নিক তাৎপর্য যে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাই ব্যাখ্যা করেছিল, সে কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঐ বলবিদ্যা প্রমাণ করে যে, পরমাণুর সব থেকে বাহিরের ইলেকট্রন-খোলকটিকে আটটির বেশি ইলেকট্রন অধিকার করতে পারে না; এই সব ইলেকট্রন থেকেই পরমাণুর রাসায়নিক ধর্মের সৃষ্টি। কণা জগতে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় কাজটা কিন্তু আরো শক্ত। এখানে নিয়মাবলী পারমাণবিক জগতের নিয়মাবলীর থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। মূল নিয়মগুলি জানা না থাকার ফলে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এখানে সাধারণতঃ সমস্যার সামনাসামনি মোকাবিলা করে সমাধান করে না, করে অনেক ঘোরানো পথে। একাত্মক প্রতিসাম্যের গোষ্ঠীগুলির ব্যবহার হল এইরকম একটি ঘোরানো পথ।

প্রায় একশোটা পরিচিত কণার ক্ষেত্রে আইসোটপিক ঘূর্ণন ও একাত্মক প্রতিসাম্যের ব্যবহার হয়। কিন্তু কোন্ বীজ থেকে এই উল্লেখযোগ্য কণা-গুচ্ছের জন্ম? এই সব কণার মধ্যে এমন কি কয়েকটি মূল, উৎপাদক কণা আছে, যারা শক্তিশালী, বিদ্যুৎচৌম্বক ও দুর্বল ক্রিয়ার জটিল ও সূক্ষ্ম পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অন্য কণাগুলির জন্ম দিয়ে থাকে?

এই ধরণের উৎপাদক কণা যে আছে, প্রায় দশ বছর আগে জাপানী বিজ্ঞানী সাকাতা সেই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি সেই কণাগুলির নাম দিলেন: প্রোটন, নিউট্রন ও ল্যাম্বডা হাইপেরন। বহু কারণে মূল,

প্রাথমিক কণা হিসাবে এইগুলি বেশ মানানসই ছিল। সমতা-অরক্ষণীয়তার আবিষ্কার ও দুর্বল ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণার দ্বারা এই ধারণা এবং আদিকণার এই নির্বাচন বিশেষভাবে সমর্থিত হচ্ছে বলে মনে হল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ত্রিতয় থেকে যে সব গোষ্ঠী উৎপন্ন হওয়া উচিত, সেগুলি 6 বা 15 কণা দিয়ে গঠিত হবে। অথচ পরীক্ষায় এমন গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ মেলে নি।

সেজন্য পদার্থবিজ্ঞানীরা সাকাতার প্রস্তাবকে সরিয়ে রাখলেন; আরো বেশি করে তা করা হল, কারণ পরবর্তী কয়েক বছরে কণার অষ্টতয় ও দশ-তয়ের সম্পূর্ণ গোষ্ঠীগুলির আবিষ্কারের ফলে প্রস্তাবটি অস্পষ্ট হয়ে রইল। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

খুব সম্প্রতি তিনটি প্রাথমিক কণা (কণা জগতের ধারক যেন তিনটি হস্তীবিশেষ) সম্বন্ধে একটি মতবাদ পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে এইগুলি সাকতার প্রস্তাবিত কণা তিনটি নয়। কণা পদার্থবিদ্যায় তাদের এখনো আবিষ্কার ঘটে নি।

নতুন মতবাদটির প্রবক্তা গেলমান ও স্ভাইগ কণাগুলির নাম দিয়েছেন "কোয়ার্ক"। কী আশ্চর্য সত্তা সেগুলি! তাদের অদ্ভুতত্ব সংখ্যাকে ভগ্নাংশ হতে হবে! পাঠক হয়তো বলতে পারেন, "অদ্ভুতত্ব" যে একটা বিশুদ্ধ প্রচলিত ধারণা এবং তার পিছনে চিত্রোপযোগী কোন ভৌত তাৎপর্য যে নেই, তা মনে রাখলেই তো এতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ ঘটে না।

কিন্তু বৈদ্যুতিক আধানের ব্যাপারে পাঠক নিশ্চয় বিস্মিত হবেন; ঐ আধানও ভগ্নাংশ হয়ে দেখা দেয়: ইলেকট্রন আধানের $\frac{2}{3}$ বা $\frac{1}{3}$ ভাগ। ইলেকট্রন আধান সবসময়ই অবিভাজ্য ক্ষুদ্র কণা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে! স্বভাবতই তো, সেই আধানের এক-তৃতীয়াংশ কিভাবে আবার হতে পারে?

যাহোক, কোন কোয়ার্কেরই এই পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নি। কোয়ার্কের যে বিরাট ভর ধরা হয়েছে, সেটাই বোধহয় এর কারণ — সবথেকে ভারী যে সব অনুনাদ কণা জানা আছে, তাদের ভর যেখানে 5000 ইলেকট্রন ভরের কাছাকাছি যায় মাত্র, কোয়ার্ককে সেখানে ইলেকট্রনের থেকে প্রায় 6000 গুণ ভারী বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কে জানে, হয়তো একদিন তাদের পাওয়া যাবে। যাহোক, সন্ধান চলেছে।

॥ পুরণো ধারণা পিছনে টেনে রাখে ॥

পদার্থ ও ক্ষেত্রের মধ্যে এই নিত্য ও সর্বব্যাপী সম্পর্কের ফলে পদার্থবিজ্ঞানীরা যে কার্যের সম্মুখীন হলেন, তা হল ঐ সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা এবং পদার্থক্ষেত্র ঐক্যকে বর্ণনা করার জন্য নতুন ধারণার সৃষ্টি করা। এখানে, সুদৃঢ় ধারণা নিয়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা কিছুটা রক্ষণশীল ভাগে রইল।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার যখন জন্ম হয়েছিল, তখন সাধারণ বস্তুর জগতে ব্যবহৃত সব ধারণাগুলি সে তার পূর্বতন সনাতনী পদার্থবিদ্যার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল এবং সেগুলিকে বহন করে নিয়ে গেছল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতে। সনাতনী তরঙ্গ-সূত্রের রীতি অনুযায়ী শ্রোয়েডিংগার সূত্র গঠিত হল, কেবলমাত্র পার্থক্য এই — সূত্রটিতে বর্ণিত হল সাধারণ তরঙ্গ নয়, 'সম্ভাব্যতার তরঙ্গ' ; স্থান (space) ও কালে (time) ক্ষুদ্র কণাদের গতির নিয়ম ঐ তরঙ্গের মধ্যে প্রকাশ পেল। প্রথমে পরিপূর্ণ সন্তোষলাভ করা গেল, ক্ষুদ্র কণারা স্বেচ্ছায় এই সব নিয়ম মেনে নিল।

এটা অবশ্য ঠিক যে, কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার একেবারে গোড়া থেকেই বোঝা গেছল, এই সব পুরণো ধারণা নতুন পদার্থবিদ্যায় সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হবে না। অনিশ্চয়তা সূত্র থেকে এটা স্পষ্ট হল যে, নিখুঁত অবস্থান ও বেগ, কণার শক্তি ও সময়, এ সবের পূর্বতন ধারণাগুলি ক্ষুদ্রের জগতে অত্যন্ত সীমিতভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

পারস্পরিক রূপান্তরের পক্ষে যথেষ্ট শক্তি ক্ষুদ্র কণারা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই নিরুৎসাহ সন্তোষের স্থলে দেখা দিল অসন্তোষ। স্থান ও কালে কণার গতির নিয়মগুলির বিধিবদ্ধ করার উপরি-উক্ত পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হল।

এই অবস্থাটি শুধু কল্পনা করুন : একটি কণা রয়েছে, তারপর অন্য একটি বা এমনকি কয়েকটি পাওয়া গেল, অথবা কণার স্থলে পাওয়া গেল ফোটন। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তরঙ্গ-অপেক্ষক রূপান্তরকে বর্ণনা করবার মত অবস্থায় ছিল না। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী একটি বিন্দুতে ও এক

নিমেষে রূপান্তর ঘটা উচিত। ফলে আমরা যে অন্য একটি কণা বা একটি ফোটন পাই, তাদের ক্ষেত্রে পূর্বতন তরঙ্গ-অপেক্ষক আর কার্যকর হয় না।

সে ক্ষেত্রে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা কী করত? শক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষণের পরিচিত নিয়মগুলির সুযোগ নিয়ে রূপান্তরের স্থলে সে গতির উভয় (পুরনো ও নতুন) নিয়মকে সংযুক্ত করত।

এই পদ্ধতিতে রূপান্তরের নিজস্ব প্রক্রিয়াটিকে বিবেচনা করা হত না। প্রথম কারণ হল — স্থান ও কাল, উভয়েরই একটি 'বিন্দু'তে প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হওয়ায় রূপান্তরের সময় কণাটি সাধারণ অর্থে গতিশীল নয়। দ্বিতীয় কারণ, এক ধরণের কণা অদৃশ্য হয়ে অন্য ধরণের কণা আবির্ভূত হলেও গতির সূত্রগুলিতে একটি অপরির্তনীয় ধরণের কণার সবসময় উল্লেখ থাকে।

অর্থাৎ বৃহতের জগতের ঘটনাবলীর জন্য এই সনাতনী পদ্ধতিকে যে স্থান ও কালের ধারণার সাহায্যে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় গ্রহণ করা হল, তা স্পষ্টতঃ যথেষ্ট নয়। এ জগতের, কণাদের পরস্পরে ও ক্ষেত্র-কোয়াণ্টামে রূপান্তরের এবং কোয়াণ্টামের পদার্থ-কণায় বিপরীত রূপান্তরের মূল সারাংশটি এতে প্রতিফলিত হয় না। এখন সমস্যা হল, রূপান্তরের প্রকৃত পন্থা নির্ধারণ করা। কিন্তু এতে বর্ণনার রীতির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন।

আমরা যে অলীক প্রক্রিয়াগুলির কথা বলেছি, সেগুলিকে উপস্থিত করে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এই কার্য সম্পন্ন করল। তারাও ব্যর্থ হয়েছে, সমস্যার কোন চরম সমাধান তাদের থেকে পাওয়া যায় না। আরো প্রগাঢ় কোন পদ্ধতির প্রয়োজন; তাইতে স্থান ও কালের সনাতনী ধারণার সম্ভবত মৌলিক পরিবর্তন হবে।

॥ স্পষ্ট যা, তার বিপরীত ॥

এই নতুন কিছুকে কীভাবে সুরু করা যাবে? কেউ কেউ বলেন: স্থান ও কালের ধারণাগুলিকেই ত্যাগ করুন।

তা নয়। পদার্থবিদ্যা তখন অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়বে কেননা ক্ষুদ্রের জগতের বর্তমান ধারণাগুলি তাদের অসাধারণ প্রকৃতি সত্ত্বেও স্থান ও

কাল সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত সব ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের জীবনের প্রথম দিন থেকে যে সব মৌলিক ধারণায় অভ্যস্ত, তাদের ত্যাগ করা বাস্তবিকই শক্ত। অপরপক্ষে, কণার রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত নয়, ক্ষুদ্রের জগতের এমন ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করবার জন্য, অন্তত স্থান ও কালের প্রয়োজন, কারণ এই সব ধারণা এখানে অত্যন্ত সুবিধাজনক।

অন্য একটি আরো বাস্তব পদ্ধতি আছে : স্থান ও কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলির পুনঃপরীক্ষা করা। অর্ধশতাব্দী পূর্বে আইনস্টাইন প্রথম তা করেছিলেন। আইনস্টাইনের অভিমত বৃহতের জগতে প্রযোজ্য; অতিক্ষুদ্রের জগতের বৈশিষ্ট্য দিয়ে ঐ অভিমতকে আমাদের এখন পরিপূরণ করতে হবে।

স্থান ও কালের প্রকৃত সারাংশ কী? ওরা এত পরিচিত যে, আমরা ওদের বিষয়ে কখনো চিন্তা করি না। আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তায় স্থান হচ্ছে বস্তুর আশ্রয়স্থল। আর কিছু নয়? স্থানের ধারণা কোথা থেকে এসেছে, মুহূর্তের জন্য তা চিন্তা করুন। একেবারে গোড়া থেকেই 'বিশুদ্ধ' স্থানের সঙ্গে তো মানুষের সম্পূর্ক নয়, সেই স্থান পূর্ণ করে যে সব বস্তু আছে, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। বস্তু ও দ্রব্যাদিকে দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করা হয়। আমাদের দৃষ্টির বৃহৎ অঞ্চল যদি কোন দ্রব্য অধিকার করে থাকে, তবে তা নিকটবর্তী বলে আমাদের বোধ হবে। আসলে ঘটনাটা যা ঘটছে তা' আর অন্য কিছুই নয়, তা' হচ্ছে, বস্তুটি যতো নিকটতর হবে তা থেকে ততো অধিক পরিমাণে ফোটন নির্গত হয়ে আমাদের চক্ষুকে আঘাত করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের চক্ষুতে (কোন বস্তুর সৃষ্ট) বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র যত শক্তিশালী, বস্তুটি ততই সন্নিকট বলে আমাদের মনে হয়। বিপরীতপক্ষে, স্বল্পসংখ্যক ফোটন আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করলে বোঝায় যে, বস্তুটি হয় ক্ষুদ্র (ফোটন নিঃসরণকারী পরমাণুর সংখ্যা তাইতে স্বল্প), নয়তো বহুদূরে অবস্থিত (ফোটনের মোট সংখ্যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি এসে আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করে)।

জন্মাবধি মানুষের যদি শুধু চক্ষুই থাকত, তাহলে ক্ষুদ্র নিকটবর্তী বস্তু ও দূরবর্তী কিন্তু বৃহৎ বস্তুর মধ্যে পার্থক্য, সে নির্ণয় করতে পারত না। কেবল চক্ষুর সাহায্যে, অর্থাৎ অন্য কোন মানসিক প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে বস্তুরা

আমাদের থেকে কত দূরে ও তাদের আয়তন কী, তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। স্পর্শবোধ আমাদের সাহায্য করে। বস্তুদের স্পর্শ করে আমরা তাদের আয়তনের (স্বভাবতই, আমাদের তুলনায় আপেক্ষিক) বিষয় জানতে পারি।

কোন বস্তু না থাকলে স্থান সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা হত না। যখন রাত্রিতে কোন দ্রব্য আমরা দেখি না, স্থানের অনুভূতি তখন হারিয়ে যায়।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে যে ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের সাহায্য করে, তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র। তাদের সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা কোয়ান্টাম-ঘটনাকে পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু জগৎ এমনভাবে গঠিত যে, বহু শত কোটি ঐ ধরণের ঘটনা একই সময়ে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। ফলে আমাদের সব অনুভূতি (এবং ধারণা) হল 'গড়ফল' (পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভাষায় সনাতনী)। ঐ ঘটনাবলীকে স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করলে কোয়ান্টাম নিয়মগুলির অসাধারণ প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের মানসলোকে স্থানই (space) যে কেবল পদার্থজাত, তা নয়। যদি আমরা এমন অবস্থায় পড়তাম যে, আমাদের চারধারে কোনো কিছুর পরিবর্তন হয় না (মাটির অনেক নিচে এটা ঘটে এবং ভবিষ্যতে যে সব মহাকাশচারী গ্রহ-নক্ষত্রাদির থেকে বহু দূর দিয়ে ও একই সঙ্গে বহু বছর ধরে, চলতে থাকবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও সম্ভবত এটা ঘটবে), তাহলে আমরা সময় সম্পর্কে সব বোধ হারাব এবং সেজন্য সে সম্পর্কে কোন ধারণাও আমাদের থাকবে না।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, মূলতঃ দু'ধরণের সময় আছে। কোন বস্তুর ভিতরের পদার্থগত (ও রাসায়নিক) প্রক্রিয়াদির দ্বারা নির্ধারিত বস্তুটির 'স্বপ্রার্থ সময়' এবং বস্তুদের বৃহৎ সব সমষ্টির দ্বারা নির্ধারিত 'সাধারণ সময়'। ফলে, ঠিক যেমন বস্তু থেকে মুক্ত কোন স্থান নেই, সেইরকম ঘটনা থেকে মুক্ত কোন সময় নেই।

কার্যকারণের একত্র সংবদ্ধ শৃঙ্খলশ্রেণীরূপ যে ঘটনাবলী, তাদের দ্বারা সময়ের গতি নির্ধারিত হয়। বস্তুদের কোন ব্যবস্থায় ঘটনাগুলি যত বেশি সক্রিয়, ততদ্রুতবেগে তারা পরস্পরকে অনুসরণ করে (অন্য কথায় বলতে

গেলে, সেই ব্যবস্থায় পারস্পরিক ক্রিয়া তত তীব্র), ব্যবস্থাটিতে সময়ের প্রবাহ তত 'দ্রুত'।

স্মরণ থাকবে যে, এই সিদ্ধান্তটি আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাতেও সুসমর্থিত হয়। ঘটনাপূর্ণ দিন 'দেখতে না দেখতে' কেটে যায়, আর ঘটনাশূন্য দিন 'কাটতেই চায় না'। এই ভাবতান্ত্রিক অনুভূতির পিছনে একটি অত্যন্ত প্রগাঢ় বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি রয়েছে।

॥ সর্বব্যাপী কোয়াণ্টাম ॥

স্থান ও কালের এই নতুন ধারণাগুলি পদার্থবিজ্ঞানীরা সকলে এখনো গ্রহণ করেন নি। আরো বড় কথা কি, পরীক্ষার দ্বারা ওগুলি এখনো সমর্থিত হয়নি।

ত্রিশ বছরেরও বেশি আগে ঐ সব ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখনো সাধারণভাবে তারা প্রচলিত হয়নি। যাহোক বহু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, তাদের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে।

ক্ষুদ্রের জগতে বস্তুদের এবং তাদের গতির অস্তিত্ব সমেত স্থান ও কালের যে সম্পর্ক, তার সম্বন্ধে মূল প্রতিপাদ্য হল কিছুটা এইরকম : যেহেতু ক্ষুদ্র কণা ও তাদের গতির কোয়াণ্টাম-ধর্ম আছে, স্থান ও কালেরও সেজন্য কোয়াণ্টামে বিভক্ত হওয়া উচিত। তাই যদি হয়, তবে সনাতনী ধারণার সর্বশেষে ঘাঁটিটিরও পতন হবে। স্থান ও কাল তাদের অবিচ্ছিন্নতা হারাবে এবং ভেঙ্গে গিয়ে তারা ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সব 'অংশে' পর্যবসিত হবে।

এর অর্থ যা দাঁড়ায়, তা হ'ল—বিশেষ ধরণের যাকে বলে 'কোষ' তাই থাকা উচিত : যেন স্থান ও কালের কোয়াণ্টাম সেগুলি। তাদের আয়তনকে সম্ভবত নির্ধারণ করবে ক্ষুদ্র কণাদের ভর, শক্তি, ভরবেগ (ও বোধ হয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্য)। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই এই কোষগুলি সম্ভাব্য সব রাশির মধ্যে ক্ষুদ্রতম হবে।

কিন্তু এ পর্যন্ত এই রকম কোন 'মৌল দৈর্ঘ্য' বা 'সময়ের মোল ব্যবধানে'র কথা আমরা জানি না। তার অর্থ হয়তো এই যে, ক্ষুদ্রের জগতের দৈর্ঘ্য ও সময়কে পরিমাপ করার সবচেয়ে নিখুঁত আধুনিক পদ্ধতির ধারণ ক্ষমতার তারা বাইরে। এই সব পদ্ধতির সীমা হচ্ছে — দৈর্ঘ্যের দিক থেকে কেন্দ্রকীয়

বলের পরিসর যা হল 10^{-13} সেন্টিমিটারের মত, আর সময়ের দিক থেকে কেন্দ্রকীয় সময়' অর্থাৎ 10^{-23} সেকেণ্ডের মত। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, 'দৈর্ঘ্যের কোয়াণ্টাম' থাকলেও তা শত শত গুণ বা এমনকি হাজার হাজার গুণ ক্ষুদ্রতর হবে।

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ধারণা। স্থান ও কালের কোয়াণ্টামকে আমরা কখনো কেন লক্ষ্য করি না তা বোঝা যায়। তার সহজ কারণ — তারা অত্যধিক ক্ষুদ্র। সেকেণ্ডের কোটি ভাগের কোটি ভাগের কোটি ভাগের মত সময়ের এক ভগ্নাংশকে কোন ঘড়িতেই মাপা যায় না। দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, সেন্টিমিটারের একই ভগ্নাংশ!

কিন্তু স্থান ও কালের এমন অদ্ভুত ভগ্নাংশকে মাপার ক্ষমতা যদি আমাদের থাকতও, বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কখনো তাদের মাপতে পারতাম না। যন্ত্রাদি হল স্থূল বস্তু, ক্ষুদ্রের জগতে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ঐ জগৎকে তা পরিবর্তিত করে ফেলে। পরিশেষে স্মরণ করুণ যে, দৈর্ঘ্য ও সময় সম্পর্কে আমাদের সনাতনী ধারণা ক্ষুদ্রের জগতে সীমিত এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই কেবল তারা কার্যকর হয়। এই সব সীমা হচ্ছে ক্ষুদ্র কণাদের একটি দ্বিমুখ পদার্থ-ক্ষেত্রসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য। স্থান ও কালের যে কোয়াণ্টামগুলির কথা আমরা বলছিলাম, ঐ সব সীমাই আবার সেই কোয়াণ্টামরাশি।

তাহলে এ জাতীয় কোষ বা সময়ের কোয়াণ্টামের উপস্থাপনার কি কোন অর্থ হয়? স্থান ও কাল সম্পর্কে আমাদের প্রাত্যহিক ধারণাকেই কি তারা প্রতিফলিত করতে থাকে না?

ঠিক কথা, আমরা প্রায়ই বলেছি : জ্ঞানের প্রতিটি নতুন স্তরের উদ্ভব হয় পূর্বতন স্তরসমূহের ভিত্তির উপর, শূন্যতার মধ্যে নয়। নতুন ধারণা গঠনের একান্ত নির্মম প্রক্রিয়াটি রাতারাতি ঘটে না। প্রক্রিয়াটি চলে ধীরগতিতে এবং নতুন ধারণা সবসময় তাদের পূর্বপুরুষদের চিহ্ন বহন করে। নতুন ধারণার জন্ম সর্বদাই এক প্রসূতি বেদনা।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রথম বছরগুলিতে ব্যবস্থা এইরকম ছিল এবং কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এখন যখন আরো বড় বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, এখনো ঐরকমই চলছে। সে কি বিজয়ী হবে, না নতুন আরো শক্তিশালী কোন তত্ত্বের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়ে পরাজয় বরণ করবে।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা থেকে… ?

॥ অনির্দেশ্য নির্দেশক ॥

ভর, আধান, ঘূর্ণন, সমতা। কণার এই বৈশিষ্ট্যগুলির যথার্থ সংজ্ঞা যদি আপনি স্থির করেন ও ঐ সব সংজ্ঞাকে আত্মনির্ভর করে তোলেন, অর্থাৎ কোন একটি রাশিকে অন্য কোনটির মাধ্যমে প্রকাশ না করেন — যেমন ধরুন, ভরকে ওজনের বলের মাধ্যমে বা আধানকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বলের মাধ্যমে — তাহলে দেখবেন আপনি সামান্যই এগতে পারছেন। আমরা সবসময় এই সব ধারণাগুলি ব্যবহার করছি, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ যে প্রকৃতপক্ষে কী, পৃথিবীর একজন পদার্থবিজ্ঞানীও আজ তা জানেন না।

আজকের দিনে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার এই হচ্ছে অবস্থা। সনাতনী পদার্থবিদ্যা থেকে ভর, আধান ও অন্যান্য ধারণা গ্রহণ করে সেগুলির পর্যাপ্ত ব্যবহার করা হচ্ছে এই বলবিদ্যায়। কণার কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য এ নিজেও আবিষ্কার করেছে—যেমন, ঘূর্ণন ও সমতা। কিন্তু ভর ও আধানের উৎপত্তি সম্পর্কে এ যেমন কিছু বলতে পারে না, ঐ সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সেই একই কথা।

সত্যই তো, ভর বলতে কী বোঝায় ? এর দুটি উত্তর আছে। প্রথমত, কোন বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ পদার্থ আছে, তার পরিমাণ হল ভর। নির্দিষ্ট আয়তন বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে যে পরমাণু কেন্দ্রগুলি আছে, ভর বলতে তাদের পরিমাণকে বোঝানো যেতে পারে (কারণ পরমাণুর ভরের অধিকাংশই এই সব কেন্দ্রকের মধ্যে থাকে)। আবার ঐভাবে কেন্দ্রকের ভরকে ব্যাখ্যা করা চলে কেন্দ্রকীয় কণা, প্রোটন ও নিউট্রনের পরিমাণ হিসাবে।

কিন্তু প্রোটনের ভর তাহলে কী ? প্রোটনের ভিতরের পদার্থের যে পরিমাণ, তার পরিমাপকে কি আগের মত এর ভর বলা চলে ? কী সে পরিমাপ ? সে পদার্থই বা কী ? কোন বস্তুকে পরিমাপ করার যে ধারণা, তার অর্থই হল এই যে, বস্তুটিকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে ফেলা সম্ভব। কিন্তু প্রোটনকে তো আর ভাঙা যায় বলে মনে হয় না। সুতরাং প্রোটনের মধ্যে পদার্থ যে কেমন, আমরা তা কেবল আন্দাজ করতে পারি।

আমরা যখন বলি, প্রোটনের ভর প্রায় 10^{-24} গ্রাম, আমরা তা দিয়ে কেবল বোঝাই যে, এক গ্রাম দ্রব্যের মধ্যে প্রায় 10^{24} প্রোটন আছে। সেজন্য প্রোটন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে দ্রব্যের পরিমাপকে ভরের সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করা খানিকটা অর্থহীন।

ভরের দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুসারে ভর হচ্ছে, কোন বস্তুর জাড্যের পরিমাপ বা অন্য কথায় বলতে গেলে, বস্তুটির অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে গেলে ঐ বস্তু যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, তার পরিমাপ। সব থেকে সরলতম ক্ষেত্রে ভর হচ্ছে, কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনে বস্তুটির প্রতিরোধের নির্ধারক।

তাহলে অন্যান্য কণার বলের দ্বারা গতিসম্পন্ন হতে প্রোটনের যে একটা অনিচ্ছার ভাবের মত আছে, সেই অনিচ্ছার পরিমাপকে বোধহয় আমাদের প্রোটনের ভর বলে মনে করা উচিত। এই সংজ্ঞাটিও কিন্তু সন্তোষজনক নয়। বল বলতে পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝায়; চরম বিশ্লেষণে এই ক্রিয়া ক্ষেত্রজনিত। কোন প্রোটনের গতি যখন বাড়ে, ক্ষেত্র থেকে সে তখন অতিরিক্ত ভর লাভ করে; তার গতি যখন কমে, ক্ষেত্রকে তখন সে এই ভর ফেরত দিয়ে দেয়। এই সব লাভ করা বা হারানো ভরের অংশ সামান্য হলেও তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অতএব ভরের পরিমাণ পরিবর্তনশীল; নির্দিষ্ট পরিমাপের ধর্ম সেজন্য এর থাকতে পারে না।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, অণু-পরমাণুর জগতে ভরকেই অন্য কিছুর সাহায্যে পরিমাপ করতে হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে, আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র অনুসারে প্রোটনের ভরকে নির্ধারণ করে, প্রোটনের স্থিতি-ভর ও আলোর গতিবেগের সঙ্গে তার গতিবেগের অনুপাত।

আশার একটি ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। নির্দিষ্ট ধরণের কণার স্থিতি-ভরের পরিমাণ বস্তুত অপরিবর্তনীয়। ঐ পরিমাণের পরিবর্তন হলে কণাটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাহলে কি এইটাই বোঝায় না যে, জাড্যের পরিমাপও হল স্থিতি-ভর? যাই হোক সাধারণ যান্ত্রিক গতি অর্থাৎ স্থানান্তর ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না; এটা বলা চলে গতির বিস্তৃততম অর্থে—কণার রূপান্তরের ক্ষেত্রে।

এবার যেন সত্যের কাছাকাছি আসা গেছে। আমাদের স্মরণ হচ্ছে, কোন কণার গতীয় শক্তি যখন ঠিক তার স্থিতি-ভরের দ্বারা স্থিরীকৃত যথার্থ

শক্তির সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠে, তখন ক্ষেত্রের কোয়ান্টামে কণাটির প্রকৃত রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কিন্তু তা যদি হয়, তবে স্থিতি-ভর গুণগতভাবে কণার স্থায়িত্বের পরিমাণ। কয়েকটি কণার ক্ষেত্রে এই ভর খুব বেশি নয়; কোয়ান্টামে তাদের রূপান্তর অপেক্ষাকৃত স্বল্প শক্তিতে সুরু হতে পারে। অন্যান্য কণার ক্ষেত্রে এই ভর অনেক বেশি হওয়ায় তাদের স্থায়িত্বও যথেষ্ট বেশি।

প্রচলিত মত অনুসারে কণার যেমন প্রকৃত রূপান্তর হয়, সেইরকম তার তথাকথিত অলীক রূপান্তরও হতে পারে — যে রূপান্তর রয়েছে কণাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার মূলে। ক্ষেত্রের অলীক কোয়ান্টামের শক্তি নির্ধারণ করার ব্যাপারে ভরের আর একটি বৈশিষ্ট্যও এভাবে দেখা যাচ্ছে।

এই সবের ফলে ভরের ধারণা অত্যন্ত জটিল। একদিকে ভর কণার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; অন্যদিকে তা কণার পারস্পরিক ক্রিয়ার নির্ধারক।

নিঃসন্দেহেই কণার অন্যান্য বৈশিষ্টগুলিও সমানই জটিল। ক্ষুদ্রের জগতের বস্তুগুলির গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটনের যাবতীয় সমস্যা আজ পদার্থবিদ্যার যে সর্বোচ্চ অজেয় শিখরের সম্মুখীন, সেই শিখর হচ্ছে — দ্রব্য ও ক্ষেত্র, পদার্থের এই দুই মৌল আকারের সম্পর্কের দুর্বোধ্যতা।

দ্রব্যের কণায় রয়েছে ক্ষেত্রের গুণ, আবার ক্ষেত্রের কোয়ান্টামে আছে দ্রব্যের ধর্ম···

কোন্‌টি 'সবথেকে মৌল', কোন্‌টি প্রাথমিক — দ্রব্য না ক্ষেত্র?

এক শতাব্দী পূর্বে, পদার্থবিদ্যা যখন সবেমাত্র ক্ষেত্রের ধারণা লাভ করেছে, তখন উত্তর ছিল সুস্পষ্ট: অবশ্যই দ্রব্য। কোন দ্রব্যের কণা তার চারপাশে একটি ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। কণার পারস্পরিক ক্রিয়ার মোকাবিলা করার জন্য ক্ষেত্র একটি সাহায্যকারী হাতিয়ার। পদার্থ না থাকলে ক্ষেত্রের অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল, ক্ষেত্র থেকেও কণার জন্ম হতে পারে এবং কণা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। যেমন ভাবা গেছল ক্ষেত্রটা ঠিক সেরকম শুধু সাহায্যকারী নয়।

তারপর পদার্থবিজ্ঞানীরা পৌঁছলেন অন্য চরম সিদ্ধান্তে। আইনস্টাইনের ইঙ্গিত অনুসরণ করে তাঁরা বললেন ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাথমিক — একটি একমেবা-

দ্বিতীয়ম্ বিশ্বজনীন ক্ষেত্র, নানাবিধ অভিব্যক্তির সবগুলির মধ্যে সেই ক্ষেত্রের প্রকাশ। পদার্থের কণা হল ক্ষেত্রের বুদ্বুদমাত্র। ক্ষেত্র না থাকলে পদার্থের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

যত ধরণের ক্ষেত্র ও কণা জানা আছে, সেই সবগুলিকে মিলিত করবে এমন এক একীভূত তত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় আইনস্টাইন বহু বছর অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। পদার্থবিজ্ঞানীদের ক্রমে ক্রমে এই অভিমত গড়ে ওঠে যে, ক্ষেত্র বা দ্রব্য কোনটিই প্রাথমিক নয়, দুটিই সমানভাবে পদার্থের মৌল ও প্রাথমিক অবস্থা।

ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে, ঐটিই নির্ভুল অভিমত। সুতরাং একীভূত ক্ষেত্র ও একীভূত পদার্থের অনুরাগীদের তর্কের অবসান হতে পারে। বিজ্ঞানীরা তবুও তর্ক করতে থাকেন: ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান কতখানি নির্ভুল? তাঁদের ধারণা কি এই সব বস্তুর প্রকৃত সারাংশের সঙ্গে মেলে? মানুষের মনের তৈরী তত্ত্ব প্রকৃতির উপর আরোপ করে তাঁরা কি ভুল করছেন না? পরমাণু কেন্দ্রক ও মৌল কণার ক্ষুদ্র জগতে যে সব বস্তু ও ঘটনার উদ্ভব, বৃহৎ বস্তুর জগতের প্রতিনিধি মানুষের পক্ষে তা জানা কি আদৌ সম্ভব?

মানুষ প্রকৃতির নিয়মাবলীকে আয়ত্ব করতে এবং ক্রমশ সত্যের দিকে এগতে পারে কিন্তু জানার প্রক্রিয়াটির কোনদিনই সমাপ্তি ঘটবে না এবং পৃথিবীর কোন জ্ঞানই কখনো একেবারে নিখুঁত হবে না।

পদার্থের দুটি মৌল আকারের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেমনভাবে বোঝা উচিত, উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে পদার্থবিজ্ঞানী সেই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন।

সর্বপ্রথম, একীভূত ক্ষেত্র বা একীভূত দ্রব্য কি থাকতে পারে? না। ক্ষেত্র ও দ্রব্য হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্বের ও তার ক্রমবিকাশের দুটি বিপরীত প্রকাশ। একটি না থাকলে অন্যটি অসম্ভব। একই পদকের দুটি পিঠ। বিপরীত হলেও তারা একাত্মক ও অচ্ছেদ্যবন্ধনে বদ্ধ। ক্ষেত্রের রয়েছে দ্রব্যের গুণ, আর দ্রব্যের রয়েছে ক্ষেত্রের গুণ।

পদার্থের এ দুটি আকারের অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় কি কিছুটা সত্য আছে? হাঁ, নিশ্চয় আছে, কেননা একেবারে সঠিক না হলেও এই ধারণাগুলি মোটামুটিভাবে নির্ভুল।

সাধারণত, আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি, তা এই ধারণা দুটির কাঠামোয় মানিয়ে যায়, এবং তাদের উপর ভিত্তি করে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তা সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়।

তাহলে পদার্থবিজ্ঞানীরা যে ফলাফল লাভ করেন, কেমনভাবে তার ব্যাখ্যা করা উচিত, তাই নিয়ে তাঁরা তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন কেন? প্রথম কারণ, সব পদার্থবিজ্ঞানীরা দ্বন্দ্বমূলক-সমন্বয়ী (ডায়ালেকটিক) বস্তুবাদের সঙ্গে পরিচিত নন। বিরুদ্ধবাদী দর্শন, বিশেষত আত্মগত ভাববাদ নামক সবথেকে অনিষ্টকর ধারাটির মতে বিশ্বের অস্তিত্ব কেবল মানুষের কল্পনায় এবং সেজন্য প্রাকৃতিক নিয়মগুলি মানুষের মন থেকে উদ্ভূত, তাদের সম্বন্ধে, খুব বেশি হলে এই পর্যন্ত বলা চলতে পারে। এরকম একটি দর্শন অবলম্বন করে অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীও পদার্থবিদ্যার আবিষ্কারগুলিতে যথেষ্ট বাস্তব তাৎপর্য আরোপ করতে ইচ্ছুক নন। এই বিজ্ঞানীরা বিশ্বকে অজ্ঞেয় বলে মনে করেন।

এ ধারণা আরো সহজ হয়েছে, কারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না, তাকে দেখে কেউ যে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবে, সেটা সম্ভব নয়। আরো গুরুতর হল — অণু-পরমাণুর জগতের ধর্মগুলি আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ চিরাচরিত জগতের ধর্মগুলি থেকে মূলতঃ পৃথক। এই পার্থক্য এত বেশি যে, আমাদের প্রাত্যহিক ধারণায় ক্ষুদ্রের জগতের প্রকৃত সারমর্ম প্রতিফলিত হয় না।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এমনভাবে ঘটে যে, নতুন ধারণা অত্যন্ত ধীরে জন্ম নেয়। যতই হোক, মানুষ সাধারণ বস্তু ও সাধারণ ধারণার জগতে বাস করে এবং তার মন সেই সব ধারণাকে অত্যন্ত সজোরে আঁকড়ে থাকে। যে সব ধারণাতীত ধারণা দিয়ে ক্ষুদ্রের জগতের নির্ভুল চিত্র তৈরী করা যায় মনকে দিয়ে সেগুলি গ্রহণ করানো অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু গ্রহণ করাতে হবে। একটি 'ক্ষুদ্র কণা' তো শুধু একটি কণাই নয়, তার সম্বন্ধে তাই কথা বলা এবং চিন্তা করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক; ক্ষেত্রের থেকেও আরো কিছু বেশি যে 'ক্ষেত্র' তার সম্বন্ধে কথা চালিয়ে যাওয়াও ঐরকম অসুবিধাজনক। এখানে ব্যবহৃত শব্দের জন্য অসুবিধা তত নয়, বরং অসুবিধা হল চিত্রকল্প, ধারণা ও অনুমানের জন্য।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পুরণো ধারণাগুলির সঙ্গে নতুন কণা-তরঙ্গ, পজিট্রন হোল্ ও মেসন-কোয়ান্টাম কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছে। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মনে একীভূত বাস্তবের সঙ্গে এই দ্বৈত সত্তাগুলির সম্পূর্ণ মিশ্রণ ঘটে নি।

এই মিশ্রণ ঘটবে অদূর ভবিষ্যতে।

॥ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জীবনচরিত ॥

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অস্তিত্বের প্রায় ষাট বছরে এই বিদ্যা ক্রমবিকাশের তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছে।

প্রথম পর্যায়টি প্লাঙ্ক থেকে দ্য ব্রগলি পর্যন্ত ২৫ বছরব্যাপী — আলোক তরঙ্গের পদার্থধর্মের আবিষ্কার থেকে সুরু করে পদার্থ কণার তরঙ্গধর্মের আবিষ্কার পর্যন্ত। এই ক'বছর ধরে আলোক-কণার (ফোটন) তত্ত্ব এবং পারমাণবিক গঠন ও পারমাণবিক ঘটনাবলীর প্রথম অত্যন্ত অসম্পূর্ণ তত্ত্বের বিকাশ সাধন করেন আইনস্টাইন ও বোর।

১৯২৪ সালে দ্য ব্রগলির আবিষ্কারে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। ৫ বছরের মত আশ্চর্যরকম সংক্ষিপ্ত সময়ে নতুন তত্ত্বটির মূল 'কার্যোপযোগী যন্ত্রে'র সৃষ্টি হয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন ডিরাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে পরমাণু কেন্দ্রকের তত্ত্ব গড়ে ওঠে।

সর্বশেষে — দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে — তৃতীয় পর্যায়ে মৌল কণা ও পদার্থের দ্বিতীয় মূল আকারস্বরূপ ক্ষেত্র, এই দুই বিষয়ের গবেষণাতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রসারিত হয়।

এই তৃতীয় পর্যায়কালে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে বড়ই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম কয়েক বছরের চমকপ্রদ বিজয়ের পর বিপর্যয় ও ব্যর্থতার পালা আসে।

মনে হচ্ছে যে, অণু ও পরমাণুর ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কার্যকর হলেও মৌল কণার গঠন ও তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া, এই অত্যন্ত কঠিন সমস্যার পক্ষে ঐ বলবিদ্যা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

পরীক্ষানিরীক্ষা আজ তত্ত্বের থেকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। পরমাণু কেন্দ্রকের গভীর অভ্যন্তরের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা তত্ত্ব এখনো দিতে পারে নি। তার কর্মসূচীতে রয়েছে মৌল কণার ধারণার প্রকৃত সারাংশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী।

এই সব সমস্যার সমাধানে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা এখনো সাফল্য লাভ করে নি। বিশ বছর আগে এর যে সীমাবদ্ধতাগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সুদূর মনে হত, সেগুলি এখন ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার পুনর্যৌবন প্রাপ্তির এখন প্রকৃষ্ট সময়।

এ শতাব্দীর সুরুতে সনাতনী বলবিদ্যার ক্ষেত্রে যে অবস্থা ছিল, তাই কি এতে মনে পড়ে যায় না?

একদিকে, এমন কোন ঘটনা আছে বলে মনে হয় না, যা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার মূল প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। এ হল কেবল কয়েকটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা — এই অক্ষমতা তত্ত্বের নিজস্ব, তত্ত্বের পিছনের বিজ্ঞানীদের অক্ষমতা নয়। হয়তো দরকার যা, তা হচ্ছে কাঠামোর প্রসারের; হয়তো তত্ত্বটিকে শক্তিশালী করার জন্য এতে নতুন, গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পরবিরোধী নয়, এমন সব প্রস্তাব সংযোজন করা আবশ্যক।

তবুও হয়তো এই সব প্রস্তাব আগেকার প্রস্তাবগুলির সঙ্গে মানাবে না। তখন কিছুকাল আমরা নিরুৎসাহ বোধ করব। সর্বশক্তিশালী তত্ত্ব কখনো হয় নি, হবেও না। সাধারণভাবে জীবনের মতই প্রত্যেক তত্ত্বেরও আছে দুর্বল শৈশব; আছে সবল যৌবন, যখন তা গোছা গোছা অতি কঠিন সমস্যার সমাধান করে; আছে শান্ত-প্রৌঢ়ত্ব, অগ্রগতি যখন মন্থর হয়ে আসে, তত্ত্বটি বিস্তৃত হয়ে নিয়ত প্রশস্ততর ঘটনাজগতে আধিপত্য বিস্তার করে, অনুপ্রবেশ করে শিল্প ও শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করে; সর্বশেষে আছে বার্ধক্য, যখন নতুন সব ঘটনা, তত্ত্বটির নিজেরই আবিষ্কৃত ঘটনাবলীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তার আর কোন ক্ষমতা থাকে না।

তখন নিশ্চলতার একটা পর্যায় সুরু হয়। অন্ততঃ সেই রকম মনে হয়, যদিও ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। নতুন নতুন ধারণা সবসময়ই দেখা দিচ্ছে, যে সব ধারণার পক্ষে পুরণো তত্ত্বের কাঠামো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। যে

খোলার মধ্যে এই সব নতুন ধারণা আবদ্ধ হয়ে আছে, কোন একদিন সেটিকে এরা ভেঙে ফেলবে ; বিজ্ঞানের তখন হবে এক বিরাট অগ্রগতি।

বয়সের যে ধারার কথা আমরা এইমাত্র বর্ণনা করলাম, সেই ধারা হিসাবে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা আজ তার চূড়ান্ত পরিণত অবস্থায় পৌঁচেছে, ধীরে ধীরে আসছে বার্ধক্য। অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক কৃতিত্বে এর অবদান রয়েছে, নক্ষত্র-ব্যবস্থার গঠন থেকে সুরু করে পরমাণু কেন্দ্রক ও মৌল কণার গঠন পর্যন্ত সমস্যাবলীতে এর হস্তক্ষেপ ঘটেছে। পদার্থবিজ্ঞানের দিক থেকে আজ কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা হল অণু-পরমাণুর জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী তত্ত্ব।

এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমন কোন তত্ত্ব নেই, কিন্তু এমন একটি তত্ত্বের নিঃসন্দেহে প্রয়োজন রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে যে সব বিজ্ঞানী কাজ করছেন, তাঁদের চেষ্টা হল, হয় এর মূল প্রতিপাদ্যের বিরোধী নয়, এমন সব নতুন বিষয়ের সাহায্যে একে পুনর্যৌবন দান করা, নয়তো এর চরিত্রকে পরিবর্তন করে আরো মৌল কোন কিছুকে এর স্থলাভিষিক্ত করা। তাঁরা বলেন বটে, এটিতে ত্যাগ করা যাক, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনরকম সাফল্যের গর্ব কেউ করতে পারেন না।

যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে আরো অসাধারণ কোন কিছু, একটি 'আরো উদ্ভট' তত্ত্ব, এই মতের সমর্থক বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। 'আরো উদ্ভট', এ কথাটিকে কেউ ভয় পান না, কারণ মূলতঃ যা কিছু নতুন, পুরনোর কাছ থেকে তা ভয়ঙ্কর বাধা পেয়ে থাকে। লেখককে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার উপদেশ দেন, এমন লোকের কোন সময়ই অভাব নেই। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার যখন জন্ম হয়, তখনো একই রকম অবস্থা ছিল। কিন্তু এখন বোধ করি একজন বিজ্ঞানীও নেই যিনি এটাকে গ্রহণ করেন না।

এ সব যাই হোক, একটি বিষয় কিন্তু নিশ্চিত : পদার্থবিদ্যা আজ নতুন বিরাট অগ্রগতির দ্বারদেশে। এ অগ্রগতি অন্ধকারের মধ্যে নয়, কারণ নতুন পদার্থবিদ্যা যে পথে এগবে এবং সেই পথে যে সব স্টেশন পড়বে, বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই তা দেখতে পাচ্ছেন।

তাদের কয়েকটির কথা এখানে বলছি ; সমস্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মৌল কণার একটি সুদৃঢ় একীভূত রীতিসম্মত ব্যবস্থা ; পদার্থকণার গঠন ও

আভ্যন্তরীণ ধর্ম ; পরমাণু-কেন্দ্রকে যে সব বল কার্যকর, তাদের প্রকৃতি ; দ্রব্য ও ক্ষেত্র — পদার্থের এই দুটি মৌল আকারের পারস্পরিক সম্পর্কের নির্ভুল নিয়ম ; শক্তি ও সময়, ভর ও দেশ, গতিশীল পদার্থের এই সব ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা ; ঐ সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র জগতের বিশেষ সারভাগ।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কেমন করে জন্ম হল, কেমনভাবে এ বেড়ে উঠল, আজ এ যে বিজ্ঞানের শক্তিশালী হাতিয়ার, কেমনভাবে তা সম্ভব হল, — এ বইতে আমরা এ সব বর্ণনা করেছি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কেমনভাবে পদার্থবিদ্যার বর্তমান সমস্যাগুলির মোকাবিলা করছে এবং পদার্থের আরো ক্ষুদ্রতর জগতে — যাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগৎ বলা যায় — তাতে প্রবেশের পথ অনুসন্ধান করছে, আমরা সে সব কথা বলেছি। নতুন ক্ষুদ্রত্বের এই জগৎই আজকের সমস্যা।

॥ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পালে লাগল আবার হাওয়া ॥

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দুটি জীবনকাল থাকে। প্রথমটির কারবার হল মত, ধারণা, নিয়ম ও সূত্র নিয়ে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ওইগুলিকে রূপায়িত করে সৃষ্ট হয় প্রাযুক্তিক উপকরণ, — হাতিয়ার, যন্ত্র, কল।

বৈজ্ঞানিক মনের চক্রগতি যতই বিমূর্ত হোক, মানুষ ও তার প্রয়োজনের বাস্তব জগতে তা সব সময়ই ফিরে আসে।

দার্শনিকরা কেবল জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু যা দরকার, তা হল এর পরিবর্তন — মার্ক্সের এই বিখ্যাত কথাগুলি শুধু দর্শনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য নয়, এদের মধ্যে রয়েছে যে কোন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রকৃত অর্থ।

প্রতিটি নতুন আবিষ্কারেই মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ অধিকতর শক্তিশালী হয়। সারা ইতিহাসে আবিষ্কারের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, যত দিন যাচ্ছে, কোন বিরাট আবিষ্কার ও মানুষের প্রয়োজনে তার প্রয়োগের মধ্যে যে ব্যবধান, তা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে।

মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়, বিজ্ঞান ভবিষ্যতের সেই সমস্যাগুলি উপলব্ধি করতে পারে। এই দূরদৃষ্টি দেবতা বা প্রতিভাবানদের কৃপাবর্ষণ নয়, এ হল বিষয়াশ্রিত বাস্তবতা—এরই কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সমাজের ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যা, তার পরিণত অবস্থার জন্য বিজ্ঞানীরা অপেক্ষা করেন না। বিজ্ঞানীরা হৃদয়ঙ্গম করুন বা নাই করুন, নতুন সব সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই বিজ্ঞানীদের হস্তক্ষেপের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞান মনুষ্যসমাজের সবথেকে অগ্রবর্তী স্তম্ভ, ভবিষ্যতের সন্ধানী ও বর্তমানের সবথেকে নির্ভরযোগ্য রক্ষক।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে কাজ করতে পারে। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার দ্বিতীয় জীবনকাল একটু পর্যালোচনা করা যাক।

পরমাণু-কেন্দ্রকের ধারণা গড়ে ওঠে প্রায় ১৯১২ সালে। বিশ বছর পরে ঐ ধারণার চিত্রটির বাইরের রেখাগুলি পরিষ্কার হল। যে কণাগুলি দিয়ে কেন্দ্রক গঠিত, তাদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হল; কেন্দ্রকের কণাদের মধ্যে যে সব বল কার্যকর রয়েছে, তারা আবিষ্কৃত হল, ব্যাখ্যা করা হল তাদের। কার্যতঃ ও ধারণাগতভাবে, উভয় দিক দিয়েই পরমাণু-কেন্দ্রকের 'অগম্যতা' পদার্থ-বিজ্ঞানীদের নিরস্ত করতে পারে নি। ত্রিশ বছর পরে পারমাণবিক যুগের সূচনা দেখা গেল। এ কথা সত্য যে, ঐ সূচনা হল ভয়ঙ্কর পারমাণবিক বোমার আকারে; হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর আমেরিকানরা ঐ বোমা নিক্ষেপ করল এবং প্রাচুর্যের পরিবর্তে এল মৃত্যু ও ধ্বংস। তারপর মাত্র কয়েকটি বছর কেটে যেতে ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্রিয় করে তুলল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পরমাণুর শক্তিকে যুদ্ধ ও ধ্বংসের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে শান্তি ও গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করলেন।

পারমাণবিক চুল্লীর ভয়াবহতায় কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রথম কারিগরী প্রয়োগ। ঐ চুল্লীতে নিউট্রনের ধারা ভারী পরমাণুর কেন্দ্রককে বিভক্ত করলে উত্তাপ ও বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর আরো শক্তি উদ্ধারের চেষ্টায় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ল হাইড্রোজেনের আইসোটোপ দুটির হালকা পরমাণু-কেন্দ্রকের উপর। শান্তির জন্যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তাপকেন্দ্রীন প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য। আগামী হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে শক্তি সরবরাহ করা — সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এই হচ্ছে মহান উদ্দেশ্য।

এখানেও কোয়ণ্টাম বলবিদ্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে। সংযোজন প্রক্রিয়ার ধারা এ নির্ণয় করে এবং কতখানি শক্তি উৎপন্ন হবে, তা বলে দেয়।

কিম্ অতঃপরম্? আরো নতুন সমস্যা। আজ আমরা যে সব সমস্যা জানি, তাদের থেকে অনেক বেশি কঠিন সমস্যা। তবে আজকের তুলনায় ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের প্রস্তুতি আরো উন্নত হবে।

এই সেদিন পর্যন্ত গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার ফলাফল নিয়ে কদাচিৎ চিন্তা করতেন। এই শতাব্দীর গোড়াতে তথাকথিত অকেজো পদার্থের বিষয়ে যিনি আগ্রহান্বিত হন, সেই ইয়ং. এ. ইয়োফে আধা-পরিবাহীর ভবিষ্যৎ কল্পনাই করতে পারতেন না।

কিন্তু কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা না থাকলে আধা-পরিবাহী অকেজোই হয়ে থাকত। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা শুধু তাদের গুণাবলীর ব্যাখ্যা দেয় নি, তাদের উন্নত করার নতুন পথেরও নির্দেশ দিয়েছে। কঠিন পদার্থের স্তবক তত্ত্ব (band theory) নামে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার যে শাখা, ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে বহু হাজার গবেষক ও এঞ্জিনীয়ারকে আজ তা নিশানা দিচ্ছে।

এইসব ছোট অথচ শক্তিশালী ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি শিল্পে ও কারিগরী বিদ্যায় মূলগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এমন একটিও কারখানা, যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, যাতে ঐ যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয় না। মানুষের কর্মকাণ্ডের এমন একটি অঞ্চলও নেই, যেখানে ইলেকট্রনিক্সের ফলাফল অনুভূত হয় নি।

সবথেকে বলিষ্ঠ প্রকল্পগুলির একটিকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনই কাজ করছেন: যে সৌরশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়, তা থেকে বিদ্যুৎ আহরণ করে শক্তির প্রায়-নিঃশেষিত প্রস্তরীভূত জ্বালানীর উৎস

থেকে দীপ্তিত্বভার গ্রহণের জন্য আধা-পরিবাহীর ব্যবহার। সূর্যরশ্মি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী সর্বপ্রথম সৌর ব্যাটারীগুলি এখনই কর্মরত রয়েছে। চন্দ্র ও সৌর মণ্ডলের গ্রহাদির প্রথম বসতিগুলিতে শক্তি সরবরাহ করবার জন্যে সৌর ব্যাটারীর প্রকল্প সম্পর্কে নক্সাকারীরা কাজ সুরু করেছেন।

এই দিক থেকে একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল, পৃথিবীর ক্ষেত্রে তার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে (সূর্যরশ্মির যথেষ্ট বড় একটি অংশকে ধরতে গেলে এটা দরকার) আধা-পরিবাহীর জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে উদ্ভিদ উৎপাদন ও পশুপালনের পক্ষে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু চন্দ্রে সেরকম কোন সমস্যাই থাকবে না।

তবে এই বিপুল পরিমাণ শক্তি কিভাবে আমরা পৃথিবীতে পাঠাব ? শক্তি-বহনকারী যে সব ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা পৃথিবীতে পরিচিত, তাদের আলোচনা স্বভাবতই অবান্তর। অধিক কি, শক্তি বহনের সেই সব চিরাচরিত প্রথায় অবক্ষয় অত্যন্ত বেশি।

প্রায় দশ বছর আগে ভি.ফ্যাব্রিকাণ্ট নামে একজন খ্যাতনামা সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গের একটি কোয়াণ্টাম পরিবর্ধকের প্রস্তাব করেছিলেন। প্রথমে কোয়াণ্টাম পরিবর্ধক ও পরে কোয়াণ্টাম দোলকের বাস্তবে রূপায়িত হয়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা জন্ম দিয়েছে মেজার (masers, বেতারে তরঙ্গের পরিবর্ধক ও উৎপাদক) ও লেজার (lasers, আলোকধারার পরিবর্ধক ও উৎপাদক) নামক যন্ত্রাদির একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর। একেই বলে বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের প্রাণবন্ত হয়ে ওঠা।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার যে সব নিয়ম পরমাণুর বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, এই বইটির গোড়াতেই আমরা তাদের কথা বলেছি। এই সব নিয়ম অনেককাল আগেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল — এত কাল আগে (প্রায় ত্রিশ বছর আগে — কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার ইতিহাসে সেটা বেশ কিছু সময়) ও এত দৃঢ়ভাবে যে, পঞ্চাশের দশকে খুব কম লোকই সেগুলির বিষয় কখনো কোন চিন্তা করতেন।

কিন্তু তারপর অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা একটি নতুন কোণ থেকে দৃষ্টিপাত করাতে এই নিয়মগুলি সম্পূর্ণ আশাতীতভাবে কিরণচ্ছটা দান করল, জন্ম নিল এক প্রস্থ নতুন আশ্চর্যরকম শক্তিশালী যন্ত্র।

অতিক্ষুদ্র দ্রব্যের জগৎ সম্পর্কে যে সব চিন্তা ও ধারণা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে এসে উপস্থিত হল, তাদের প্রয়োগের ফলে অর্জিত বহু কারিগরী কৃতিত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অসাধারণ মাত্র কয়েকটির আমরা বর্ণনা করেছি। কারিগরী বিদ্যায় ও শিল্পে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে, বেড়ে চলেছে যন্ত্রাদির সংখ্যা। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার এই দ্বিতীয় জীবনকাল বিশেষরকম প্রাচুর্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। এর সূত্রপাত আমরা দেখেছি। ভাবীকাল হার মানাবে বিজ্ঞানের সবচেয়ে কাল্পনিক উপন্যাসের ভবিষ্যদ্বাণীকেও।

ব্যবহৃত পরিভাষা

অক্ষ—Axis
অতিবেগনী—Ultraviolet
অণু—Molecule
অতিপরিবাহী—Superconductor
অধিক্রমণ—Overlapping
অধিবৃত্ত —Parabola
অনিবন্ধী—Amorphous
অনুভূমিক—Horizontal
অনিশ্চয়তা সম্পর্ক—Uncertainty Relation
অন্তরক—Iusulator
অপরিবাহী—Non-Conductor
অপেক্ষক—Function
অবচ্যুতি —Diffraction
অবলোহিত—Infrared
অলীক—Virtual
আংশিক বিভেদক—Partial Differential
অ্যাম্মিটার—Ammeter
আইসোটোপ—Isotope
আইসোমার—Isomer
আকর্ষণ—Attraction
অতিক্ষুদ্রের জগৎ (আণুবীক্ষণিক জগৎ)—Microworld
অতিক্ষুদ্র (আণুবীক্ষণিক) কণা —Microparticle
আধান—Charge
আধা-পরিবাহী—Semi-Conductor
আপেক্ষিক—Relative
আপেক্ষিকতা—Relativity
আপেক্ষিকতাগতভাবে অপরিবর্তনীয় —Relativistically Invariant
আবর্তন—Rotation
আলফা—Alpha
আলোকচিত্র—Photograph
আলোকবৈদ্যুতিক—Photoelectric
আয়তন—Dimension
আয়ন—Ion
আয়নিত—Ionised
আয়নীয়—Ionic
আসঞ্জক—Adhesive
ইলেকট্রন—Electron
ঈথার—Ether
উদ্ঘাটন— Exposure
উল্লম্ব—Vertical
ঋণাত্মক—Negative
একাত্মক—Unitary
কক্ষ—Orbit
কণা—Particle
কম্পাংক—Frequency
কিমিয়াবিদ্যা—Alchemy

কেন্দ্রক—Nucleus
কেন্দ্রকীয়—Nuclear
কে-মেসন—K-meson
কেলাস—Crystal
কেলাসিত—Crystallised
কেলাসীয়—Crystalline
কোসাইন—Cosine
কোষ—Cell
কোয়াণ্টাম—Quantum
কোয়াণ্টাম-করণ—Quantisation
কৌণিক—Angular
কৌণিক ভরবেগ—Angular Momentum
ক্ষয়—Decay
ক্ষেত্র—Field
খোলক—Shell
গণক—Counter
গতি—Motion
গতীয় শক্তি (চলশক্তি) —Kinetic Energy
গামা—Gamma
গোষ্ঠী—Group
ঘূর্ণন—Spin
চতুষ্টয় or চতুর্ত্রয়—Quadrupet
চূর্ণন—Disintegration
চুম্বক—Magnet
চীর—Split
ছিদ্রপথ—Aperture
জাই—Xi
জাফরী—Lattice
জাড্য—Inertia
জাল—Grading
জিওডেসিক—Geodesic
টাও—Tau
ডলফিন—Dolphin
তরঙ্গদৈর্ঘ্য—Wavelength
তলপৃষ্ঠ—Surface
তাপকেন্দ্রকীয়—Thermonuclear
তাপমাত্রা—Temperature
তেজস্ক্রিয়—Radioactive
ত্বরণ—Acceleration
ত্বারক-যন্ত্র—Accelerator
ত্রি-আয়তন—Three Dimensions
ত্রিঘাত—Cubic
ত্রিতয়—Triplet
থিটা—Theta
দর্পণ প্রতিবিম্ব—Mirror Image
দিক-নিরপেক্ষতা—Isotropy
দোলক—Oscillator
দ্বিতয়—Doublet
দ্বিত্ব—Duality
দ্বৈত—Dual
দ্রুতি—Speed
ধনাত্মক—Positive
নিউক্লিয়ন—Nucleon
নিউট্রন—Neutron
নিউট্রিনো—Neutrino
নিঃসরণ (নির্গমণ) —Emission

নির্দেশক কাঠামো—Reference System
নির্দেশ্যবাদ—Determinism
নিশানী—Target
পজিট্রন—Positron
পদার্থ—Matter
পথদেশক—Pilot
পরমাণু—Atom
পরাবৃত্ত—Hyperbola
পরিবর্ধক—Amplifiier
পরিবহন—Conduction
পর্যাবৃত্ত তালিকা (পর্যাবৃত্ত ছক) —Periodic Table
পরিক্রমাপথ—Trajectory
পরিপ্রাপ্তি—Interpenetration
পরিলেখ—Outline
পর্যায়কাল—Period
পলায়নী বেগ—Escape velocity
পাই-মেসন—Pi-meson
পাত—Node
প্রস্থচ্ছেদ—Cross Section
প্রতিক্রিয়া (বিক্রিয়া)—Reaction
প্রযুক্তিচিত্র—Blueprint
প্রতিচ্ছেদ—Intersection
প্রতিফলন—Reflection
প্রতিষঙ্গ প্রক্রিয়া—Correspondence Principle
প্রতিসাম্য—Symmetry
প্রসারাঙ্ক—Range
প্রোটন—Proton
ফলক—Plate
ফিল্ম—Film
ফোটন—Photon
বন্ধনী—Bond
ব্যতিচার—Interference
ব্যস্তভাবে—Inversely
বর্ণালী—Spectrum
বর্ণালীযন্ত্র—Spectroscope
বল—Force
বলয়—Ring
বলবিদ্যা—Mechanics
বিকর্ষণ—Repulsion
বিকিরণ—Radiation
বিচ্ছুরণ—Scattering
বিটা—Beta
বিতরণ—Distribution
বিত্বরণ—Deceleration
বিদ্যুৎ—Electricity
বিদ্যুৎ-চৌম্বক—Electromagnetic
বিপরীত—Anti
বিবর্তন—Inversion
বিভাজন—Distribution
বিভব পার্থক্য—Potential Difference
বিষম—Odd
বেগ—Velocity
বেতার তরঙ্গ—Radio wave
বেরিয়ন—Baryon

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র—Electric Field
ভর—Mass
ভরবেগ—Momentum
ভরবেগের ভ্রামক—Moment of Momentum
ভ্রামক—Moment
মান—Value
মহাজাগতিক রশ্মি—Cosmic Rays
মাত্রা—Dimension
মাধ্যাকর্ষণ—Gravity
স্কেল—Scale
মিউ-মেসন—Mu-meson
মেজার—Maser
মেসন—Meson
মেসন-অণু—Mesomolecule
মৌল পদার্থ (মৌল)—Element
যোজ্যতা—Valence
রাশি—Quantity
লিথিয়াম—Lithium
লেজার—Laser
লেপ্টন—Lepton
ল্যাম্ডা—Lambda
শক্তি—Energy
শূন্যতা—Vacuum
সংকর—Alloy
সংক্রমণ—Transition
সংনমিত—Compressed
সংপৃক্তি—Saturation
সম—Even, Equal
সমজাতিকত্ব—Homogeneity
সমজাতীয়—Homogeneous
সমবর্তন—Polarisation
সমতা—Parity
সমান্তরাল—Parallel
সম্ভাবনা—Possibility
সম্ভাব্যতা—Probability
সম্ভাব্যতা-মেঘ } Cloud of
সম্ভাব্যতার পুঞ্জ } Probabilty
সংগঠক—Constituent
সংসক্তক—Cohesive
সংযোজন—Fusion
সংযুক্ত বিবর্তন—Combined Inversion
সংরক্ষণ—Conservation
সাইন্—Sine
সিগ্মা—Sigma
সুড়ঙ্গ-প্রক্রিয়া—Tunnel Effect
স্তর—Layer
স্টিরিও—Stereo
স্থিতি-ভর—Rest Mass
স্থৈতিক শক্তি—Potential Energy
স্ফুলিঙ্গগণক যন্ত্র—Scintillation Counter
হাইড্রোজেন—Hydrogen
হাইপেরন—Hyperon
হোল্—Hole
ধ্রুবক—Constant

হর—Denominator

লব—Numerator

সংকেতসূত্র—Formula

স্থানাংক—Coordinates

সুড়ঙ্গ প্রভাব—Tunnel Effect

আপেক্ষক—Function

লেখচিত্র—Graph

বক্ররেখা—Curve

বিনিময়াত্মক বল—Exchange Force

প্রতিমা—Model

বিপরিণাম—Inversion

